ডক্টর অতুলচন্দ্র রায়

ভারতের ইতিহাস

মৌলিক লাইব্রেরী
কলিকাতা

ভারতের ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

(For Three-year Degree Course)

ডক্টর অতুলচন্দ্র রায়, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন)
স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডালিষ্ট, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলিক লাইব্রেরী
৮-ডি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীতেজেন্দ্র নাথ মৌলিক
মৌলিক লাইব্রেরী
৮-ডি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৬১
তৃতীয় সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৬৪

মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩৫-এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্তমান সংস্করণে পুস্তকখানি আগাগোড়া সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত করা হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণটিও প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজ কর্তৃক সমভাবে সমাদৃত হইবে। সুষ্ঠু মুদ্রণ কার্যের জন্য বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩রা নভেম্বর, ১৯৬৪

ইতি
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থখানিতে ত্রৈ-বার্ষিক স্নাতক পাঠ্যসূচী অনুসারে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় হইতে ভারতের প্রাচীন যুগের সমালোচনামূলক এক ধারাবাহিক ইতিহাস যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পূর্বে প্রাচীন ভারতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'অবতরণিকা' নামক শীর্ষকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন যুগের যথার্থ ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমান কাল পর্যন্ত মতভেদের অন্ত নাই। তথাপি এই যুগের ইতিহাস রচনায় ব্রতী বিশেষজ্ঞদের মতামত যথা সম্ভব আলোচিত হইয়াছে। দুইটি পরিচ্ছেদে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক বিষয়ের বিশদ আলোচনার জন্য পাদটীকার ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ত্রৈ-বার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত হইলেও সাধারণ পাঠকগণও প্রাচীন ভারতের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র ইহাতে পাইবেন আশা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২১শে আগষ্ট, ১৯৬১

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

অবতরণিকা

ইতিহাসের মূল ভিত্তি (Basic factors in History) :

প্রাচীনকালের বর্ণনাই ইতিহাস নহে। ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাসের একমাত্র বিষয়বস্তু নহে। যুগ যুগান্তর হইতে মানুষ উহার বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া কিভাবে আধুনিক সভ্যতায় আসিয়া পৌছিয়াছে উহার বিবরণই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর কার্যকলাপ, উহাদের পারস্পরিক সংঘাত ও সহযোগিতা এবং যুগ যুগান্তরে উহাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিবরণই হইল ইতিহাসের মূল কথা। এক কথায় মানুষ ও উহার পরিবেশ হইল ইতিহাসের মূলভিত্তি।

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

মানুষের উপর উহার পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অপর দিকে প্রয়োজনানুসারে পরিবেশকে নিজের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টাও মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া করিয়া আসিয়াছে। প্রয়োজনানুসারে মানুষ নিজ উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন করিয়া থাকে। অপর দিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনধারণ প্রণালী, রীতিনীতি ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। অনন্তকাল হইতে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিয়া বর্তমানকালের সভ্যতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশও বিভিন্ন দেশের মানবসমাজে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যের স্থষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক কথায় জাতির ইতিহাসের সহিত দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য গঠনে ভৌগলিক পরিবেশ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীস ও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীস ও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত

গ্রীস দেশ তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত এবং মধ্যভাগ পাহাড় পর্বত দ্বারা শতধা বিভক্ত। এক একটি ভাগ অপর ভাগ বা অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই কারণে অতি প্রাচীন কালেই গ্রীসে বহু স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনরূপ ঐক্য না থাকায় তথায় বহুকাল পর্যন্ত সার্বভৌম বৃহৎ কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই। অপরদিকে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হওয়ায় অতি প্রাচীনকালেই গ্রীকগণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল যাহা বিশ্বের বহু দেশে

গ্রীস

পরবর্তীকালে সম্ভব হইয়াছিল। গ্রীসদেশ পর্বতসংকুল ও অনুর্বর হওয়ায় দেশে খাদ্যের অত্যন্ত অভাব ছিল এবং এই কারণে গ্রীসবাসীকে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করিতে হইত। কষ্টসহিষ্ণুতা উহাদের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় গ্রীসবাসীগণ প্রাচীনকাল হইতেই নৌ-বিদ্যায় ও সামুদ্রিক অভিযানে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। অতি প্রাচীন-কাল হইতেই গ্রীকগণ স্বদেশের খাদ্যাভাব হেতু বাণিজ্যমুখী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বহির্বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিল। সুতরাং ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রীকজাতির জাতীয় জীবনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও উহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য গঠনে সাহায্য করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনেও ভৌগলিক অবস্থিতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইওরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং চতুর্দিকে সাগর দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা ইওরোপের অন্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না। ভূমির অনুর্বরতা ও শীতপ্রধান হওয়ায় প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া ইংল্যাণ্ডবাসী গ্রীকদের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় ইংল্যাণ্ডবাসী স্বভাবতঃই সমুদ্রমুখী। স্বদেশের খাদ্যাভাব ও সমুদ্রের সান্নিধ্য হেতু ইংল্যাণ্ডবাসী সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিল। নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ইংল্যাণ্ডবাসী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইংল্যাণ্ড

সুতরাং জাতীয় জীবনে ও চরিত্রে ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। গ্রীস, ইংল্যাণ্ড ও অপরাপর দেশের ন্যায় ভারতের ইতিহাসেও ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যধিক।

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Features):

জাতি বা দেশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য গঠনে ভৌগলিক পরিবেশের অবদান অপরিসীম। ভৌগলিক অবস্থানের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অগ্রসরতা নির্ভর করিয়া থাকে। দেশের ভৌগলিক অবস্থানের উপর উহার জলবায়ু নির্ভরশীল। জলবায়ুর উপর দেশের জনগণের বৈষয়িক উন্নতি নির্ভরশীল। ভৌগলিক অবস্থান মানুষের বসতি স্থাপনের উপর প্রভাব

বিস্তার করিয়া থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত আফ্রিকার কতকাঞ্চল যেমন অত্যধিক গরম বলিয়া মানুষের বসবাসের অযোগ্য, তেমনি মেরু অঞ্চল বরফাবৃত বলিয়া মানুষের বসবাসের অযোগ্য। আবার ভৌগলিক অবস্থানের উপর দেশের রাষ্ট্রীয় গঠন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও নির্ভর করিয়া থাকে। মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ দেশগুলির প্রাকৃতিক সীমারেখা না থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী থাকে। আবার দ্বৈপ-অবস্থানভুক্ত দেশগুলির ও পাহাড়-পর্বত বা নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত দেশগুলির উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহজসাধ্য হয় না। যেমন, ভারতের তিনদিকে সমুদ্র ও উত্তরে হিমালয় পর্বত উহার রক্ষাপ্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতের ইতিহাস ও ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র গঠনে ভৌগলিক পরিবেশ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিহাস ও ভূগোলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।* ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভৌগলিক পরিবেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সীমানা : ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক—ভারতের ভৌগলিক সীমা যুগ যুগ ধরিয়া অপরিবর্তিত রহিয়াছে। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ-পর্বতশ্রেণী এবং উত্তর-পূর্বে আরাকান পর্বত ভারতকে একদিকে আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে এবং অপরদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। অপর তিন দিকে যথা,—পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ভারত আরব সাগর, ভারত-মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

কিন্তু ভারতের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক সীমানা এক নহে। (১) ভৌগলিক অবস্থানের দিক হইতে আফগানিস্থান বস্তুতঃ ইরাণ মালভূমির অন্তর্গত হইলেও কার্যতঃ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চল দুইটি মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক, শক, কুষাণগণও এই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। মোগল সম্রাটগণের অধীনেও আফগানিস্থান ভারতভুক্ত হইয়াছিল।

(২) উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অসংখ্য গিরিমালা আসাম ও বঙ্গদেশকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেও ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন ভারতীয় রাষ্ট্র উহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ব্রহ্মদেশ

"Geography and chronology are the sun and the moon, the right eye and the left eye of all history".

বিজিত হইলে উহা বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৮২৬ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(৩) ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জগুলি—যেমন আন্দামান, নিকোবর, সিংহল, মালদ্বীপ ইত্যাদি—কোন কোন সময় ভারতীয় নৃপতিগণের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। আন্দামান ও নিকোবর ভারতের অন্তর্গত হইলেও সিংহলের সহিত ভারতের রাজনৈতিক যোগাযোগ কখনও স্থাপিত হয় নাই।

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ ও উহাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব (Importance of Physical Divisions)ঃ ভূ-ভাগের বিশালতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা ভারতকে একটি মহাদেশের রূপদান করিয়াছে।

একটি মহাদেশ

আয়তনে ভারত রাশিয়া বিযুক্ত সমগ্র ইওরোপ মহাদেশের ন্যায়। সমুদ্র এবং পর্বত পরিবেষ্টিত ভারতের সীমারেখা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল। ইহার উপকূলের বিস্তৃতি হইল তিন হাজার মাইলেরও অধিক। জলবায়ু, ভাষা, বিস্তৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতি-গোষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভারতকে একটি মহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতের ন্যায় এইরূপ বিভিন্নতা সমগ্র ইওরোপেও দেখা যায় না। সুতরাং যে অর্থে আধুনিককালে ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালীকে দেশ বলা যায়, সেই অর্থে ভারতকে দেশ বলা যায় না। সমগ্র ভারতকে একটি মহাদেশ এবং ইহার প্রতিটি প্রদেশকে দেশ বলাই সঙ্গত।

হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের এই ভূখণ্ড প্রাচীন হিন্দুদের নিকট ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল—অর্থাৎ পুরাণে বর্ণিত ভরত রাজার দেশ। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বতত্ত্ববিদগণ এই ভূখণ্ডকে জম্বুদ্বীপ নামে বৃহত্তর

প্রাচীন ভারতের পরিচয়

ভূখণ্ডের একটি অংশ বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীকে 'সপ্ত-দ্বীপ' ও 'সপ্ত-সমুদ্রে' বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছিলেন। চীন ব্যতীত এশিয়ার যে অংশে মৌর্যদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বৌদ্ধগ্রন্থে জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রীকগণই সর্বপ্রথম এই দেশের নামকরণ করিয়াছিল 'ইণ্ডিয়া' এবং সম্ভবতঃ সিন্ধু নদের (Indus) নাম হইতেই সপ্ত-সিন্ধু বা হিন্দু কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভূ-ভাগের গঠন অনুসারে ভারতকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা **আর্যাবর্ত** (উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল) **দাক্ষিণাত্য** (তাপ্তি ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল)। এই দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগের সহিত ভিনসেন্টস্মিথ (V. Smith) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ

আরও একটি বিভাগের সংযোগ করিয়াছেন—যথা সুদূর দক্ষিণ * (তুঙ্গভদ্রা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত)।

আর্যাবর্তকে তিনটি প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—যথা, (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং (৩) মধ্য ভারতের মালভূমি।

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল** ঃ হিমালয়ের সহিত সংলগ্ন কাশ্মীর, নেপাল, ভূটান, সিকিম, প্রভৃতি দেশগুলিকে লইয়া উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে রহিয়াছে বিখ্যাত কয়েকটি গিরিপথ—যেমন খাইবার, বোলান ইত্যাদি। এই সকল গিরিপথ অতিক্রম করিয়াই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি (যেমন আর্য, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, তুর্কী ইত্যাদি) ভারতে আগমন করিয়াছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীগণই সর্বপ্রথম বৈদেশিক আক্রমণকারীগণকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। আবার এই অঞ্চলেই পুরাণে বর্ণিত মুণিঋষিদের সাধন ক্ষেত্র ও বুদ্ধের জন্মস্থান (কপিলাবস্তু) অবস্থিত।

(২) **সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা**—হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণ হইতে মধ্য ভারতের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকা নামে অভিহিত। 'পঞ্চনদ,' গঙ্গা ও যমুনা এই অঞ্চলকে অনাদিকাল হইতে উর্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া রাখিয়াছে এবং জলপথে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও যাতায়াতের সুবিধাহেতু বহু প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে বড় বড় নগর ও সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়া এই অঞ্চলটি ছিল ভারতীয় রাষ্ট্র জীবনের প্রাণকেন্দ্র। আর্য সভ্যতার বিকাশ, ধর্ম আন্দোলন (বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম) ও ভারতীয় রাষ্ট্র জীবনের যুগান্তকারী যুদ্ধবিগ্রহগুলি (তরাইনের যুদ্ধ, পানিপথের যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ) এই অঞ্চলেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

---

* প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের পাঁচটি বিভাগের উল্লেখ রহিয়াছে—সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার মধবর্তী অঞ্চলটি 'মধ্যদেশ'। ইহা সরস্বতী নদী হইতে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'মধ্যদেশের পশ্চিমাংশ 'ব্রহ্মর্ষিদেশ' নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশের উত্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি 'উত্তরাপথ' নামে পরিচিত ছিল। ইহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলগুলি যথাক্রমে 'প্রতীচ্য' 'দক্ষিণাপথ' ও 'প্রাচ্য' নামে পরিচিত ছল। এক সময় উত্তরাপথ বলিতে সমগ্র আর্যাবর্তকে বুঝাইত এবং কৃষ্ণানদীর উত্তরাংশ দক্ষিণাপথকে বুঝাইত। সুদূর দক্ষিণ 'তামিলদেশ' নামে পরিচিত ছিল। পুরাণে এই পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগের সহিত আরও একটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা 'পর্বতাশ্রয়িণ' (হিমালয় ও বিন্ধ্য অঞ্চল)।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমি ঃ** বিন্ধ্যপর্বত ও সিন্ধু-গাঙ্গের উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি মধ্য ভারতের মালভূমি নামে অভিহিত। একদিকে পর্বত ও অপর দিকে গঙ্গা এই অঞ্চলটিকে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মধ্যে ঐক্য বিধানের পথে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন যুগে আর্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতের আদিম অধিবাসীগণ (যেমন কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য জাতি) এই অঞ্চলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় করিয়াছিল। এই অঞ্চলেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেলিয়া-গড় (রাজমহলের সন্নিকটে) পথটি মধযুগে সামরিক দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্ব-অর্জন করিয়াছিল। সেই যুগে তেলিয়াগড়ের স্বল্প পরিসর পথটি ছিল বাংলার দুর্লঙ্ঘ্য দ্বার। বাংলার পক্ষে উত্তর ভারত হইতে যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করা এই অঞ্চলেই সহজ ছিল।

সমগ্র দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ দুইটি বিভাগে বিভক্ত—যথা, (১) দক্ষিণ-ভারতের মালভূমি এবং (২) সুদূর দক্ষিণ।

(১) **দক্ষিণ ভারতের মালভূমি ঃ** দক্ষিণ ভারতের মালভূমি ও সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। বিন্ধ্যপর্বত উত্তর ভারত হইতে এই দুইটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পূর্ব ও পশ্চিমঘাট দ্বারা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্ব ও পশ্চিমঘাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলকেই দক্ষিণ ভারতের মালভূমি বলা হইয়া থাকে। পূর্বঘাট ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে করোমণ্ডল উপকূল অবস্থিত এবং পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের মধ্যে মালাবার ও কোঙ্কন প্রদেশ অবস্থিত। ঐতিহাসিক দিক হইতে দক্ষিণ ভারতের এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। মারাঠাগণ পশ্চিমঘাটের উভয় অংশেই বসবাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য নাই। বিন্ধ্যপর্বত উত্তর ভারতের আক্রমণ-কারীগণকে প্রতিহত করিতে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই অঞ্চলে উত্তর ভারতের কোন হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি স্থায়ীভাবে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই অঞ্চলেই মারাঠাগণ শিবাজীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতেই মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তথা মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচিত হইয়াছিল।

(২) **সুদূর দক্ষিণ ঃ** কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তামিল অঞ্চলকে সুদূর দক্ষিণ ভারত বলা হইয়া থাকে। কোঙ্কন ও মালাবার অঞ্চলের বিখ্যাত নৌ-বন্দরগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের মালভূমি হইতে এই অঞ্চল কোনরূপ সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন না রহিলেও ইহার একটি স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। এই অঞ্চলেই দ্রাবিড় সভ্যতা স্বকীয়

প্রতিভা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণ যুগে যুগে সুদূর দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। এই অঞ্চলেই প্রাচীনকালে চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অঞ্চল হইতেই প্রাচীনকালে ভারতীগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিল।

ভারত ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব
(Influence of Physical features on Indian History)

"The Geography of India, its physical configuration, its mountains and rivers, have had a decisive influence on its history."

ভারত ইতিহাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ। ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারত ইতিহাসের ধারা ও অধিবাসী-দের চরিত্র প্রভাবিত করিয়াছে এবং ভারতবাসীর জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটাইয়াছে। উত্তরে হিমালয় এবং পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় ভারত একদিকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং অপরদিকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিছিন্ন রহিয়াছে। কিন্তু এই বিছিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও ভারতবাসী যে কেবল মাত্র স্বতন্ত্র ইতিহাসই সুদীর্ঘকাল হইতে রচনা করিয়া চলিয়াছে এমন নহে, ভারতবাসীর পক্ষে এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সভ্যতাও গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে।* বিশাল আয়তন, বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত জনসমাজ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র ভারতকে একটি মহাদেশের রূপদান করিয়াছে এবং এই মহাদেশীয় রূপ ভারত ইতিহাসের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকার ফলে ভারতবাসীর পক্ষে পার্থিব চিন্তাধারার উর্ধে থাকিয়া ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যতা ও চারিত্রিক সক্রিয়তা হেতু ভারতে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল।

স্বতন্ত্র সভ্যতার বিকাশ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিমালয় যে স্থান অধিকার করিয়া আছে বিশ্বের অন্য কোন পর্বত কোন দেশ ও কোন জাতির জীবনে তাহা করে নাই। পানিকরের কথায় "ভারতীয়-ভূগোলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল হিমালয়"। প্রথমতঃ, যুগ যুগ ধরিয়া রক্ষা

হিমালয়ের প্রভাব

পানিকরের মন্তব্য ঃ "An area so walled off and isolated inevitably developed peculiarities and special characteristics which constitute the differenciating marks of a civilisation,"

প্রাচীররূপে হিমালয় ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা ও সামাজিক গঠন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে। ভারতের বর্তমান সমাজের রূপ রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত সমাজ হইতে বিশেষ পৃথক নহে। বুদ্ধের সময় ভারতবাসীর জীবনধারার যে রূপ ছিল আজও অনেকটা তাহাই আছে। প্রাচীন যুগে ভারতবাসীর মনে জন্ম-মৃত্যু, কর্ম, মায়া প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল আজও সেই সকল প্রশ্ন সহজভাবেই উদয় হইয়া থাকে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিকতা ভারতের ইতিহাসের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, হিমালয় হইতে নির্গত তিনটি বৃহৎ নদী সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের অসংখ্য উপনদী ভারতভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিয়াছে এবং জনসাধারণকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই নদীত্রয়-বিধৌত অঞ্চলেই ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ও বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছিল। আর্যগণ ও মুসলমানগণ গঙ্গা নদী বাহিয়া প্রথমে আর্যাবর্তে এবং পরে তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। দিল্লী গাঙ্গেয় উপত্যকার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আগত বৈদেশিক আক্রমণকারীগণকে দিল্লী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অতিক্রম করিয়াই আর্যাবর্তের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ভারত ইতিহাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ (তরাইনের দুইটি যুদ্ধ ও পানিপথের তিনটি যুদ্ধ) দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সংঘটিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, হিমালয় ভারতের প্রাচীর বেষ্টনীর সাহায্য করিলেও ভারতকে বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে নাই। হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ (খাইবার বোলান ইত্যাদি) দিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি (যেমন গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, মোগল ইত্যাদি) ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। আবার এই সকল গিরিপথ দিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ইহার একটি দৃষ্টান্ত। ইহা ছাড়া গিরিপথগুলি দিয়াই ভারতের সহিত চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশগুলির বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতেই চালিয়া আসিতেছে।

বিন্ধ্যপর্বতের প্রভাব

(১) দ্বিখণ্ডিত ভারত

হিমালয়ের ন্যায় বিন্ধ্যপর্বতও ভারত ইতিহাসের ধারায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা সত্ত্বেও বিন্ধ্যপর্বতমালা দ্রাবিড়গণকে স্বকীয় প্রতিভা লইয়া এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারে বাধা প্রাদান করিয়াছিল। কিন্তু ইহা দ্রাবিড়গণকে আর্যদের নিকট

হইতে অধিকদিন বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে নাই। পুরাণে অগস্ত্যমুনির বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রমের কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। অগস্ত্যমুনির পথ অনুসরণ করিয়া আর্যগণ দলে দলে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটে। পরবর্তিকালে মৌর্য, গুপ্ত, খালজি ও মোগলগণ বারে বারে এই পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রের সূত্রপাত করিয়াছিল।

(২) প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ

(৩) রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সূত্রপাত

পর্বতমালার ন্যায় সমুদ্রও ভারত ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের তিনদিক, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সামুদ্রিক উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল। সমুদ্রগুলি একদিকে ভারতকে বহিরাক্রমনের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং অপর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দান করিয়াছে। প্রগৈতিহাসিক যুগে সমুদ্রপথে ভারতের সহিত বহির্জগতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আর্যদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালেই ভারতের সহিত চীন, রোম, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলির সহিত সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। এই সকল বাণিজ্য কেন্দ্র হইতেই পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। আধুনিক যুগে পর্তুগীজ, ইংরাজ ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকগণ সমুদ্র পথে ভারতে আগমন করিয়া ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য উন্নত করিয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত ইংরাজগণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সমুদ্র হইতে উত্থিত মৌসুমী বায়ু ভারতের কৃষিকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

সমুদ্রের প্রভাব

(১) বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা

(২) বহির্বিশ্বে বাণিজ্য প্রসার

(৩) ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

(৪) ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপন

(৫) কৃষি উন্নয়ন

সমুদ্রের প্রতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের মনোভাব (Different attitudes of Northern and Southern India towards The Sea)

সমুদ্র সম্পর্কে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্র হইতে উত্তর ভারতের প্রধান অঞ্চলগুলির দূরবর্তিতা হেতু উত্তর ভারতীয়গণ সমুদ্র-প্রবণ হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। সিন্ধুনদের নিকটবর্তী কিছু অঞ্চল ও বাংলাদেশ সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এই দুই অঞ্চলেই কতক পরিমাণে সামুদ্রিক চলাচল ছিল।

(১) উত্তর ভারতীয়দের সমুদ্র প্রবণতার অভাব

সামুদ্রিক অভিযান ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও গুজরাটের অধিবাসীগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু মৌর্য হইতে মোগল শাসন কাল পর্যন্ত কোন উত্তর ভারতীয় নৃপতি সমুদ্রের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে মোটেই সচেতন ছিলেন না। সমুদ্র হইতে দূরবর্তিতা হেতু উত্তর ভারতীয় নৃপতিগণ নৌ-শক্তিকে অবহেলা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইওরোপীয় জাতিগুলি নির্বিবাদে সমুদ্রপথে ভারতে আগমন করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব হইতেই সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতীয়গণের চলাচল ছিল। রামায়ণে দক্ষিণ ভারতীয়দের সহিত জাভা, সুমাত্রার সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত হইতেই ভারতীয়গণ জাভা, বলিদ্বীপ, সিংহল, চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের চোলরাজগণের নৌশক্তিরও বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) দক্ষিণ ভারতীয়দের স্বাভাবিক সমুদ্র প্রবণতা

ভারতের জাতিগোষ্ঠী (Indian Races)

দেহের গঠন ও ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবাসীকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ, আর্য বা ভারতীয় আর্য। ইহারা দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ ও উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। ইহাদের দেহাকৃতি পূর্ববর্তী শ্রেণী হইতে পৃথক এবং ইহাদের ভাষা যথা তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহারা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়তঃ, পর্বত ও অরণ্যবাসী আদিম অধিবাসী। প্রথম শ্রেণীর লোকেদের সহিত ইহাদের শারীরিক গঠন ও বর্ণের সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাদের ভাষা প্রথম দুইশ্রেণীর লোকেদের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহারা খর্বাকৃতি ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হো, মুণ্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি উপজাতি এই শ্রেণীভুক্ত।

চতুর্থতঃ, মোঙ্গলীয় জাতিগোষ্ঠী। ইহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ, চোখ চাপা ও নাসিকা অনুন্নত। সাধারণত হিমালয়ের পাদদেশে ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ইহাদের বসবাস।

উপরোক্ত জাতি ও উপজাতিগুলি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বাহির হইতে গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, পারসিক, আরব, আফগান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় জনসমাজে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিল। ইহার ফলে কোন জাতির মৌলিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন ও মিশ্রণের ফলে ভারতবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত ইতিহাসের উপাদান

(Sources of Ancient Indian History)

প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া অনেকেই বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল টড মন্তব্য করিয়াছেন, "Much disappointment has been felt in Europe at the sterity of the historical muse of Hindustan।" ভারতে আগত বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক অল্-বিরুনী (একাদশ শতাব্দী) বলেন, "হিন্দুগণ ঐতিহাসিক রচনার প্রতি উদাসীন, উহারা রাজাদের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্পর্কেও অজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য চাপ দিলে উহারা কল্পনা ও কিংবদন্তির আশ্রয় গ্রহণ করে।" ঐতিহাসিক ফ্লিটও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া বলেন যে প্রাচীন হিন্দুরা ইতিহাস লিখিতে জানিত না এবং উহাদের ঐতিহাসিকবোধও ছিল না। তাঁহার মতে প্রাচীন হিন্দুগণ ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক আখ্যান রচনা করিতে পারিত মাত্র কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে। কিথ্ বলেন যে প্রাচীন ভারতীয়দের সাহিত্যের অভাব ছিল না কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্যের যুগেও ভারতের

টড, অল্‌বিরুনী ও ফ্লিটের মন্তব্য

গ্রন্থকারগণের মধ্যে কোন একজনকেও যথার্থ ঐতিহাসিক হিসাবে অভিহিত করা যায় না।

কিথ কর্তৃক ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবের কারণ বিশ্লেষণ

প্রাচীনযুগে ভারতের ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া কিথ্ বলেন যে প্রথমতঃ, গ্রীসে পারসিক আক্রমণ প্রতিহত হইলে হিরোডোটাস (Herodotos) যেরূপ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রীসের জাতীয় ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইভাবে কোন বৈদেশিক আক্রমণ ভাতরবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উল্লেখ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ভারতে কোন বৈদেশিক আক্রমণ মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যাহা ভারতবাসীর মনে রেখাপতে করিতে পারে। কিথ্ তাঁহার সমর্থনে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ এবং ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক, শক, কুষাণ, ও হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগুলির আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়গণ বাস্তব অপেক্ষা অদৃষ্টের প্রতি অধিক বিশ্বাসী হওয়ায় উহাদের মনে বাস্তব ঘটনাবলীর গুরুত্ব মোটেই রেখাপাত করিত না। তৃতীয়তঃ, যথার্থ ঘটনা ও জনশ্রুতির মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞানের অভাব থাকায় প্রাচীন ভারতীয়গণ সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতীয়দের ঐতিহাসিক প্রতিভার অভাব ছিল কিন্তু ঐতিহাসিক বোধের অভাব ছিল না

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত অভিযোগগুলি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় এবং ইহা সত্য যে হিরোডোটাস, থুসিডাইডিস বা টাসিটাসের ন্যায় ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত হন নাই এবং তাঁহাদের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থও ভারতে সেই যুগে রচিত হয় নাই। তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে সেইযুগে হিন্দুগণ ইতিহাস রচনায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রলিপি প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে—কারণ এইগুলি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। হিন্দু রাজগণের সভাকবিগণ রাজাদের কীর্তি ও কাহিনী মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মশাস্ত্রগুলি হইতে হিন্দুদের ঐতিহাসিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য আধুনিককালের ন্যায় সমালোচনামূলক বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনার কৌশল প্রাচীন ভারতীয়দের জানা ছিল না। ডক্টর মজুমদারের কথায় "ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক ত্রুটি হইল যে ভারতীয়গণ ইতিহাস রচনার প্রতি মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁহারা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।"

উপাদানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sources) ঃ

প্রাচীনযুগের ভারত ইতিহাসের উপাদানসমূহ চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা (১) ধর্মীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য, (২) কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিক সাহিত্য, (৩) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং (৪) বৈদেশিক বৃত্তান্ত।

(১) ধর্মীয়শাস্ত্র ও সাহিত্য (Religious and Secular Literature) ঃ আর্যগণের আগমনের পর হইতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল পর্যন্ত এই সময়ের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হইল ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য—যথা চতুর্বেদ, বেদাঙ্গ, সূত্র-সাহিত্য ইত্যাদি—হইতে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় এবং আর্য-অনার্য সংগ্রামের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এইগুলি হইতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও আর্যদের জ্ঞান বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ হইল সর্বাধিক প্রাচীন। ঋগ্বেদ হইতে আর্যদের প্রাচীন ইতিহাস ও ইহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আরণ্যক ও উপনিষদে আর্যদের ধর্ম জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে পঠন-পাঠনের জন্য কালক্রমে এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই চেষ্টা হইতেই সূত্রসাহিত্যের বিকাশ ঘটে। কল্পসূত্রে আর্যদের পূজা-পার্বণের বর্ণনা পাওয়া যায়। সূত্রসাহিত্যের মধ্যে শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র ও ধর্মসূত্রের উল্লেখ করা যায়। জনৈক ইওরোপীয় ঐতিহাসিকের মতে "বৈদিক সাহিত্যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এই কারণে সকল বিষয়ে বৈদিক সাহিত্য নির্ভর-যোগ্য নহে।" ইহার প্রতিবাদ করিয়া ডক্টর এস-এন-প্রধান বলেন যে "বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য প্রমাণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য"।

বেদ

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ হইতে যেমন ত্রিপিটক, নিকায়, জাতক, দ্বীপবংশ ইত্যাদি হইতে তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থা ও মণিষীগণের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। দ্বীপবংশ ও মহাবংশ হইতে সিংহলের ইতিহাস জানা যায়। 'ললিতাবিস্তার' ও বৈপুল্য-সূত্র হইতে বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলি জানা যায়। জাতক নামক গ্রন্থে বুদ্ধের পূর্ব-জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণের মতে বহু জন্মের ভিতর দিয়া বুদ্ধ শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় ৫৪৯টি জাতক-কাহিনী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। জাতক কাহিনীগুলিতে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম জীবনের পরিচয় পাওয়া

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

যায়। এই কাহিনীগুলি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে সংকলিত হইয়াছিল। উইণ্টারনিজ (Winternitz)-এর মতে "শুধু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রই নহে তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দের সভ্যতার ইতিহাসে জাতকগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের ন্যায় জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিও যেমন ভগবতী সূত্র, মেরুতুঙ্গ ইত্যাদি ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈন ধর্মগ্রন্থ

'গার্গি-সংহিতা', পাণিনি-র 'অষ্টাধ্যেয়ী', পতঞ্জলীর 'মহাভাষ্য', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থাদি হইতেও প্রাচীন ভারত ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে উপরোক্ত সাহিত্যগুলিতে ঐতিহাসিক তথ্যাদি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকায় সেইগুলি হইতে প্রাচীনযুগের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা কষ্টসাধ্য।

(২) ঐতিহাসিক সাহিত্য (Historical Literature): প্রাচীন যুগে ইতিহাস রচনা করার উপযোগী উপাদানের অভাব ছিল না। বংশাবলীর সংকলন রচনা তৎকালীন ভারতীয় সমাজে একরূপ সংস্কার ছিল। রাজ-বংশাবলীর সংকলন ও তাহা সযত্নে রক্ষা করার প্রথা সেই যুগে প্রচলিত ছিল। রাজবংশ ও রাজগণের এইরূপ বহু তালিকা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

(ক) পুরাণ: ইহার বিষয়বস্তু হইল স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ বংশ ও বংশানুচরিত। উইণ্টারনিজ-এর মতে রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাজবংশগুলির পরিচয় সম্পর্কে পুরাণের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। পুরাণের সংখ্যা হইল আঠারোটি।* হিন্দুধর্মের ইতিহাস রচনায় পুরাণের মূল্য যথেষ্ট। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, ব্রহ্ম-পুরাণ ও ভবিষ্য-পুরাণ এই পাঁচটি পুরাণই ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাণ হইতে মধ্যদেশের বিভিন্ন নৃপতিগণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। এইগুলি হইতে হস্তিনাপুরের কৌরব-রাজগণ, কোশলের ইক্ষাকু রাজগণ ও শৈশুনাগ রাজগণ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়। স্মিথের মতে বিষ্ণু-পুরাণ ও মৎস্য-পুরাণ যথাক্রমে মৌর্য ও শৈশুনাগ বংশের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান।

---

* **অষ্টাদশ পুরাণ:** (১) ব্রহ্ম-পুরাণ, (২) পদ্ম-পুরাণ, (৩) বৈষ্ণব-পুরাণ, (৪) শৈব-পুরাণ, (৫) ভগবৎ-পুরাণ, (৬) নারদিয়-পুরাণ, (৭) মারকাণ্ড-পুরাণ, (৮) আগ্নেয়-পুরাণ, (৯) ভবিষ্য-পুরাণ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, (১১) লৈঙ্গ-পুরাণ, (১২) বরাহ-পুরাণ, (১৩) স্কন্দ-পুরাণ, (১৪) বামণ-পুরাণ, (১৫) কর্ম-পুরাণ, (১৬) মৎস্য-পুরাণ, (১৭) গরুড়-পুরাণ এবং (১৮) ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

কতকগুলি পুরাণ হইতে 'অভীর,' 'যবন,' 'হূন' প্রভৃতি জাতিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণগুলি হইতে ভারতের ভৌগলিক অবস্থা ও বহু প্রাচীন শহরের বিবরণও পাওয়া যায়।ক সাধারণভাবে ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে সংস্কৃত-সাহিত্য যুগের শেষের দিকে পুরাণ রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ বিগত এক সহস্র বৎসরের মধ্যে পুরাণের রচনাকাল বলিয়া ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। পুরাণের সহিত বাণভট্টের পরিচয় ছিল এবং তিনি বায়ু-পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আইন রচনার ব্যাপারে পুরাণের সাক্ষ্য-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া কুমারিলভট্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণকে ধর্মীয় ও প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া শংকরাচার্য ও রামানুজ বর্ণনা করিয়াছেন। অল-বিরুণীও অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) মহাকাব্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের প্রথম মহাকাব্য এবং ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। উইন্টারনিজ-এর মতে মহাকাব্য দুইটি শুধু কাব্যই নহে ইহা একটি সমগ্র সাহিত্য।‡ প্রাচীন যুগের রাজবংশগুলির কীর্তিকলাপ এবং লংকার রাবণ-সভ্যতারও বিবরণ মহাকাব্য-দুইটিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনা সমূহ কল্পনা প্রসূত ও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হইলেও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্ম জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

ক **পুরাণ সম্পর্কে সমালোচনা ঃ** পুরাণের গুরুত্ব সম্পর্কে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাহারো কাহারো মতে পুরাণে বর্ণিত রাজবংশাবলী কল্পনা প্রসূত এবং সমকালীন নৃপতিগণের ইচ্ছানুযায়ী রচিত। কিন্তু এইরূপ অনুমান যথার্থ নহে। কল্পনার সাহায্যে বংশাবলী রচনা করা সম্ভব নহে এবং নৃপতিগণের আদেশে পৌরাণিকগণ মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যায় না। স্মিথ যথার্থই বলিয়াছেন যে প্রাচীনযুগের যে কোন জাতির ঐতিহাসিকগণের পক্ষে কিংবদন্তি বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য পুরাণ ত্রুটিহীন নহে। ইহাতে ইতিহাসের সহিত জনশ্রুতি ও উপাখ্যান মিশ্রিত রহিয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী ঘটনা ও কাহিনীর সংমিশ্রণ রহিয়াছে। পুরাণে বর্ণিত ঘটনাগুলির সত্যতা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য। সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে পুরাণে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিতে হইলে সতর্কতার প্রয়োজন।

‡ **মহাকাব্য দুইটির রচনাকাল ঃ** মহাকাব্য দুইটির রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে মহাকাব্য দুইটি রচিত হইয়াছিল। উইন্টারনিজ-এর মতে আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ইহা সংকলিত হইয়াছিল।

বাল্মিকী রচিত রামায়ণ সপ্তকাণ্ড ও চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত। ব্যাসদেব রচিত মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব ও এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত।

(গ) রাজবৃত্ত : বংশাবলী ছাড়াও প্রাচীন রাজগণ তাঁহাদের রাজত্বকালে সংঘটিত বা অনুষ্ঠিত বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু ইতিহাস রচনাকল্পে এইগুলির যথোচিত ব্যবহার করা হয় নাই। কাশ্মীরের ইতিহাস সরকারী দলিলপত্র ও বংশাবলীর সাহায্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলহণ কাশ্মীরের রাজবৃত্ত 'রাজতরঙ্গিনী' (দ্বাদশ-শতক) রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কাশ্মীরের রাজবংশগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

গুজরাটের ইতিহাস

কাশ্মীরের বংশাবলী ও সরকারী দলিল পত্রের ন্যায় গুজরাটের বংশাবলীও ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। সোমেশ্বর রচিত রাসমালা ও রাজশেখর রচিত প্রবন্ধকোষ হইতে গুজরাটের রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

(ঘ) জীবন চরিত : ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে জীবন চরিতগুলিও বিশেষ মূল্যবান। ইহাদের মধ্যে বাণভট্ট রচিত 'হর্ষ চরিত', বিহ্লন রচিত 'বিক্রমাংকদেব চরিত,' সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রাম-চরিত', বাক্‌পতিরাজ রচিত গৌড়বহ এবং পদ্মগুপ্ত রচিত 'নবশাহশাঙ্ক-চরিত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জীবন চরিতগুলিকে যথার্থ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না তবে এইগুলিতে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

(৩) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Archaeological Evidence) : প্রচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশেষ মূল্যবান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, সৌধ ও স্মৃতি-স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড কার্জনের আমলে

প্রত্নতত্ত্ববিদ

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় এবং জন মার্শাল ছিলেন এই বিভাগের সর্বপ্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের সহিত হ্যামিলটন বুকানন (বিদ্বান ইংরাজ কর্মচারী) প্রিন্সেপ (এশিয়াটিক সোসাইটির সচিব), কানিংহাম (ইংরাজ স্থাপত্য পরিদর্শক), জন মার্শাল (কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল বা অধিকর্তা) ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের-অভ্যন্তরে * ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে

---

* **ভারতের অভ্যন্তরে :** (১) হ্যামিলটন বুকানন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসাম, উত্তর-বঙ্গ, বিহার ও মহীশূরের বিভিন্ন স্থানে চৈত্য ও প্রাচীন ধ্বংশাবশেষের এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

(২) প্রিন্সেপ ১৮৩৭ সালে সাঁচী স্তূপে ক্ষোদিত অক্ষর ও দিল্লীতে প্রাপ্ত অশোকের স্তম্ভের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তিনি অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী-লিপির পাঠোদ্ধার করেন। ইহার পর তিনি খরোষ্ঠী লিপিরও পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করিয়া উহার অস্তিত্বের সময় নির্ণয় করা হইয়াছে। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের চরম সাফল্য হইল সিন্ধু সভ্যতার উদ্ঘাটন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা নামক স্থানে খননকার্য করিয়া প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় সভ্যতার ইতিহাস উদ্ঘাটিত করেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই ভারতে এক উন্নত নগর কেন্দ্রিক ও শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব

সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার

(ক) **প্রাচীন লিপি (Inscription)** ঃ প্রাচীন লিপির ঐতিহাসিক মূল্য প্রসঙ্গে স্মিথ বলেন যে "ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপাদান হিসাবে প্রাচীন লিপিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য।" ফ্লিটের মতে মুদ্রা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ঐতিহ্য ও সাহিত্য হইতে আমরা যে সকল বিবরণ পাইয়া থাকি উহার সত্যতা নির্ণয় করিতে লিপিমালা যথেষ্ট সাহায্য করে। লিপিগুলির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল রাজ প্রশস্তি, দান-পত্র, শাসন, ধর্ম, রাজনৈতিক ঘটনা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত।

বিভিন্ন প্রকারের লিপি

কোন কোন লিপি হইতে রাজনৈতিক ঘটনার বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়— যেমন কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি ; সমুদ্রগুপ্তের 'এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপি', ও শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমনের 'জুনাগড় লিপি'। সম্রাট অশোকের একাধিক শিলা ও স্তম্ভলিপি হইতে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন ও ধর্ম সংক্রান্ত বহু বিষয় জানা যায়। প্রাচীন লিপিমালা হইতে রাজাদের কীর্তি কলাপ তাঁহাদের রাজ্যের আয়তন, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং তৎকালীন সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বহু তথ্য পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত লিপিমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হইলে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

লিপি হইতে প্রধানতঃ রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব

কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে প্রাপ্ত লিপি হইতে ভারত সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায়—যেমন এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত 'বোঘাজ-কোয়' (Boghaz-koi) শিলালিপি হইতে ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যদের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যায়। নক্সি রুস্তম

বিদেশী-লিপি 'বোঘাজ-কোয়' ও নকসি-রুস্তম

(৩) কানিংহাম গ্রীক, চৈনিক, আরব প্রভৃতি পরিব্রাজক ও গ্রন্থকারদের উল্লিখিত স্থানগুলি খনন করিয়া বহু বিলুপ্ত নগর ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে সাঁচী, সারনাথ ও তক্ষশীলায় খননকার্য শুরু হয়।

(Nakshi Rustom)-এ প্রাপ্ত লিপি হইতে ভারতের সহিত ইরাণের রাজনৈতিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়।

(খ) **মুদ্রা (Coins) :** প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় মুদ্রা হইল অপর প্রধান উপাদান। সাহিত্য ও লিপি হইতে যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায়—উহার সত্যতা যাচাই করিতে মুদ্রা যথেষ্ট সাহায্য করে। সাল এবং তারিখ সম্বলিত মুদ্রাগুলি কাল নিরূপণ করিতে সাহায্য করে। মুদ্রা হইতে রাজাদের শাসন, রাজ্যের আয়তন ও তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শক, ব্যাক্ট্রিয় ও কুষাণগণের ইতিহাস সম্পর্কে উহাদের মুদ্রাই আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক ও শকদের মুদ্রা হইতে উহাদের সহিত রোমের সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মালব, মৈত্রক ও সাতবাহন রাজ্যের ইতিহাস রচনায় মুদ্রায় গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। গুপ্ত রাজগণের মুদ্রা হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

গুরুত্ব

(গ) **সৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভ (Monuments) :** রাজনৈতিক ইতিহাসে সৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভের গুরুত্ব অধিক না হইলেও প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় ইহাদের গুরুত্ব কম নহে। সমাধি, স্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি ভগ্নাবশেষ হইতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায়। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করিয়া সেইগুলির সাল তারিখ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় খনন কার্যের দ্বারা প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় যুগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তক্ষশীলার খননের দ্বারা কুষাণ ও গান্ধার শিল্প সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়াছে। তুর্কীস্থান ও বেলুচিস্থানে খনন কার্যের দ্বারা ভারতের সহিত উক্ত অঞ্চল দুইটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। কম্বোজের আংকোর ভাট ও জাভার বরোবুদুরের মন্দির দুইটি হইতে ভারতের ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন

(ঘ) **বৈদেশিক বৃত্তান্ত (Foreign Accounts) :** প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে বিদেশী লেখক ও পর্যটকগণের লিখিত বিবরণী বিশেষ মূল্যবান। বিদেশী গ্রন্থকারদের মধ্যে (গ্রীক, রোমান, চৈনিক ও মুসলমান) অনেকে ভারতে পরিভ্রমণ করিয়া, বসবাস করিয়া বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotos) ভারতে আগমন না করিয়াও পারস্য কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্যজয়ের কথা

হিরোডোটাস

উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'ইতিহাস' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, উত্তর ভারত পারস্য সম্রাট দারায়ুসের সাম্রাজ্যভুক্ত বিংশতম প্রদেশ ছিল।

বিদেশী গ্রন্থাকারগণের রচনা হইতে ভারতের সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। ইহাদের মধ্যে মেগাস্থিনিস (Megasthenes), আরিয়ান (Arrian), কার্টিয়াস (Cartius), প্লুটার্ক (Plutarch), ডিয়োডোরাস (Diodoros) ডিয়োনিসাস (Dionysios) প্রমুখ গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্পর্কে গ্রীক ও রোমান উপাদান

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কোন বিবরণ ভারতের সমসাময়িক যুগের কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। একমাত্র কার্টিয়াস, আরিয়ান, ডিয়োডোরাস ও প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রন্থকারদের রচনায় এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' (Indika) নামক গ্রন্থ হইতে মৌর্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ডিয়োনিসাসের রচিত মূলগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ইহার কিছু অংশ অন্যান্য গ্রন্থকারদের রচনায় উদ্ধৃত রহিয়াছে।

পেরিপ্লাস

'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী' (Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ভারতীয় অর্থ নৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া টলেমির (Ptolemy) ভূগোল ও প্লিনির (Pliny) খনিজ ও অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে বর্ণনা হইতেও বহু মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়।

টলেমি ও প্লিনির ভূগোল

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে চৈনিক ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণের গ্রন্থাদির মূল্য অনস্বীকার্য। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাং, ইৎসিং প্রভৃতি চৈনিক পর্যটকদের রচনা হইতে ভারত সম্পর্কে বহু তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। চৈনিক উপাদান ভিন্ন ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস ও বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিবরণ সম্পূর্ণ হইতে পারেন না। চৈনিক ঐতিহাসিক সু-মা ফিয়েন খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে তাঁহার রচিত 'ইতিহাস' নামক গ্রন্থে ভারত সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি চীনের 'হিরোডোটাস' নামে পরিচিত। ভারতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথও বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী অত্যন্ত মূল্যবান।

চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং

চৈনিক ঐতিহাসিক সু-মা ফিয়েন

তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথ

গ্রীক, রোমান, চৈনিক ও তিব্বতীয় গ্রন্থকারদের পর বহিরাগত মুসলমান গ্রন্থকার ও পর্যটকদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ মুসলমান লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। বিখ্যাত আরব মনীষী অল্-বিরুণীর বিবরণী হইতে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। সুলেমানের গ্রন্থ হইতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অল্-বিলাহুরি, অল্-মাসুদী, হাসান-নিজামি প্রমুখ মুসলমান গ্রন্থকারগণের রচনাও ভারত ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিয়াছে।

মুসলমান গ্রন্থকারগণ অল্-বিরুণী, অল্-মাসুদী, সুলেমান

ভারতীয় সভ্যতার মূলগত ঐক্য
(Fundamental unity of India)

ভারত এক বৈচিত্র্যময় দেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতি, ধর্ম, ভাষা—সকল দিক হইতে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ঐতিহাসিকগণ ভারতকে 'বিশ্বের সারাংশ' (epitom of the world) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যেও একটি মৌলিক ঐক্য ভারতের ইতিহাসকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় ইতিহাসের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা

(১) প্রাকৃতিক বৈচিত্র—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিলে ভারতকে মহাদেশের আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উত্তরে ও পূর্বে পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে সমুদ্র ভারতকে ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্রের মধ্যে বহুতর বৈচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে দারুণ শীতের প্রকোপ—যেমন হিমালয় অঞ্চল, আবার কোন অঞ্চল প্রচণ্ড উত্তাপের কবলিত যেমন করোমণ্ডল ও কোঙ্কন উপকূল। কোথাও প্রচণ্ড বারিপাত—যেমন চেরাপুঞ্জি, আবার কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি যেমন রাজপুতানা ও সিন্ধু প্রদেশ। কোথাও অত্যুচ্চ পর্বতমালা, আবার কোথাও নিম্নসমতল ক্ষেত্র।

ভৌগলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার বৈচিত্র

(২) **জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্নতা :** জাতি গোষ্ঠীর দিক দিয়াও ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে বৈচিত্র্যের নানাবিধ উপাদান লক্ষ্য করিয়াই স্মিথ ভারতকে 'পৃথিবীর যাদুঘর (ethnological museum) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দৈহিক গঠনের দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে অন্ততঃ সাতটি বিভিন্ন জাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বহু প্রাচীনকাল হইতে বহু বহিরাগত জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় জনসমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রস্তর যুগের অধিবাসী ও দ্রাবিড়গণের রক্ত ভারতীয় অধিবাসীদের এক বিশিষ্ট অংশের মধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে। প্রাচীন যুগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আর্য, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, মধ্যযুগে তুর্কী, আফগান ও মোগল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। অপর দিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে অহোম ও বর্মীগণও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ফলে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সংমিশ্রণ এমন নিগূঢ়ভাবে ঘটিয়াছে যে বর্তমান ভারতে দৈহিক গঠন ও জাতি গোষ্ঠীর দিক দিয়া উহাদের স্বাতন্ত্র্যতা অনুভব করা একরূপ অসম্ভব। স্মিথ যথার্থই বলিয়াছেন যে ভারতের আধুনিক কালের জনসমাজে জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এমন ভাবে ঘটিয়াছে যে উহাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যতা অনুভব করা যায় না।

'পৃথিবীর যাদুঘর'

বিদেশীগণের আগমন ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ

স্মিথের মন্তব্য

(৩) **ভাষার বিভিন্নতা :** ভাষার দিক দিয়াও বিভিন্নতার অন্ত নাই। আর্যদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু নিরক্ষর জনসাধারণের ভাষা ছিল প্রাকৃত। আর্যাবর্তের বিভিন্ন ভাষাগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে উৎপত্তি লাভ করিলেও দক্ষিণ ভারতের ভাষার সহিত ইহাদের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট। আবার দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যেও সুস্পষ্ট বিভিন্নতা রহিয়াছে। মূলতঃ ভারতে ১৪টি পৃথক ভাষাভাষী জনসংখ্যা রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব সাহিত্য রহিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতে দুই শতেরও অধিক ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে।

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা

(৪) **ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির বিভিন্নতা :** ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা যায়। বিশ্বের প্রধান ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র হইল ভারত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, খৃষ্ট প্রভৃতি সকল ধর্মই ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক রীতি-নীতির

মধ্যেও বিভিন্নতা রহিয়াছে। "নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধান" সমন্বয়ে ভারতের বর্তমান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) **রাজনৈতিক অনৈক্যঃ** উল্লিখিত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা হেতু প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যও সমগ্র ভারতকে রাজনৈতিক ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে নাই। আর্যাবর্তে এক রাজা বা রাজবংশের প্রভুত্ব বহুবার স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু কোন রাজবংশই স্থায়ী ভাবে অধিক দিন সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

রাজনৈতিক ঐক্যের অস্থায়িত্বতা

ঐক্যের আদর্শঃ কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার অন্তরালে একটি ঐক্যের স্রোত প্রাচীনকাল হইতেই বহিয়া আসিতেছে। যদিও মোগল ও ইংরাজ শাসনের পূর্বে প্রকৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় নাই, তথাপি সমগ্র ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের আদর্শ বিদেশীগণের কৃতিত্ব বা উহাদের সৃষ্টি নহে। বহু প্রাচীনকালেই ভারতীয় ঐক্যের ধারণা ভারতবাসীর মনে উদয় হইয়াছিল। পর্বতমালা ও সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি জগৎ—এই ধারণা ভারতবাসীর মনে সুপ্রাচীনকালেই উদয় হইয়াছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই প্রাচীন ভারতবাসী সমগ্র দেশকে ভরত-রাজার দেশ বা ভারতবর্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। ঋগ্বেদে বর্ণিত ভারত-রাজ সুদাসের সহিত তথাকথিত 'দশ রাজার-যুদ্ধ' এবং সুদাসের জয়লাভ ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় হইতেই বিজয়ী রাজার সার্বভৌমত্ব ও তাঁহার প্রতি পরাজিত রাজন্যবর্গের আনুগত্যের স্বীকৃতি হিন্দু-রাষ্ট্রনৈতিক বিধানের এক স্থায়ী নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। 'অধিরাজ', 'রাজাধিরাজ', 'সম্রাট', 'একরাট' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ এবং রাজসূয় ও বাজপেয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রাচীন ভারতে একচ্ছত্র শাসনের সুস্পষ্ট ধারণার নিদর্শন।* মহাপদ্ম নন্দই সর্বপ্রথম সার্বভৌম রাষ্ট্র-গঠনের আদর্শকে যথার্থ কার্যকরী করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া মৌর্য ও গুপ্তরাজগণ সমগ্র দেশে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন।

ভারতের স্বাতন্ত্র্যতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার সম্পর্কে ধারণা অতি প্রাচীন

প্রাচীন নৃপতিগণ কর্তৃক রাজত্বসূচক উপাধি গ্রহণ

মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপনের চেষ্টা মৌর্য ও গুপ্তরাজগণ

---

* "The digvijayas of later times which left the local rulers undisturbed was the logical outcome of the theory of fhe paramount king—the Samrat" (Panikkar)

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঃ ডক্টর সরকার (যদুনাথ)-এর মতে ঐতিহাসিক ঐক্য যথার্থভাবে একমাত্র জনগণই সৃষ্টি করিতে পারে। এক শাসনব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করিয়া উহার সাফল্য ও অসাফল্য সমভাবে উপভোগ করাই এইরূপ ঐক্যের চরম নিদর্শন। এইরূপ ঐক্য মোগল সম্রাটগণ ভারতে স্থাপন করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটগণ ভারতে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, একই ধরণের আইন ও সমাজব্যবস্থা, এক মুদ্রা ও এক রাষ্ট্রীয় ভাষা (ফার্সী) প্রচলন করিয়া ভরতকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

সরকারের মন্তব্য

মোগল কৃতিত্ব

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসকগণ অধিকতর অনুকূল পরিবেশের মধ্যে মোগল-প্রদর্শিত আদর্শ বহুলাংশে অনুসরণ করিয়া ভারতে এক শক্তিশালী অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মনে এক অভূতপূর্ব একত্ববোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার চরম পরিণতি হইল ভারতের স্বাধীনতা।

ব্রিটিশ আমলে যথার্থ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন

সাংস্কৃতিক ঐক্য (ভাষা ও ধর্ম) ঃ বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় এবং বিভেদের মধ্যে মিলন সাধন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। ইহা স্বীকার্য যে বর্তমানের ভারতীয় জনসমাজ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত হইলেও সর্বভারতীয় আদর্শে সকলেই অনুপ্রাণিত এবং এক সংস্কার, এক ঐতিহ্য ও এক সাহিত্য গঠনে সকলেই সমভাবে যত্নবান।

ইহার কারণ হইল ঃ—(ক) **তীর্থস্থান**—বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত তীর্থস্থানগুলি সকল ভারতীয়দের নিকট পরম পুণ্যভূমি। এই সকল তীর্থভূমিতে বহুকাল হইতে গমনাগমনের ফলে ভারতবাসীর মনে যে ঐক্য সূত্র গ্রথিত হইয়াছিল তাহা রাজনৈতিক বন্ধন অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়।

(খ) **সংস্কৃত অধ্যয়ন ঃ** সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নের পীঠস্থান স্বরূপ বারাণসী, মথুরা নালন্দা, তক্ষশীলা ও নবদ্বীপ প্রভৃতি সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের সমাবেশ হইত। ফলে উহাদের মনে সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছিল।

(গ) **ধর্ম-প্রচার ঃ** শঙ্করাচার্য, চৈতন্য প্রমুখ পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকগণের ধর্মপ্রচারের ফলে সকল ভারতবাসীর মনে ধর্মীয় ঐক্যের আদর্শ সঞ্চারিত হইয়াছিল। ধর্মীয় ঐক্যবোধ সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের সহায়ক হইয়াছিল।

(ঘ) **সাহিত্য ঃ** প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দ্রাবিড় ভাষাগুলি ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলির উৎপত্তিস্থল হইল সংস্কৃত। কালক্রমে দ্রাবিড় জাতিও আর্য-সংস্কৃতি ও আর্য-ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

সুতরাং ভারতের সর্বত্র ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ঐতিহ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রকৃতিগত সাম্য ঃ সাধরণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে আর্য, অনার্য, শক, হূণ, যবন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও উপাজাতিদের সংমিশ্রণে ভারতীয় জনসমাজ গঠিত হইলেও কয়েকটি কারণে ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত সাম্য ও আচার ব্যবহারে সাম্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণগুলি হইল, বহুদিন ধরিয়া একত্রে বসবাস, একই শাসনযন্ত্র দ্বারা শাসিত ও প্রায় একই ধরণের খাদ্যের প্রচলন।*

প্রশ্নমালা

1. Give an estimate of the influence of man and his environment on the history of a people.

2. Give an estimate of the influence of Geography on the history of India.

3. Give an account of the Physical features of India and estimate their political significance.

4. Enumerate the sources for reconstructing the ancient history of India.

5. "India offers unity in diversity"—Elucidate.

6. Discuss the importance of the foreign accounts as an aid for the reconstruction of the ancient Indian history.

---

* **হার্বাট রিজলে-এর (H. Risley) মন্তব্য** "Beneath the manifold diversity of Physical and social types, language, custom and religion which strikes the observer in India, there can still be discerned a certain underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Commorin. There is in fact an Indian character, a general Indian personality which we cannot resolve into its component elements."

প্রথম অধ্যায়

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

(Alexander's Invasion of India)

আলেকজাণ্ডারের অভিযান ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি ছিলেন ম্যাসিডন-রাজ ফিলিপের পুত্র। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল্ ছিলেন তাঁহার গৃহ শিক্ষক। কিন্তু এ্যারিষ্টটলের দর্শন শিক্ষা অপেক্ষা হারকিউলেস, কাইসার প্রভৃতি মহান-বীরযোদ্ধাদের কীর্তিকলাপ-শ্রবণে তিনি অধিক উৎসাহ পাইতেন। খৃষ্ট পূর্ব ৩৩৫ অব্দে ফিলিপের মৃত্যু হইলে আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তাঁহার বয়স ছিল কুড়ি। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী ও দিগ্বিজয় করাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সিংহাসনে আরোহণের দুই বৎসরের মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া (৩০ হাজার পদাদিক ও ৫০০০ অশ্বারোহী) খৃষ্ট পূর্ব ৩৩৪ অব্দে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হন।

ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা : পারসিক আক্রমণের প্রায় দুই শতাব্দী পরে ম্যাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের শেষের দিকে ভারত আক্রমণ করেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় সিন্ধুনদ সরকারী ভাবে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল, কিন্তু পাঞ্জাবের কোথাও পারসিক শাসনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অপর দিকে গ্রীক লেখকগণের বিবরণ অনুসারে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশদ্বয় সমেত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল রাজতান্ত্রিক এবং কতকগুলি ছিল গণতান্ত্রিক বা অভিজাতগণ কর্তৃক শাসিত রাজ্য যেমন (১) কাবুলের উত্তরে কুনার ও সোয়াট নদীর উপত্যকায় অবস্থিত অশ্বক রাজ্য, (২) সোয়াট অঞ্চলে অশ্বক জাতির অপর একটি রাজ্য—অশ্বকায়ন। ইহার রাজধানি ছিল মস্সগ (Massaga) নগর ; (৩) সোয়াট উপত্যকার কোহিমোর নামক পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত নাইসা (Nysa) রাজ্য। ইহা ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য এবং ইহার শাসনভার অভিজাতগণকে লইয়া গঠিত একটি সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল ; (৪) কাবুল ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পুষ্কলাবতী

বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারত বিভক্ত

রাজ্য। ইহা প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের একটি অংশ বিশেষ; (৫) প্রাচীন গন্ধার রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত তক্ষশীলা রাজ্য। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় তক্ষশীলা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। ইহা ছিল সুশাসিত ও সমৃদ্ধশালী; (৬) তক্ষশীলার উত্তরস্থ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত অভিসার রাজ্য; (৭) ঝিলাম নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত সৌভুতি (Sophytes) রাজ্য। ইহা ছিল সুশাসিত এবং ইহার সামাজিক অবস্থা ছিল সুদৃঢ়; (৮) চেনাব ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পৌরব রাজ্য। ইহার রাজা পুরু বা পৌরব নামে পরিচিত ছিলেন। পৌরব রাজ্যটি দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল—জ্যেষ্ঠ পুরু ও কনিষ্ঠ পুরুর রাজ্য। গ্রীক লেখকগণ জ্যেষ্ঠ পুরুর সাহসিকতা ও স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন; (৯) ঝিলাম ও চেনাব নদীর সঙ্গম স্থলের দক্ষিণে অবস্থিত শিবিরাজ্য। ইহা ছিল গণতান্ত্রিক; (১০) রাভি ও চেনার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত মল্ল রাজ্য। রাভির পূর্বতীরে অবস্থিত ক্ষুদ্রক রাজ্য। মল্লগণ ছিল সুনিপুণ যোদ্ধা। মল্ল ও ক্ষুদ্রকগণের মধ্যে শত্রুতা থাকিলেও উভয়রাজ্য যুগ্মভাবে আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতিতে বাধাপ্রদান করিয়াছিল; (১১) সিন্ধুদেশে অবস্থিত মৌসিকেনস রাজ্য। গ্রীক লেখকগণ মৌসিকেনস রাজগণকে ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে মনে হয় যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত বহু পরস্পর বিরোধী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। ইহাদের মধ্যে অনেকে এককভাবে শত্রুকে বাধাদান করিলেও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদহেতু উহারা সমবেত ভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে নাই।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান (Alexander's Invasion): খৃষ্ট পূর্ব ৩৩৪ অব্দে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে পারস্য অভিযানে অগ্রসর হইলেন।

পারস্য জয়

বিনা বাধায় তিনি এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর জয় করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে তিনি পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পারস্যসম্রাট তৃতীয় দারায়ুস আরবেলার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হইলেন। আলেকজাণ্ডার পারস্যের রাজধানী পার্সিপলিস অধিকার করিয়া উহা বিধ্বস্ত করিলেন। ইহার পর সিস্তান গ্রীক-বাহিনীর হস্তগত হইল। আফগানিস্থান ও ব্যাকট্রিয়াও গ্রীকবাহিনীর হস্তগত হইল। খৃঃ পূঃ ৩২৮ অব্দের মধ্যে আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য ও আফগানিস্থান দখল করিলেন। তিনি 'পারস্যের মহান রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

আফগানিস্থান ও ব্যাকট্রিয়া জয়

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাবুলের সন্নিকটে কয়েকটি স্থানে সৈন্য শিবির স্থাপন করিয়া আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলা ও সিন্ধু উপত্যকার রাজন্যবর্গকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে আহ্বান করিলেন। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে তাঁহার রাজ্যের নিরাপত্তার বিনিময়ে তিনি আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অম্ভি শুধু প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তিনি আলেকজাণ্ডারের নিকট প্রচুর উপঢৌকনও পাঠাইলেন। "ভারতের ইতিহাসে ইহাই হইল দেশদ্রোহিতার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত" (ডাঃ রমেশ মজুমদার)। অম্ভি ছাড়াও আলেকজাণ্ডার কোফিউস (Copheus), শশীগুপ্ত (Sisikottas), সঞ্জয় (Sangaeus) প্রভৃতি রাজন্যবর্গের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য লাভ করিলেন।

গ্রীক বাহিনীর হিন্দুকুশ অতিক্রম

অম্ভির দেশদ্রোহিতা

কাবুল উপত্যকার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলে পুষ্কলাবতীর রাজা অষ্টক আলেকজাণ্ডারকে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু অষ্টক পরাজিত ও নিহত হইলে পুষ্কলাবতী গ্রীকবীরের পদানত হইল।

পুষ্কলাবতী অধিকার

আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলে অশ্বর জাতি প্রাণপণে আলেকজাণ্ডারকে বাধা প্রদান করিল। একমাস যুদ্ধ চলিবার পর অশ্বক প্রজাতন্ত্রের অবসান হইল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে অসংখ্য অশ্বকবাসী আলেকজাণ্ডারের হস্তে নিহত হইল এবং চল্লিশ হাজার অশ্বকবাসী বন্দী হইল।

অশ্বক বিজয়

অতঃপর আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশীলায় প্রবেশ করিলেন। রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আক্রমণকারীকে অভ্যর্থনা করিলেন। আলেকজাণ্ডারও অম্ভিকে যথোচিত সম্মান করিলেন। তক্ষশীলায় অবস্থানকালে অভিসার জাতির নেতা আলেকজাণ্ডারের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তক্ষশীলার রাজা ও অভিসার রাজার আত্মসমর্পণ

তক্ষশীলা হইতে আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে পৌঁছিলেন। ঝিলাম রাজ্যের রাজা পুরুকে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে বলা হইল; কিন্তু পুরু উহাতে অস্বীকৃত হইলেন। গ্রীক গ্রন্থকারগণের বিবরণী অনুযায়ী পুরুর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৩০ হাজার পদাতিক, ৪ হাজর অশ্বারোহী, ৩ শত যুদ্ধরথ এবং ২ শত হস্তী। ঝিলাম নদীর তীরে গ্রীক

পুরুর রাজ্য আক্রমণ

বাহিনী ও পুরুর বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। আলেকজাণ্ডার পুরুর অজ্ঞাতে ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়া পুরুকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পুরু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। পুরুর রাজ্য পুরুকে প্রত্যর্পিত হইল এবং মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ আরও কয়েকটি রাজ্য পুরুকে পুরস্কার দেওয়া হইল। বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে 'বুকেফালা' ও 'নিকয়া' নামে দুইটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলেকজাণ্ডার ও পুরুর মধ্যে মিত্রতা স্থাপন

ইহার পর আলেকজাণ্ডার রাভি নদীর উপকূলে অবস্থিত প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি আক্রমণ করিয়া উহাদের বশ্যতা আদায় করিলেন। ইহার পর তিনি বিপাশা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে গ্রীকসৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। আলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্যবাহিনীর মত পরিবর্তন করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে অগত্যা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। যদিও সমগ্র ভারত জয় করাই আলেকজাণ্ডারের অভিপ্রেত ছিল কিন্তু তাঁহাকে বিপাশা নদী হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। ইহার কারণ ছিল (১) বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ করিয়া গ্রীক সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; (২) দীর্ঘকালব্যাপী পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা সৈন্যগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; (৩) পাঞ্জাবে ভারতীয়দের প্রবল বিরোধিতা ও ভারতীয়দের শৌর্যবীর্যের পরিচয় গ্রীক সৈন্যগণের মনে এক দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল।

রণক্লান্ত গ্রীক সৈন্যদের মনে ভীতির সঞ্চার

এই অবস্থায় আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ঝিলাম ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনভার পুরুর উপর এবং সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনভার অম্ভির উপর অর্পণ করিয়া আলেকজাণ্ডার একটি সৈন্যদলকে সেনাপতি নিয়ার্কসের অধীনে সাগর পথে পারস্যে পাঠাইলেন এবং অবশিষ্টাংশ সৈন্য লইয়া তিনি স্বয়ং পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া পারস্য অভিমুখে রওনা হইলেন। খৃষ্ট পূর্ব ৩২৪ অব্দে আলেকজাণ্ডার পারস্যের সুসা নগরে পৌঁছিলেন এবং পর বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে) মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ব্যাবিলন শহরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আলেকজাণ্ডারের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের প্রকৃতি ঃ আলেকজাণ্ডার ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা ছিলেন না এবং দস্যুর মত লুণ্ঠন করাও তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্য স্থাপন করাই তাঁহার অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম হইতেই সিন্ধু-উপত্যকায় অবস্থিত ভারতীয় প্রদেশগুলিকে

স্থায়ীভাবে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বিজিত অঞ্চল সমূহে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একাধিক শহরের পত্তন, এবং জল ও স্থলপথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করা প্রভৃতি তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী মনের পরিচায়ক। কিন্তু অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তাঁহার ভারতীয় সামরিক সাফল্য স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে নাই।

আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারতে বিজিত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা : আলেকজাণ্ডার শুধু রাজ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বিজিত রাজ্যগুলিকে স্থায়ীভাবে ম্যাসিডনিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করারও উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আরিয়ানের বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনি ভারতে বিজিত অঞ্চলগুলিকে পাঁচটি প্রদেশ বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে প্রকজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

পাঁচটি প্রদেশে বিজিত অঞ্চল বিভক্ত

যেমন (১) কাবুলের উত্তরাংশে একটি প্রদেশ গঠন করিয়া অক্সিয়ার্টেস (Oxyartes)-কে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। (২) কাবুলের দক্ষিণাংশ হইতে চেনাব নদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল লইয়া আর একটি প্রদেশ গঠন করিয়া ফিলিপকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। (৩) দক্ষিণে সিন্ধু উপত্যকার কিছু অংশ লইয়া তৃতীয় প্রদেশটি গঠিত হয় এবং পেইথন উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ঝিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চতুর্থ প্রদেশটি গঠিত হয় এবং তক্ষশীলার রাজা অম্ভি উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। (৫) ঝিলাম নদী হইতে বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পঞ্চম প্রদেশটি গঠিত হয় এবং পুরু উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শেষোক্ত দুইটি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং তথায় কোন গ্রীক কর্মচারী বা শাসক নিযুক্ত করা হয় নাই।

বিজিত রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আলেকজাণ্ডার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কয়েকটি নগর ও গ্রীক সৈন্য শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরগুলি গ্রীক কর্মচারী দ্বারা শাসিত হইত। নগরগুলি সাধারণতঃ নদীর উপকূল ভাগেই স্থাপন করা হইয়াছিল যাহাতে ম্যাসিডনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য উৎকর্ষ লভে করে।

নগর ও সৈন্য শিবির স্থাপন

ভারতে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য অধিক দিন স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে নাই। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর অনতিকাল মধ্যেই ভারতীয় অঞ্চলে গ্রীক আধিপত্য বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করিয়া লন।

গ্রীক শাসনের অবসান

ভারতীয়দের পরাজয়ের কারণ : (Causes of the defeat of Indians) : স্মিথের মতে আলেকজাণ্ডারের সাফল্যের কারণ হইল ভারতীয়

সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা ও ইওরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রীকবাহিনীর দক্ষতা। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য ও সুষ্ঠু সংগঠন ভারতীয়দের পরাজয়ের অপর কারণ। ভারতীয় রাজন্যবর্গ সমবেতভাবে আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা এককভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ তক্ষশীলার রাজা অম্ভির দেশদ্রোহিতা এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে অপরাপর রাজগণের বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ গ্রীকগণের সাফল্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলাফল (Effects of Alexander's Invasion) : "The importance of the Indian campaigns of Alexander has been both exaggerated and underestimated" (Paul Masson) অনেকের মতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে ভারত সম্পূর্ণভাবে গ্রীক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার কাহারো মতে এই আক্রমণ ভারতবাসীর উপর কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারে নাই।

আলেকজাণ্ডার মাত্র ১৯ মাস ভারতে ছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র দুই বৎসর কাল গ্রীক অধিকার অব্যাহত ছিল। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অভিযান ভারতের ইতিহাসের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই বা ভারতবাসীর জীবনধারার উপরও কোন রেখাপাত করে নাই। স্মিথের কথায় "Alexander's fierce campaign produced no direct effects upon the ideas and institutions of India"। বস্তুতঃ তাঁহার পরিকল্পনা যতই মহান হউক না কেন ভারতে তাঁহার স্বল্পমেয়াদী অবস্থান সেই পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করার পক্ষে বা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি গ্রীক ভাবধারায় প্রভাবিত করার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। সামরিক দিক হইতেও এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। কারণ প্রথমতঃ, আলেকজাণ্ডার কর্তৃক অনুসৃত রণ-নীতি ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিতে পারে নাই এবং উহা গ্রহণ করিতেও ভারতবাসীকে উৎসাহিত হইতে দেখা যায় নাই। বরং ভারতবাসী উহাদের প্রচলিত পুরাতন রণ-নীতি ও সমরোপকরণেই বিশ্বাসী রহিল। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই আলেকজাণ্ডারের অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের রাজনৈতিক ভার-কেন্দ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার বহুদূর হইতেই তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। ভারতের কোন প্রথম শ্রেণীর নৃপতির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় নাই। মগধের সামরিক শক্তিতে ভীত

প্রত্যক্ষ ফল নগণ্য

গ্রীকবাহিনীর অধিক দূর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। এই সকল কারণেই সম্ভবতঃ সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে রচিত ভারতীয় সাহিত্যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের অথবা গ্রীক শাসনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রত্যক্ষ ফল

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল হইল—(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা। ইহাদের কয়েকটি বহুদিন পর্যন্ত টিকিয়া ছিল এবং সম্রাট অশোকের শিলালিপিতেও উহাদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

(২) আলেকজাণ্ডারের স্থলপথ ও জলপথে অভিযান চালাইবার ফলে ভারত সম্পর্কে ভৌগলিক ও অপরাপর জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। স্মিথের কথায় আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফল হইল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন ও প্রাচ্যের বিচ্ছিন্নতার অবসান। অবশ্য হ্যাভেল-এর মতে আলেকজাণ্ডারের অভিযান পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে কোন নূতন পথের সন্ধান দেয় নাই। বরং আলেকজাণ্ডারের পূর্বেই পারসিকগণ সেই পথের সন্ধান দিয়াছিল।

পরোক্ষ ফল

ভারতের ইতিহাসে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফলই অধিক গুরুত্বপূর্ণ যেমন—

(১) **রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঃ** আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও পাঞ্জাবের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিয়া আলেকজাণ্ডার উহাদিগকে এক শাসনাধীনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে উত্তর ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল।

(২) **প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ঃ** এই অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সূত্র ধরিয়াই পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(৩) **সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় ঃ** (ক) উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও মধ্য এশিয়ায় যে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল উহাদের মাধ্যমে ভারতের সহিত ইওরোপের ভাব বিনিময় সম্ভব হইয়াছিল। মৌর্য যুগে ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত না হইলেও মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্পকলার উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে গান্ধার শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। (খ) স্মিথের মতে 'মহাযান' বৌদ্ধধর্মমতে যেটুকু পৌত্তলিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা গ্রীক পৌত্তলিকতারই প্রভাব। অপর দিকে 'নষ্টিক' বা তপশ্চর্যায় বিশ্বাসী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। (গ)

গ্রীক ও রোমান মুদ্রা ও দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ পদ্ধতিতেও ভারতীয় ভাস্কর্য ও শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রেও গ্রীক প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাব যেভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল তেমনি ভারতীয় প্রভাবও গ্রীক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। স্মিথের কথায় "ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক প্রভাব আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল"।

(৪) **ভারতীয় ইতিহাসের গ্রীক-উপাদান ঃ** আলেকজাণ্ডারের সহিত বহু গ্রীক মনীষী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত ভারত সম্পর্কিত বিবরণ ভারত ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। এই সকল বিবরণীতে মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগের বহু ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলাফলের অস্থায়ীত্বতা

কয়েকটি কারণে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলাফল স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, তাঁহার অকালমৃত্যু ইহার প্রধান কারণ। তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিলে ভারতে বিজিত অঞ্চলসমূহের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব বজায় থাকিত। সম্ভবতঃ তিনি পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া গ্রীক শাসন বিস্তার করিতে যত্নবান হইতেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মাত্র ১৯ মাস ভারতে ছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহাকে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই কারণে বিজিত রাজ্যের সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। তৃতীয়তঃ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে মৌর্য-বংশের উত্থান পাঞ্জাবের গ্রীক শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

প্রশ্নমালা

1. Describe the condition of North-Western India on the eve of Alexander's invasion.
2. Describe Alexander's Campaigns in India.
3. Critically discuss the effects of Alexander's conquests.
4. "The importance of the Indian Campaigns of Alexander has been both exaggerated and under estimated"—Do you agree ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্য (Maurya Empire)

মৌর্যবংশের গুরুত্ব (Importance of Maurya Dynasty) ঃ মৌর্য বংশের রাজত্বকাল (৩২৪-১৮৫ খৃঃ পূঃ) ভারতের ইতিহাসে এক নব-যুগের সূচনা করিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহা এক গৌরবময় যুগ। প্রথমতঃ, সুদক্ষ মৌর্যরাজগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া এবং গণতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক রজ্যগুলির বিনাশসাধন করিয়া উত্তর ভারতে এক বিশাল অখণ্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকশাসনের উচ্ছেদ করিয়া মৌর্যরাজগণ ভারতের সীমান্ত নিরাপদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, এই যুগেই পূর্বতন শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল এবং বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এই যুগেই সর্বপ্রথম প্রকৃত জাতীয় জীবনের সূচনা হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, মৌর্যরাজ বংশের আমলেই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে বিশ্বের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল এবং ভারত শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক বলিয়া বিশ্বের দারবারে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ এযাবৎ ভারতীয় সমাজে আর্য ও অনার্যদের যে পার্থক্য বলবৎ ছিল মৌর্যযুগে উহার বিলুপ্তি ঘটে এবং ভারতের সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

মৌর্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদান (Sources) ঃ মৌর্যযুগে ভারতের অবস্থা ও মৌর্য শাসন প্রণালী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) **গ্রীক বিবরণ ঃ** আলেকজাণ্ডারের সহিত বহু গ্রীক গ্রন্থকারগণ এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তিগত পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা ও বহু প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি নিজ নিজ বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন। সেযুগের ইতিহাস রচনায় এই বিবরণীগুলির গুরুত্ব স্বীকার্য হইলেও নির্ভুল তথ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং বহু ক্ষেত্রে দোভাষীয় সাহায্য লইয়া ও বহুক্ষেত্রে কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা নিজেদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক ঘটনা বিকৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানের নাম তাহারা নিভুর্লভাবে উল্লেখ না করিতে পারায় সেগুলির বিবরণ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মৌর্য রাজসভায় গ্রীক রাষ্ট্রদূতগণের

মধ্যে মেগাস্থিনিস ও ডেইমেকাসের নাম উল্লেখযোগ্য। মেগাস্থিনিস ও ডেইমেকাস যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন।

(২) **মেগাস্থিনিসের বিবরণ**ঃ আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর ভারতের সহিত গ্রীকরাষ্ট্রগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু গ্রীক রাজপুরুষ ও রাষ্ট্রদূত মৌর্য ও পরবর্তী ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মেগাস্থিনিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সিরিয়ার অধিপতি সেলিউকসের রাজদূত হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। তিনি একাধিক্রমে কয়েক বৎসর এদেশে অবস্থান করিয়া মৌর্য শাসন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। মূল গ্রন্থখানির অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ডিওডোরাস (Diodorous), ষ্ট্রাবো (Strabo), আরিয়ান (Arrian), প্লুটার্ক (Plutarc), জাষ্টিন (Justin) প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান লেখকগণের গ্রন্থে 'ইণ্ডিকার' অনেক অংশ উদ্ধৃত করা আছে।

(৩) **প্রাচীন সাহিত্য**ঃ পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি এবং প্রচীন সংস্কৃত, পালি ও প্রকৃত সাহিত্যেও মৌর্যযুগের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন বিশাখ দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত নন্দবংশের বিরোধ ও চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মগধের সিংহাসন অধিকার, কৌটিল্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের শত্রুদের বিনাশ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া এই নাটক হইতে সে যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থায় বিবরণ পাওয়া যায়।* সিংহলী ভাষায় রচিত 'মহাবংশ', ও 'দীপবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থে মৌর্যযুগের বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। হেমচন্দ্র রচিত 'পরিশিষ্ট-পর্ব', পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'—প্রভৃতি গ্রন্থেও মৌর্যযুগের বহু উপাদান রহিয়াছে।

(৪) **কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র**ঃ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা চাণক্য বা কৌটিল্য কর্তৃক রচিত 'অর্থশাস্ত্র' হইতে মৌর্যযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় একখানি অমূল্য গ্রন্থ। 'ইণ্ডিকার' সহিত 'অর্থশাস্ত্রের' পার্থক্য থাকিলেও উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মৌর্য-শাসনব্যবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৫) **অশোকের অনুশাসন লিপি**ঃ মূলতঃ ধর্মীয় ও নীতিমূলক

* বিশাখ দত্ত সম্পর্কে সিলভিন লেভি-র মন্তব্য "The author of the Mudrarakshas deserves to be compared to Corneille. Both, in bringing politics on to the stage, have had happily inspired courage to choose the sentiment of admiration as the mainspring of drama."

উপদেশদানের উদ্দেশ্যেই অশোকের অনুশাসন লিপিগুলি রচিত হইলেও সেগুলি হইতে মৌর্যযুগের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) **পরবর্তীকালের অনুশাসন লিপিঃ** শক-শাসক রুদ্রদমনের জুনাগড়-শিলালিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খৃঃ পূঃ ৩২৪—৩০০)
(Chandragupta Maurya)

বংশ পরিচয়ঃ মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু কিংবদন্তীতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী হিন্দু কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা (মতান্তরে মাতামহী) মুরা ছিলেন শূদ্রাণী। নন্দরাজের উপপত্নী মুরার নাম অনুসারেই এই বংশকে মৌর্যবংশ বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্রবংশজাত অথবা মুরার পুত্র বা পৌত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই।

বিভিন্ন মতবাদ
হিন্দু কিংবদন্তী

পুরাণে বলা হইয়াছে যে নন্দবংশের পতনের পর মগধে শূদ্রবংশের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তির দ্বারা এইরূপ প্রমাণিত হয় না যে চন্দ্রগুপ্ত বা পরবর্তী রাজগণ সকলেই শূদ্রবংশ-জাত ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যবদনে বিন্দুসার ও অশোককে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটকে ও পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক সংকলিত 'বৃহৎ-কথা' গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশসম্ভূত বলা হইয়াছে।

পুরাণ

অপর দিকে 'মহাবংশ', 'দিব্যবদন' ও 'মহাপরিনির্বাণ' সূত্রে চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় 'মোরিয়'-বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জৈন গ্রন্থ 'পরিশিষ্ট-পার্বণে' চন্দ্রগুপ্তকে 'ময়ূর-পোষক' নামক গ্রামের নায়কের দৌহিত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উত্তর-ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলিবন নামক স্থানে 'মোরিয়' নামে শাক্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক ক্ষত্রিয় বংশ রাজত্ব করিত। এই 'মোরিয়' কথাটি হইতে মৌর্যবংশের নামের উদ্ভব হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে পিপ্পলিবনের মোরিয়-বংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই কারণেই সম্ভবতঃ গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিন চন্দ্রগুপ্তকে হীনাবস্থা হইতে উদ্ভূত (born in humble origin) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জাষ্টিনের উক্তির দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের শূদ্রত্ব প্রমাণিত হয় না বা তাঁহার বংশের কৌলিন্যের অভাবও সূচিত হয় না।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদির সাক্ষ্য

উপরোক্ত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কিংবদন্তী, পুরাণ ও গ্রীক লেখকগণের বিবরণ অপেক্ষা বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সাক্ষ্য প্রমাণই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আধুনিক মত

চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ (Career)—বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত অবলম্বনহীনা মাতার সহিত পাটলিপুত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত তখন নিতান্তই শিশু। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাতা শিশুপুত্রকে এক গো-পালকের হস্তে সমর্পন করেন। পরে গো-পালকটি বালক-চন্দ্রগুপ্তকে এক শিকারীর নিকট বিক্রয় করেন এবং শিকারীটি তাঁহাকে গোচারণ-কার্যে নিযুক্ত করে। চন্দ্রগুপ্ত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজ গ্রামে সমবয়সীদের নেতা হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে এক সময় তক্ষশীলাবাসী চাণক্য (কৌটিল্য) সেই গ্রামে অবস্থানকালে চন্দ্রগুপ্তের রাজ সাদৃশ চিহ্নাদি ও তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিকারীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে হইয়া তক্ষশীলায় আগমণ করেন এবং তাঁহাকে সামরিক ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন। তক্ষশীলায় চন্দ্রগুপ্তের যৌবন অতিবাহিত হয়।

প্রথম জীবন

ইহার পর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে উচ্চশিক্ষার জন্য পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেন। সেই সময় পাটলিপুত্রে নন্দরাজ ধননন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন। নন্দরাজগণের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নন্দ-সাম্রাজ্যের সর্বত্র জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এই অবস্থায় উচ্চাকাঙ্খী যুবক চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদকল্পে গ্রীক সাহায্য লাভের আশায় আলেকজাণ্ডারের শিবিরে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কোনক্রমে চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্যে তক্ষশীলাবাসী সুচতুর ও সুপণ্ডিত চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ হয়। কোনও কারণে নন্দরাজ কর্তৃক অপমাণিত হওয়ায় চাণক্য প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতেছিলেন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের লক্ষ এক হওয়ায় চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। চাণক্যের চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একদল সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং উপযুক্ত সময়ে মগধের নন্দবংশের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য অস্ত্রধারণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের প্রথম দুইটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে নন্দরাজের বিরুদ্ধে

মগধের সিংহাসন অধিকারের বাসনা

গ্রীক শিবিরে গমন ও পলায়ন

চাণক্যের সহিত সাক্ষাৎ

নন্দরাজের বিরুদ্ধে অভিযান ও মগধের সিংহাসন অধিকার

চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকসৈন্যগণের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। 'মিলিন্দপঞ্হো, নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রে ১০ হাজার হস্তী, ১ লক্ষ অশ্বারোহী ও ৫ হাজার রথ চালক নিহত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগর অবরোধ করিয়া নন্দ-রাজাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজকে হত্যা করার পরিবর্তে তাঁহাকে সামান্য আসবাবপত্র ও তাঁহার দুই মহিষীকে লইয়া পাটলিপুত্র ত্যাগ করার আদেশ দেন। কিন্তু 'মহাবংশ-টীকা' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে নন্দরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্যবিস্তার ঃ নন্দবংশের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার অধিশ্বর হইলেন। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি অতঃপর উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে গ্রীকশাসনের উচ্ছেদ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এস্থলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় নৃপতিগণ আলেকজাণ্ডারের নিকট পরাজিত হইলেও কখনই তাঁহার বশ্যতা আন্তরিকভাবে স্বীকার করিয়া লন নাই। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের বণ্টন লইয়া তাঁহার সেনাপতিগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে ভারতে গ্রীকশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং গ্রীক-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীগণ গ্রীক-শাসনের উচ্ছেদকল্পে বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকগণের বিরুদ্ধে অভিযান

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের এইরূপ বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া গ্রীক-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে গ্রীকগণ পরাজিত হইল এবং খৃষ্ট পূর্ব ৩১৭ অব্দে গ্রীক সেনাপতি ইউডিমাস (Eudemus) ভারত ত্যাগ করিলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটিল।* মৌর্য ইতিহাসে গ্রীক শাসনের অবসান এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াই চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া তিনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হইলেন। পশ্চিম ভারতে মালব ও সৌরাষ্ট্র তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে সৌরাষ্ট্রে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকর্তা পুষ্যগুপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-ভারতে চন্দ্রগুপ্ত কতদূর রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন তাহা লইয়া

* চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মগধের সিংহাসনলাভ ও গ্রীক শাসনের অবসান এই দুইটি ঘটনার মধ্যে প্রথম কোনটি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মতে প্রথমে মগধের সিংহাসনলাভ ব্যর্থ হইলে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। গ্রীকগণের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জনের পর তিনি মগধের সিংহাসন দখল করেন।

মতভেদ আছে। কাহারো মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দক্ষিণ ভারত বিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আবার কাহারো মতে দক্ষিণ ভারত বিজয় বিন্দুসারের রাজত্বকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ডক্টর রায় চৌধুরী (হেমচন্দ্র)-র মতে নন্দরাজগণ কর্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজিত হইয়াছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই নন্দবংশের অবসানের পর দাক্ষিণাত্য চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।* প্রাচীন তামিল সাহিত্যে নন্দরাজগণ ও তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্যের উল্লেখ আছে। মহীশূরে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে নন্দ সাম্রাজ্য উত্তর মহীশূরের কুন্তল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতে নন্দ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির বহু উল্লেখ থাকিলেও এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে উক্ত অঞ্চলে নন্দরাজগণের প্রভুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং মৌর্যরাজগণকে নূতন করিয়া দক্ষিণ-ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার করিতে হইয়াছিল। স্মিথের মতে বিন্দুসারের রাজত্ব-কালেই দক্ষিণ ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থাকার তারানাথের গ্রন্থ অবলম্বনে স্মিথ মনে করেন যে বিন্দুসার ১৬টি রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন করিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়

বিভিন্ন মত

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই দক্ষিণ ভারত বিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হরিসেন কর্তৃক রচিত 'বৃহৎ-কথা-কোষ', রত্নানন্দ কর্তৃক রচিত 'ভদ্রবাহু-চরিত' ও 'জৈন' গ্রন্থাদিতে দক্ষিণ ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিন্দুসার কর্তৃক দক্ষিণ ভারত জয় সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ রাজ্য-বিস্তারের মত উপযুক্ত ক্ষমতা বিন্দুসারের ছিল না। রাজ্য জয় করা অপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রেই বিন্দুসার অধিক আনন্দলাভ করিতেন।

আধুনিক মত

রাজত্বের শেষের দিকে চন্দ্রগুপ্তকে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি ও ব্যাবিলনের অধীশ্বর সেলিউকসের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ভারতে গ্রীকবিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের আশায় সেলিউকস সসৈন্যে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়া খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সিন্ধু অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। চন্দ্রগুপ্ত সসৈন্যে সেলিউকসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না এবং যুদ্ধ আদৌ হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো শুধু সন্ধির কথাই

সেলিউকসের সহিত যুদ্ধ

* "The existence on the Godavari of a city called Nan-Nanda Dehra suggests' that the Nanda dominions embraced a considerable portion of the Deccan' (Roy Choudhuri).

উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভেরই ইঙ্গিত করে। সন্ধির সর্তানুসারে সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্থান প্রদান করেন এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসকে পাঁচ শত হস্তী উপহার প্রদান করেন। ইহার পর সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামক একজন রাজদূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠাইয়াছিলেন। এই সন্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে স্মিথ বলেন যে দুই হাজার বৎসরের অধিক পূর্বে প্রথম ভারতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তের অধিকার লাভ করেন—যাহা মোগল সম্রাটগণ বা ইংরাজগণ সমগ্রভাবে লাভ করিতে পারেন নাই।*

সেলিউকসের সহিত সন্ধি

সন্ধির গুরুত্ব

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি : (Extent of his Empire) : ডক্টর আর, কে, মুখার্জীর মতানুসারে "চন্দ্রগুপ্ত নিঃসন্দেহে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন"। প্লুটার্ক-এর মতে চন্দ্রগুপ্ত ৬,০০,০০০ সৈন্য লইয়া সমগ্র ভারত জয় করিয়াছিলেন। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে আফগানিস্থান ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। (১) নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধান করিয়া সমগ্র মগধরাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। (২) গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া তিনি পাঞ্জাব তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। (৩) সেলিউকসের নিকট হইতে তিনি কান্দাহার, কাবুল, হিরাট ও বেলুচিস্থান লাভ করিয়াছিলেন। (৪) রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপি অনুসারে পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। (৫) তামিল কবি মামুলনার রচনা অনুসারে দক্ষিণভারতে তিনেভেলি জেলা তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহীশূরে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে উত্তর মহীশূর তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এক কথায় পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও হিন্দুকুশ পর্বত এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে তিনেভেলি পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত

দক্ষিণ ভারত

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারতের প্রায় সকল অংশেই চন্দ্রগুপ্তের সম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

মৃত্যু : জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত পরিণত বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং

*"The first Indian emperor, more than two thousand years ago, thus entered into possession of that scientific frontier sighed for in vain by his English successors and never held in its entirety even by the Mughal monarchs of the 16th and 17th centuries." [Smith]

মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবর্ণবেলগোলা নামক স্থানে অনশনে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ২৯৮-২৯৬ খৃঃ পূঃ)।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব (An Estimate) : যোদ্ধা, সুদক্ষশাসক ও প্রজা-হিতৈষী রাজা হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। নন্দ রাজগণের অত্যাচার ও গ্রীকগণের শাসন হইতে তিনি ভারতবাসীকে মুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রীকগণকে ভারত হইতে বিতাড়ন ও সেলিউকসের সহিত যুদ্ধে সাফল্য অর্জন তাঁহার সামরিক প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁহার পূর্বে প্রাচীন ভারতে তাঁহার ন্যায় আর কেহই এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা

শুধু সাম্রাজ্য স্থাপনই তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নহে। শাসন ব্যাপারেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীভূত ও প্রজাকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস তাঁহর শাসনদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

সুশাসক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনারোহণের কাল নির্ণয় (Beginning of Chandragupta Maurya's Reign) : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। জৈন কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কারপেণ্টার (Charpentier) খৃঃ পূঃ ৩১৩ অব্দ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ষ্টেইন-এর মতে খৃঃ পূর্ব ৩১৮, ফ্লিট-এর মতে খৃঃ পূঃ ৩২০ ; স্মিথের মতে খৃঃ পূঃ ৩২২ ; রাধা কমল মুখার্জীর মতে খৃঃ পূঃ ৩২৩ ; কানিংহামের মতে খৃঃ পূঃ ৩২৫ এবং জয়স্বালের মতে খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দ।

স্মিথের মতে খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয় রাজন্যবর্গ গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে গ্রীক শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। একমাত্র ইউডিমাস কোনক্রমে ক্ষুদ্র অঞ্চলে গ্রীক শাসন অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হন। স্মিথের মতে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং তিনি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালাইয়া পাঞ্জাব দখল করেন কিন্তু স্মিথের মত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত অঞ্চলে গ্রীক শাসনের ভিত্তি প্রথম হইতেই দুর্বল ছিল। সুতরাং তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক শাসন উচ্ছেদ করার সুযোগ আসে এবং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন কারণ ছিল না।

পুনরায় স্মিথের মতে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করার পূর্বেই চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের

উচ্ছেদ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্মিথের এই মতও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পরেই চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে মগধের সিংহাসন দখল করা সম্ভব ছিল। 'মুদ্রারাক্ষস' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, যে সেনাবাহিনী লইয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন উহাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী ও গ্রীক সৈন্যগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গ্রীকগণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল এবং আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পূর্বেই চন্দ্রগুপ্ত যে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এতদ্ভিন্ন সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের ১৬২ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ ঘটিয়াছিল ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করেন ৩২৫ খৃঃ পূর্বাব্দে এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ৩২৩ খৃঃ পূর্বাব্দে। সুতরাং ২৩৫ হইতে ৩২৩ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ইহা বলা যায়।

বিন্দুসার—খৃঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ (Bindusar) ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার 'অমিত্রঘাত (শত্রুনিধনকারী) উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু বিষয়ে পিতার সহিত তাঁহার বৈষম্য থাকিলেও একথা স্বীকার্য যে তিনি পিতার নীতি ও সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে চাণক্য কিছুকাল বিন্দুসারের মন্ত্রী থাকিয়া রাষ্ট্রশাসনে তাঁহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অনেকের মতে বিন্দুসারের আমলে দাক্ষিণাত্য মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। অবশ্য সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে সম্রাট অশোক কেবলমাত্র কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের পেনার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নয় যে দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ বিন্দুসারের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তক্ষশীলার বিদ্রোহ। অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তক্ষশীলাবাসী বিদ্রোহী হইয়াছিল। যুবরাজ অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। কলিঙ্গ ছাড়া আর কোন রাজ্য তিনি জয় করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে উল্লেখ নাই। অবশ্য তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের বিবরণ অনুসারে চাণক্য ১৬টি রাজ্যের নৃপতি ও সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া বিন্দুসারের সাম্রাজ্য পূর্ব-সমুদ্র হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু

তারানাথের এই বিবরণ গ্রহণ যোগ্য নহে কারণ সৌরাষ্ট্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রহিয়াছে।

বিন্দুসার পিতার ন্যায় গ্রীকগণের সহিত সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মিশর রাজ দ্বিতীয় টলেমি ও সিরিয়ার অধিপতি এন্টিয়োকস্ যথাক্রমে ডেইমেকস (Deimechos) ও ডায়োনিসাসকে (Dionysus) বিন্দুসারের রাজসভায় রাজদূত হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেগেসেণ্ডার (Hegesander)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে বিন্দুসার সিরিয়ার অধিপতির নিকট একজন গ্রীকদার্শনিক, মিষ্টমদ ও কিছু শুষ্ক ডুমুর চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক আইন অনুসারে পণ্ডিত ব্যক্তির ক্রয় বা বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া এন্টিয়োকস গ্রীক দার্শনিক পাঠাইতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি বিন্দুসারের নিকট মিষ্টমদ ও শুষ্ক ডুমুর উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

বিন্দুসার ছিলেন শান্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে তিনি ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। পুরাণ অনুসারে তিনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অশোক—খৃঃ পূঃ ২৭৩-২৩২ (Asoka)

ঐতিহাসিক উপাদান : অশোকের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ হইতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) অশোকের শিলালিপি, (২) সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয় মহাবংশ ও দ্বীপবংশ এবং (৩) অন্যান্য বৌদ্ধ উপাখ্যান ও গ্রন্থাদি।

অশোকের সিংহাসন লাভ ও অভিষেক : অশোকের সিংহাসন লাভ ও অভিষেককাল নির্ণয় ব্যাপারে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। বৌদ্ধগ্রন্থ দীপবংশ অনুসারে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের ২১৪ বৎসর পরে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চারি বৎসর পর তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডক্টর মজুমদার-এর মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খৃঃ পূর্ব ৩২৪ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র বিন্দুসার (২৪+২৭) মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দে সম্পন্ন হয়। এই চারি বৎসর অভিষেকক্রিয়ায় বিলম্বের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 'দিব্যবদন' ও সিংহলীয় উপাখ্যান সমূহে অশোক ও তাঁহার ভ্রাতাগণের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের উল্লেখ আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে অশোক রাধাগুপ্ত নামে এক মন্ত্রীর সহায়তায় অপরাপর ৯৮ জন ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। এই কারণে

মতভেদ

অনেকে তাঁহাকে 'চণ্ডাশোক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্মিথ বলেন "ইহা সত্য যে অশোকের রাজ্যাভিষেক চারি বৎসর বিলম্বে হইয়াছিল এবং অশোক ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে যে জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে এই বিলম্ব তাহা সমর্থন করে"। কিন্তু স্মিথের মতে এই ভ্রাতৃ-বিরোধের কোন স্বতন্ত্র সাক্ষ্য নাই—সিংহলীয় উপাখ্যানে অশোক কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতাগণের প্রাণনাশের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা স্মিথ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। অশোকের অনুশাসন-লিপিতে তাঁহার রাজত্বের প্রথম অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী-গণের জীবিত থাকার উল্লেখ রহিয়াছে। অশোকের পঞ্চম প্রস্তর লিপিতে (Rock Edict V) তাঁহার ভ্রাতাগণের প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষনের কথা উল্লিখিত আছে। অবশ্য ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় না যে তাঁহার ভ্রাতাগণ জীবিত ছিলেন। অপর দিকে তাঁহার ভ্রাতাগণ জীবিত ছিলেন না—এইরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায় না। তবে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে সিংহাসন আরোহণের চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অশোকের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর রহস্যাবৃত এবং স্মিথের মতে "One of the dark spaces in the spectrum of Indian history".।

অশোকের প্রথম জীবন (Early life): অশোকের শিলালিপি ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে অশোকের রাজত্বকালের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় বটে কিন্তু এগুলিতে তাঁহার প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে বিন্দুসারের মহিষীদের সংখ্যা ছিল ১৬ এবং তাঁহার পুত্রদের সংখ্যা ছিল ১০১। সুশিমা ছিলেন জ্যেষ্ঠ, অশোক ছিলেন দ্বিতীয় এবং তিস্য ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র। উত্তর ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে অশোকের মাতার নাম ছিল সুভদ্রাঙ্গী। দক্ষিণ ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহার মাতার নাম ছিল 'ধর্ম'। সুভদ্রাঙ্গী ছিলেন চম্পাদেশীয় এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। অশোকের মাতা ব্যতীত বিন্দুসারের আরও অনেক পত্নী ও উপপত্নী ছিলেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে ১৮ বৎসর বয়সে অশোক প্রথমে উজ্জয়িনী ও পরে তক্ষশীলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে অশোক মহাদেবীকে বিবাহ করেন। তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করিয়া অশোক পিতার প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অশোক সিংহাসনে অরোহণ করেন এবং 'দেবানাম-পিয়-পিয়াদসী'-অর্থাৎ দেবতাগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই উপাধি ধারণ করেন। একমাত্র সাহিত্যে

প্রথম জীবন সম্পর্কে তথ্যাদির স্বল্পতা

উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলার শাসনকর্তা

সিংহাসনারোহণ

ও 'মাস্কি লিপি' ও 'জুনাগড়-লিপি' নামক দুইটি শিলালিপিতে অশোক নামটি পাওয়া যায়।

রাজত্ব কালের প্রথম চারি বৎসরের বিবরণ

অশোকের রজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসরের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পছন্দ করিতেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন পৌরাণিক ধর্মাবলম্বী। কলিঙ্গ যুদ্ধ তাঁহার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দেয় এবং তিনি বিশ্বের এক অন্যতম মহান সম্রাট বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন।

রাজত্বের প্রথম তের বৎসর অশোক পিতা ও পিতামহের অনুসৃত স্বদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার ও বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। তিনি স্বদেশে ছিলেন পররাজ্য গ্রাসী কিন্তু বহির্দেশে ছিলেন শান্তিকামী। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত তিনি রাষ্ট্রদূত বিনিময় করিতেন এবং বিদেশীগণকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করিতেও দ্বিধা করিতেন না। এই প্রসঙ্গে জনৈক যবন-কর্মচারী তুসাস্পার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কলিঙ্গ জয়ঃ অভিষেকের নবম বৎসরে (খৃঃ পূর্ব ২৬১) অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। সেই সময় কলিঙ্গ রাজ্য বাংলা-

যুদ্ধের কারণ

দেশের সুবর্ণরেখা নদী হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের ত্রয়োদশ প্রস্তর লিপিতে (Rock Edict XIII) এই যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল উল্লিখিত আছে। নন্দ রাজগণের আমলে কলিঙ্গ মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু প্লিনির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে কলিঙ্গ মগধের শাসনাধীন হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। অশোকের সময় কলিঙ্গ একটি পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং

যুদ্ধ

নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার্থে আশোককে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল। কলিঙ্গবাসী বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে পরাজিত হইল এবং উহা মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইল। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বান্দী ও প্রায় লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাইয়াছিল।

ফলাফল ও গুরুত্ব

কলিঙ্গ-যুদ্ধ মগধ তথা ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে এযাবৎ মগধ রাজগণ কর্তৃক অনুসৃত পররাজ্য গ্রাস-নীতি পরিত্যক্ত হইল এবং ইহার পরিবর্তে সাম্য, মৈত্রী, সামাজিক অগ্রগতি ও ধর্ম প্রচারের যুগ শুরু হইল। দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যক্ত হইলে এবং ধর্মবিজয় নীতি গৃহীত হইলে মগধের সামরিক শক্তিরও অবসান হইল। অশোক নিজে মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক হইয়া

উঠিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ হত্যালীলা ও কলিঙ্গবাসীর অপরিসীম দুর্দশা অশোকের মনে গভীর অনুশোচনার উদ্রেক করিয়াছিল। চিত্তের প্রশান্তির জন্য তিনি গতানুগতিক যুদ্ধ-নীতির পথ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন : কলিঙ্গ যুদ্ধ শুধু অশোকের ধর্মমতেরই পরিবর্তন করিয়াছিল এমন নহে পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ নীতিতেও উহা প্রতিফলিত হইয়াছিল। কলিঙ্গ প্রস্তর লিপিতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শাসকগণ যেন মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিতে ভীত না হন এবং তিনি তাঁহাদের দুঃখের কারণ না হইয়া সুখেরই কারণ হইবেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে ধর্ম বিজয়ই হইল একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিজয়। তিনি মৌর্য সম্রাটদের অনুসৃত দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্মবিজয় নীতি জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। এই নূতন নীতি ঘোষণা করা ছাড়াও অশোক তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণকে দিগ্বিজয় নীতি বর্জন করার উপদেশ দান করিলেন। এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার নিদর্শন স্বরূপ অশোক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্যগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করার কোন উদ্যোগ করেন নাই। বরঞ্চ উহাদের মিত্রতালাভেই তিনি অধিক যত্নবান হইয়াছিলেন।

দিগ্বিজয় নীতি বর্জন ও ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ

আভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তন : অশোকের ধর্মমতের পরিবর্তন পররাষ্ট্র নীতির ন্যায় আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। অতঃপর জনসাধারণের তথা জীব মাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিলেন :—

(ক) **শাসনতান্ত্রিক সংস্কার :** প্রথমতঃ, তিনি প্রতি তিন ও পাঁচ বৎসর অন্তর 'রাজুক' 'প্রাদেশিক' ও 'মহামাত্র' প্রভৃতি রাজকর্মচারীগণকে রাজ্য-পরিক্রমায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। 'যুত', 'রাজুক' ও 'প্রাদেশিকগণের' প্রধান দায়িত্ব ছিল ধর্ম প্রচার করা। 'মহামাত্রগণের প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ও অবিচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।

দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত কর্মচারীগণ ছাড়াও অশোক 'ধর্মমহামাত্র', ও 'ধর্মযুত' নামে আর এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ধর্মমহামাত্রগণের দায়িত্ব ছিল ধর্মপ্রচার করা এবং ব্রাহ্মণ, যবন ও জৈনগণকে রক্ষা করা ও স্থানীয় বিচারকার্য পরিচালনা করা।

তৃতীয়তঃ, ধর্মপ্রচারের সহায়ক হিসাবে তিনি ধর্মযাত্রা, ধর্মমঙ্গল, ধর্মসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও প্রথায় উৎসাহ দান করিতে থাকেন।

চতুর্থতঃ, রাজকীয় বার্তাবহগণকে নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজ্যের সকল সংবাদ ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্য পালন সম্পর্কে অবহিত থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(খ) **ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা :** শ্রেণী ও সম্প্রাদয় নির্বিশেষে অশোক সকলকে মৈত্রী ও অহিংসা পালনের উপদেশ দান করেন। রাজকর্মচারীদের সহায়তায় এবং শিলাস্তম্ভে ও পর্বত গাত্রে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব সমূহ সহজ ভাষায় উৎকীর্ণ করিয়া তিনি স্বদেশে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের বাহিরেও তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলন।

(গ) **জনকল্যাণমূলক কার্যাদি :** মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ সার্থক করার উদ্দেশ্যে অশোক মৃগয়া ও জীব হত্যা নিষিদ্ধ করেন, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করেন; জনসাধারণের উপকারের জন্য প্রশস্ত রাজপথ, অতিথিশালা, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন।

এইভাবে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া অশোক শাসনব্যবস্থাকে মানবধর্মী ও জনকল্যানকামী করিয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

অশোকের ধর্ম ও ধর্মনীতি (Asoka's Dharma and Religious Policy) : প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন শিবের উপাসক। কল্‌হন্ রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম তাঁহার হৃদয়ে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। চিত্তের প্রশান্তির জন্য তিনি উপগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অশোক কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ শুধু ভারত নহে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ

তাঁহার শিলালিপিতে (Minor Rock Edict I) উল্লেখ আছে যে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর উপগুপ্তের সহিত অশোক বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমনে বাহির হন। তিনি একে একে কপিলাবস্তু, লুম্বিনী, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। প্রত্যেক তীর্থস্থানে তিনি প্রচুর উপহার বিতরণ করেন ও বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারকল্পে তিনি রাজ্যের নানাস্থানে স্তূপ, স্তম্ভ ও পাহাড়ের গাত্রে বুদ্ধের বাণী সহজ ভাষায় উৎকীর্ণ করেন। দেশ-দেশান্তরে বুদ্ধের বাণী প্রচার কল্পে তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাদের আন্তরিক চেষ্টায় সিরিয়া, মিশর, এপিরাস, সিংহল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ সংঘের সহিতও অশোক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। সংঘের পবিত্রতা, সংহতি ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের প্রতি নানারূপ

বৌদ্ধ অশোক

বৌদ্ধ সংঘরে সহিত সম্পর্ক

উপদেশ দান করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থাদি ও বৌদ্ধ সংঘের নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে এই ধর্ম প্রচারকল্পে তিনি বহু কার্যকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি

অশোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের মধ্যে সংহতি স্থাপনের নিমিত্ত তিনি পাটলিপুত্র নগরে একটি বৌদ্ধ সংগীতি (তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি)* আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সংঘগুলি হইতে বহু অনাচার বিদূরিত হইয়াছিল।

অশোকের ধর্ম সম্পর্কে মতভেদ

অশোকের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম কিনা—এই প্রশ্ন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। অশোকের ধর্ম-নীতির সহিত বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্মের সাদৃশ্য থাকায় ঐতিহাসিক মহলে এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। ফ্লিটের মতে অশোকের ধর্ম ছিল সর্বতোভাবে নীতিমূলক। রিজ ডেভিস-এর মতে অশোকের ধর্মকে কোন একটি বিশিষ্ট ধর্ম না বলিয়া কর্তব্যকর্মের নীতি বলাই সমীচীন। পাণিকরের মতে অশোকের ধর্ম ও হিন্দুধর্ম অভিন্ন এবং যে বিচারে হর্ষবর্ধনকে বৌদ্ধ ও কুমার পালকে জৈন বলা হইয়া থাকে ঠিক সেই বিচারেই অশোককে বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে। অশোক প্রকৃতই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে উইলসন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ভাণ্ডারকর, বড়ুয়া, রায়-চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে অশোক যথার্থই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অশোকের প্রথম প্রস্তর লিপি (Minor Rock Edict I) উল্লেখ করা যাইত। ইহা হইতে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বৎসরাধিক-কাল গৃহী উপাসকের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের সপক্ষে যুক্তি

ভাবরু-লিপিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার আভাষ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্তূপ, স্তম্ভ ও পর্বত গাত্রে বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করা, বৌদ্ধ সংঘের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি ব্যাপারেও অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বুদ্ধকে ভগবৎ হিসাবে মনে করিতেন। বুদ্ধের বাণী সত্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণাও

* **বৌদ্ধ সংগীতি বা সভা ঃ**—বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যগণ মহা-কাশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহে এক অধিবেশনে মিলিত হন। এই সভা প্রথম 'বৌদ্ধ-সংগীতি' নামে পরিচিত। এই সভায় বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি এবং কনিষ্কের রাজত্বকালে শেষ বা চতুর্থ বৌদ্ধ-সংগীতির অধিবেশন হয়।

করিতেন। বৌদ্ধ তীর্থদর্শন বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে। বৌদ্ধ সংঘের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিতেও তিনি ছিলেন যত্নবান। অভিষেকের নবম বৎসরে অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেও অশোকের প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর উদার ও মানব-ধর্মী ছিল। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তাহা সকল ধর্মের মূল কথা। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের বিধান সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বুদ্ধের উপাসনা অথবা নির্বাণলাভের সম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই। বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করিয়া ধর্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতিই অধিক জোর দিয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন ধর্মমত প্রবর্তন বা বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার-সাধন করার চেষ্টা করেন নাই। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ; বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ এবং বৌদ্ধ সংঘের সহিত জড়িত থাকা সত্ত্বেও অশোক কতকগুলি ব্যবহারিক নীতির প্রচার করিয়া মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নীতিমূলক নির্দেশগুলি ছিল এইরূপ—যেমন দয়া, দান, সত্য, শুচিতা ও সাধুতা ; পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তি ; দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অহিংসা। অশোক সমাধি বা নির্বাণ লাভের উপায় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন স্বর্গের কথা এবং স্বর্গ লাভের জন্য উপরোক্ত অনুশাসনের নির্দেশ দিয়াছিলেন মাত্র। দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে তাঁহার ধর্মনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে ধর্ম হইতেছে "পাপের স্বল্পতা, কল্যাণধর্মের প্রাচুর্য, দান, দয়া, সত্য ও শৌচ"। ডক্টর মজুমদারের কথায় "The aspect of dharma which be emphasised was a code of morality rather than a system of religion."

ধর্মানুশীলনের নির্দেশ

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হইয়াও অশোক পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নৈতিক আদর্শচ্যুত আচার-অনুষ্ঠানের অবসান করাই তাঁহার ধর্মনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। পরধর্ম সহিষ্ণুতা তাঁহার ধর্মনীতিকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। তিনি কখনও দেবতা, ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন ধর্মসংঘের প্রতি অশ্রদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণুতায় পরম বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইবার পরও তিনি নিজেকে 'দেবতাদের প্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ বা শ্রমণদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিতেন। তাঁহার ধর্মমহামাত্রগণের প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মঙ্গলসাধন করা। তাঁহার দ্বাদশ প্রস্তর লিপিতে উল্লেখ আছে যে তিনি 'আজিবক' নামক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে প্রচুর উপহার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরধর্মে সহিষ্ণু হওয়া

পরধর্ম সহিষ্ণুতা

সত্ত্বেও সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের যথেচ্ছচারিতার প্রতি তিনি বিরোধিতা করিতেন। তিনি পশুবলি ও জীব-হিংসার তীব্র নিন্দা করিতেন এবং ইহা তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াও অশোক যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না। গৃহী, সন্ন্যাসী, উচ্চ ও নিম্ন সকল শ্রেণীর সমর্থনলাভের উপযোগী ছিল তাঁহার ধর্ম।

অশোকের ধর্মপ্রচার (Missionary activities of Asoka): অশোক বৌদ্ধ ধর্মের একজন পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর দুই হাজার বৎসর পরেও আজিও বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনগণ এই ধর্মে বিশ্বাসী—ইহা অশোকেরই কৃতিত্ব।

(১) **রাজার ধর্মযাত্রা:** অশোক স্বয়ং বিহার যাত্রার (pleasure four) পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি স্বদেশে পরিভ্রমণ ; ধর্মসভার আহ্বান, ব্রাহ্মণ, শ্রমণগণকে উপহার দান ও বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়া তিনি জনসাধারণকে ধর্মভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) **ধর্মলিপি:** জনসাধারণের মনে ধর্মভাব উন্মেষ করার জন্য তিনি পর্বত গাত্রে, প্রস্তরখণ্ডে, স্তূপ ও প্রস্তর স্তম্ভে সহজবোধ্য ভাষায় ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

(৩) **রাজকর্মচারী নিয়োগ:** ধর্মানুশীলনের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি 'রাজুক', 'যুত', 'মহামাত্র' উপাধিধারী রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়া সর্বত্র ত্রৈবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজুকদের উদ্দেশ্যে চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন "পিতা যেমন সুদক্ষ ধাত্রীর হস্তে সন্তান পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তিনিও সেইরূপ ইহাদের হস্তে প্রজাদের মঙ্গল অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন"।

(৪) **ধর্মমহামাত্র নিয়োগ:** জনসাধারণ যাহাতে নীতিপথে জীবন যাপন করিতে পারে এবং রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক যাহাতে উহারা নির্যাতিত না হয় তজ্জন্য তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে অপর এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৫) **বৌদ্ধ সভা:** বৌদ্ধ ধর্মের বিশুদ্ধতা ও বৌদ্ধসংঘের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি বা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মোগ্‌গালিপুত্ত।

(৬) **বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণ :** তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি নিম্নলিখিত ধর্ম প্রচারকগণকে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠাইয়াছিলেন— মজ্ঝান্তিক—কাশ্মীর ও গান্ধার; মজ্ঝিম—নেপাল; মহাধর্ম রক্ষিত—মহারাষ্ট্র, মহাদেব—মহীশূর; রক্ষিত—বারাণসী। উপরোক্ত দেশগুলি ছাড়াও অশোক দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি দেশগুলিতেও বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন।

স্বদেশে ধর্মপ্রচার করিয়াই অশোক নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বিদেশে ধর্ম প্রচারেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে তাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণ পশ্চিম এশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মিশর ও

বিদেশে

গ্রীসেও গমন করিয়াছিলেন। অশোক তাঁহার ত্রয়োদশ-প্রস্তর লিপিতে দাবি করিয়াছেন যে তাঁহার প্রেরিত দূতগণ সিরিয়া, ম্যাসিডন এবং এপিরাসের রাজসভায় সমাদৃত হইয়াছিলেন। সিংহলে দূত হিসাবে অশোক তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সাণ্ডার্স-এর মতে অশোকের ধর্ম প্রচারকগণ এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীগণের মধ্যে কৃষ্টিমূলক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বৈদেশিক কয়েকটি রাষ্ট্রে অশোক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

অশোকের শিলালিপি (Asoke's Inscriptions) : অশোকের শিলালিপিগুলি পর্বতগাত্রে, প্রস্তর-স্তম্ভে ও পর্বতগুহায় উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক শিলালিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে* কিন্তু অশোকের সকল শিলালিপিগুলিই যে আবিষ্কৃত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। শিলালিপিগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত। শিলালিপি গুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) **প্রস্তর-লেখমালা** (Minor Rock Edicts) : প্রথম প্রস্তর লেখমালাতে অশোকের ব্যক্তিগত জীবনের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তর

---

* **শিলালিপিগুলি ও আবিষ্কারকগণ**

(১) বরাবর ও নাগার্জুন গুহালিপি	হ্যারিণ্টন (১৭৮৫)
(২) গার্ণার প্রস্তরলিপি	টড (১৮২২)
(৩) সাহাবাজগড়ী লিপি	কোর্ট (১৮৩৬)
(৪) ভাবরু প্রস্তর-লিপি	কেপ্টেন বার্ট (১৮৪০)
(৫) জৌগড় প্রস্তর-লিপি	ওয়ালটার ইলিয়ট্ (১৮৫০)
(৬) কালসী প্রস্তর-লিপি	ফরেষ্ট—(১৮৬০)
(৭) বৈরাট প্রস্তর-লিপি	কারলাইল—(১৮৭২)
(৮) মহীশূর প্রস্তর-লিপি	রাইস—(১৮৯১)

লেখমালাতে অশোকের ধর্মের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই শিলালিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে যথা বিরাট (জয়পুর), জাতিঙ্গ-রামেশ্বর (মহীশূর), সাহাবাদ (বিহার), রূপনাথ (জব্বলপুর), মাস্কি (হায়দ্রাবাদ)। অশোকের অভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(২) **ভাবরু লিপি** (Bhabru Edicts): অশোকের অভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষে এই লিপিখানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে বৌদ্ধ সংঘের প্রতি অশোকের কতিপয় উপদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩) **চতুর্দশ প্রস্তর লিপি** (Fourteen Rock Edicts): এই লিপিগুলি হইতে অশোকের রাষ্ট্র-শাসন নীতির আভাস পাওয়া যায়। এই সকল লিপিগুলি সীমান্ত প্রদেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব ২৫৭ ও ২৫৬ অব্দের মধ্যেই এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই লিপিগুলিতে অশোক কর্তৃক মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, মহামাত্রগণের প্রতি অশোকের পরধর্ম সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের অভিষেকের চতুর্দশ বৎসরে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(৪) **কলিঙ্গ-লিপি** (Kalinga Edicts): ধোলি ও জৌগড়ে প্রাপ্ত কলিঙ্গ-লিপি দুইটি চতুর্দশ প্রস্তর-লিপির অন্তর্গত। এই দুইটিতে কলিঙ্গ বিজয় ও উহার শাসনের কথা উল্লিখিত আছে।

(৫) **বরাবর গুহালিপি** (Barabar Cave Inscriptions): গয়ার সন্নিকটে বরাবর পর্বতগুহায় খৃঃ পূর্ব ২৫৭ ও ২৫০ অব্দের মধ্যে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা যায় যে অশোক বরাবর পর্বতের গুহাগুলি আজিবক সম্প্রদায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অশোকের ধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) **রুমিনদেই স্তম্ভলিপি** (Rummindei Tarai Inscriptions): নেপালের নিকট রুমিনদেই স্তম্ভলিপিগুলি হইতে অশোকের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই গুলিতে বুদ্ধের প্রকৃত জন্মস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৭) **সপ্ত-স্তম্ভলিপি** (Seven Pillar Edicts): অশোকের অভিষেকের ষড়বিংশতি ও সপ্তবিংশতি বর্ষে সপ্ত স্তম্ভ লিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহাদের দুইটি বর্তমানে দিল্লীতে রক্ষিত রহিয়াছে। এইগুলি মীরাট, পাঞ্জাবের আম্বালা জেলা, ত্রিহুত জেলা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

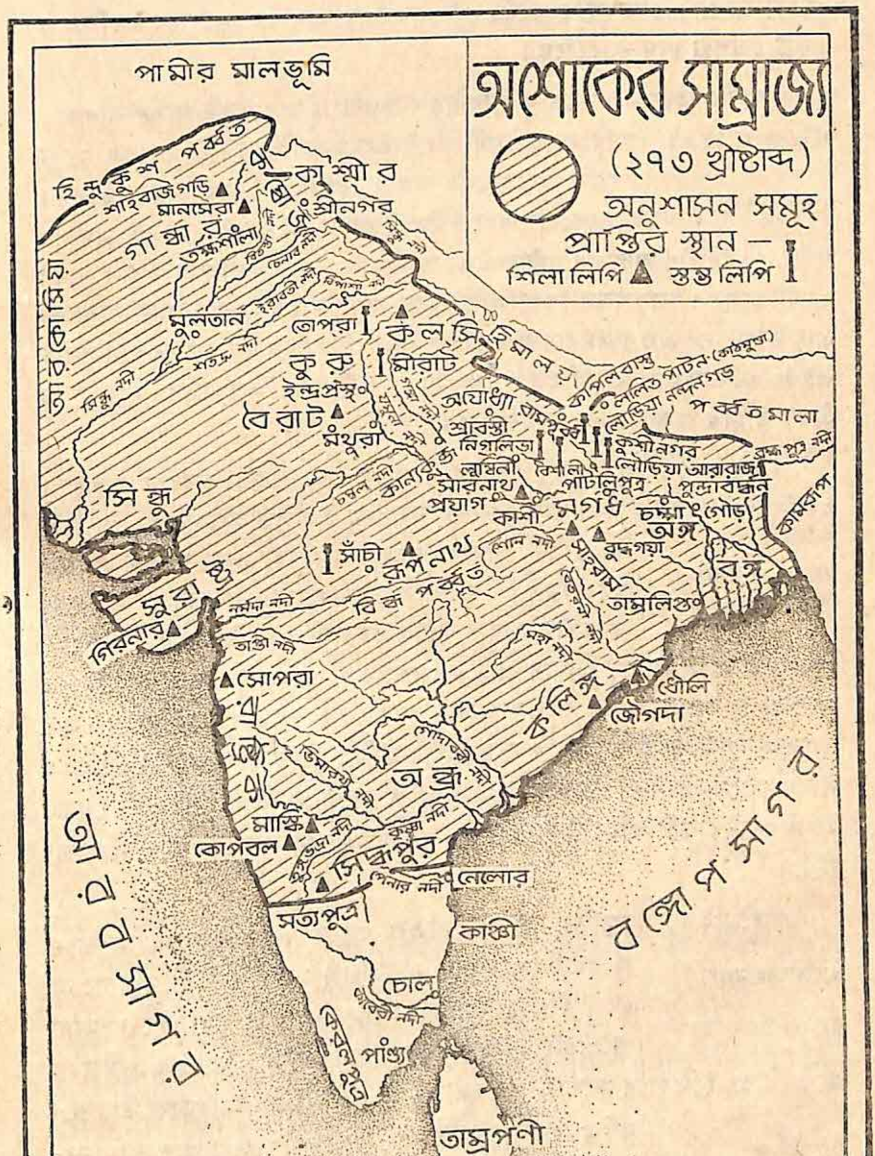
(৮) **স্তম্ভ লিপি** (Minor Pillar Edicts): এইগুলি সাঁচী, সারনাথ ও কৌশাম্বী—প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘের

সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল।

অশোকের শিলালিপিগুলির গুরুত্ব (Importance of Asoka's Inscriptions) ঃ অশোকের শিলালিপিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ এইগুলি হইতে অশোকের জীবনী ও তাঁহার কৃতিত্বের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এইগুলি হইতে (১) কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্বে অশোকের জীবন বৃত্তান্ত, (২) কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা, (৩) অশোকের অন্তরে কলিঙ্গযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ; (৪) বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে অশোকের প্রচেষ্টা, (৫) অশোক কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন ; (৬) প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত অশোকের সম্পর্ক, (৭) অশোকের আমলে জনসাধারণের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বহু বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

ইতিহাসে অশোকের স্থান (Asoka's Place in History) ঃ বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অশোক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মানুষ ও শাসক হিসাবে অশোক ভারত তথা বিশ্বের রাজন্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। তিনি ছিলেন মহান ও আদর্শস্থানীয় নরপতি। রাজকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল অতি উচ্চ। প্রজাবর্গকে তিনি সন্তানতুল্য মনে করিতেন এবং উহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তি, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও গঠনমূলক কার্যের উপযোগী ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কলিঙ্গ যুদ্ধ তাঁহার সামরিক ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেয়। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বব্যাপী এক মহাধর্মে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়া তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মৈত্রী, শান্তি ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তিনি যুদ্ধজয়ের পরই যুদ্ধ নীতি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। রাজার উপযুক্ত জ্ঞান ও সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সাধুতা তাঁহার মধ্যে ছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। সকল ধর্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং সমস্ত মানব-জাতির পার্থিব ও পারমার্থিব মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ভারতের বাহিরে বৈদেশিক দেশগুলিতেও তিনি জনসাধারণের পার্থিব ও পারমার্থিব কল্যাণসাধনের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একান্তই বিরল। তিনি ইচ্ছা করিলেই ভারতের বাহিরেও সাম্রাজ্যবিস্তার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি

অশোকের চরিত্র ও কৃতিত্ব


অশোকের সাম্রাজ্য
(২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)
অনুশাসন সমূহ প্রাপ্তির স্থান –
শিলা লিপি
স্তম্ভ লিপি
পামীর মালভূমি
হিন্দুকুশ পর্ব্বত
শাহবাজগড়ি
মানসেরা
কাশ্মীর
শ্রীনগর
গান্ধার
তক্ষশীলা
মুলতান
তোপরা
কলসি
হিমালয় পর্ব্বতমালা
কুরু
মীরাট
ইন্দ্রপ্রস্থ
বৈরাট
মথুরা
অযোধ্যা
শ্রাবস্তী
নিগালিভা
লুম্বিনী
কপিলবাস্তু
কুশীনগর
বৈশালী
লৌরিয়া আরারাজ
পাটলিপুত্র
পুন্ড্রাবর্দ্ধন
সারনাথ
প্রয়াগ
কাশী
মগধ
চম্পা
গৌড়
অঙ্গ
বঙ্গ
কামরূপ
বুদ্ধগয়া
তাম্রলিপ্ত
সিন্ধু
সাঁচী
রূপনাথ
বিন্ধ্য পর্ব্বত
সুরাষ্ট্র
গিরনার
নর্মদা নদী
তাপ্তী নদী
সোপারা
ধৌলি
জৌগদা
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
মাস্কি
কোপবল
সিদ্ধাপুর
নেলোর
সত্যপুত্র
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

মানব প্রেম, সর্বভূতে দয়া ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদর্শ ও কর্মের এই অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য অশোকের চরিত্রকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

শাসক হিসাবে

সুশাসক হিসাবেও অশোক পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া তিনি দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পেশোয়ার হইতে বাংলা দেশ এবং কাশ্মীর হইতে মহীশূর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে এই বিশাল সাম্রাজ্যে এক ভাষা ও একশাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের কোন সম্রাট এইরূপ কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি ও ঐক্য তাঁহার রাজত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নয়ন

ভাষা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অশোকের অবদান স্মরণীয়। হস্তলিপির প্রচলন তাঁহার রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লেখার প্রচলন তাঁহার রাজত্বকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলেই পালি 'সর্বভারতীয় ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল। এমন কি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিও পালি ভাষায় লেখার প্রচলন অশোকের আমলেই শুরু হইয়াছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ব্যাপক প্রচলন অশোকের আমলেই শুরু হইয়াছিল। রাজ্যের সর্বত্র বহু স্তূপ, চৈত ও স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তিনি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি ও অনুশাসন লিপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল।

ওয়েলসের মন্তব্য

মজুমদারের মন্তব্য

স্মিথের মন্তব্য

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে অশোকের অবদান স্মরণ করিয়াই ওয়েলস্ (এইট-জি) মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে "ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হাজার হাজার নৃপতিগণের মধ্যে অশোকই একমাত্র উজ্জ্বল তারকা"। ডক্টর মজুমদারের মতে বিশ্বের ইতিহাসে অশোক অতুলনীয় এবং অশোকের আবির্ভাব ভারতকে মহিমান্বিত করিয়াছে"। স্মিথের মতে "অশোক মানবজাতির প্রথম ধর্মগুরু"।

তথ্যাদি

অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি (Extent of Asoka's Empire)ঃ অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ বিজয় সম্পন্ন হইলে মগধের আধিপত্য ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত

হইয়াছিল। অশোকের শিলালিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান, কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম ভারত

উত্তর-পশ্চিমে অশোকের সাম্রাজ্য সিরিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় এণ্টিয়োকসের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আধুনিক আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্দুপ্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শিলালিপিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কম্বোজ ও গান্ধার রাষ্ট্র দুইটিকে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসিত রাষ্ট্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'রাজতরঙ্গিণী' ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী অনুসারে কাশ্মীর মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

উত্তর-পূর্ব ভারত

রুম্মিনদেই শিলালিপি অনুসারে নেপালের তরাই অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পূর্বভারতে অশোকের সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণবঙ্গ) ও পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) হিউয়েন-সাং অশোকের বহু স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ কামরূপ (আধুনিক আসাম) অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না।

দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ-ভারতে অশোকের সাম্রাজ্য পেনার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ত্রয়োদশ প্রস্তর লিপিতে চের, চোল, পাণ্ড্য ও পল্লভ রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

পশ্চিম ভারত

পশ্চিম ভারতে অশোকের সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা : (Maurya Administration) :

শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি : প্রধানতঃ তিনটি সূত্র হইতে মৌর্য রাজগণের শাসন পদ্ধতির সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় যথা—

(১) মেগাস্থিনিসের বিবরণ; (২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র; এবং (৩) অশোকের শিলালিপি।

(ক) **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা (Chandragupta Maurya's Administration) :** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক স্থাপিত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

(১) **কেন্দ্রীয় শাসন :** রাজা, মন্ত্রী অমাত্য ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ছিল।

রাজ কর্তব্য ও রাজার ক্ষমতা

রাজা : শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে থাকিতেন রাজা। মৌর্যরাজগণ ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতায় (Divine Rights of Kings) বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহারা নিজেদেরকে 'দেবতাদের-প্রিয়' উপাধিতে ভূষিত করিতেন। রাজা ছিলেন একাধারে সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন-

প্রণেতা। রাজকর্তব্য সম্পর্কে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে রাজা সকল সময় রাজদরবারে উপস্থিত থাকিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। সুতরাং মনে হয় শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে মৌর্যরাজগণ ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন। মেগাস্থিনিস বলেন যে রাজা ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য দিবানিদ্রা ও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। তিনি স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাবর্গের অনুযোগ শুনিতেন এবং কৌটিল্যের নীতি অনুসরণ করিয়া কখনও বিচার প্রার্থীকে অধিক সময় অপেক্ষমান রাখিতেন না।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একমাত্র রাজারই ছিল এবং তিনি প্রচলিত রীতি-নীতি ও রাজানুশাসন (royal rescripts) প্রবর্তন করিয়া আইন প্রণয়নের কার্য করিতেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি, গুপ্তচর ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন।

বিচার

রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ সামরিক নেতা। সাধারণতঃ সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার সেনাপতির উপর ন্যস্ত থাকিলেও, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজার আদেশ ভিন্ন কিছু করা হইত না। অনেক সময় রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন।

সামরিক ব্যবস্থা

মন্ত্রী : কৌটিল্যের মতে সার্বভৌম রাজশক্তি কোন এক ব্যক্তি বিশেষের একক চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার জন্য উপযুক্ত কর্মচারীর সহায়তা প্রয়োজন। মৌর্য শাসনব্যবস্থায় বহু দায়িত্বশীল কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস ইহাদিগকে সচিব ও 'অমাত্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দুই শ্রেণীর মন্ত্রীর উল্লেখ আছে—মন্ত্রী ও অমাত্য। প্রধান সচিব বা অমাত্যগণকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হইত। এই মন্ত্রিগণকে অশোকের আমলের 'মহামাত্রগণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যে সকল সচিব বা অমাত্য অর্থলোভ হইতে মুক্ত থাকিতেন ও যাঁহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল তাঁহাদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে মন্ত্রিগণের বেতন ছিল বাৎসরিক ৪৮,০০০ পান। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দিতেন। মন্ত্রিগণ রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেও গমন করিতেন। মন্ত্রিগণের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না।

মন্ত্রিপরিষদ : মন্ত্রী ছাড়াও একটি মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন বটে কিন্তু পদমর্যাদায় ইহারা মন্ত্রিগণের নিম্নে ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের বেতন ছিল বাৎসরিক ১২,০০ পান। সকল বিষয়ে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত না। কেবল গুরুতর সমস্যার আলোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ আহূত হইত। প্রদেশপাল উপরাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি, নৌ-সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী

নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। ডক্টর মজুমদার মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদকে যথাক্রমে নির্বাহক পরিষদ (Executive Council) ও ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা করার সময় রাজসভায় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত থাকিতেন। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনগুলি গোপনে হইত। অশোকের অনুশাসনলিপিতেও মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ আছে।

অমাত্য ঃ মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ছাড়াও শাসনকার্যে 'অমাত্য' নামক আর এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা শাসন ও বিচার বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন।

অন্যান্য কর্মচারী ঃ মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ও অমাত্যগণ ছাড়া আরও অনেক দায়িত্বশীল কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা অধ্যক্ষ বা গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ ৩২ জন অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। গ্রামাঞ্চলের ও নগরের শাসন বিভাগের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষের পরিচালনাধীন থাকিত। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুযায়ী অধ্যক্ষদের মধ্যে কেহ কেহ সামরিক বিভাগের সহিতও সংশ্লিষ্ট থাকিতেন।

সামরিক সংগঠন ঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বাহিনীর সংগঠন সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনী ছিল সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ৮,০০০ রথারোহী ও ৯,০০০ হস্তী। অর্থশাস্ত্র অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বিভাগের পরিচালনার ভার ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিত। এই পরিষদ পাঁচজন করিয়া সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এক একটি সমিতি বা বোর্ড এক একটি বিশেষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। যেমন (১) পদাতিক, (২) অশ্বারোহী, (৩) যুদ্ধরথ, (৪) হস্তীবাহিনী, (৫) রসদ ও যানবাহন এবং (৬) নৌ-বাহিনী। স্মিথ ও প্লুটার্ক চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্লুটার্ক-এর কথায় "একটি বিশাল ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত যে শুধু সমগ্র ভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এমন নহে ইহার সাহায্যে তিনি গ্রীক সৈন্যগণকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে এবং সেলিউকসের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

সামরিক বিভাগ

'অর্থশাস্ত্রে' মিশ্রিত বাহিনীর উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের যুগ ছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুগ। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তার হেতু শক্তিশালী স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন

অঞ্চল ও বিভিন্ন শ্রেণী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল সম্প্রদায় হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধাস্ত্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উল্লেখ আছে। তিনি 'আয়ুদ্ধগারাধ্যক্ষ' নামে পরিচিত হইতেন। সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতির কার্য তিনি তত্ত্বাবধান করিতেন। তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার ও তরবারী ছিল প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। ইহা ছাড়া অর্থশাস্ত্রে 'স্থিতযন্ত্র' (স্থানু) ও 'চলযন্ত্র' (সচল) নামক দুই প্রকার যান্ত্রিক অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সকল বিভাগের সৈন্যগণকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হইত।

যুদ্ধাস্ত্র বিভাগ ও যুদ্ধাস্ত্র

সৈন্যগণের বেতন

নৌ-বাহিনী

মৌর্য সম্রাটগণের একটি নৌ-বাহিনীরও সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। নৌ-বাহিনীর সেনাপতিকে 'নাবাধ্যক্ষ' বলা হইত। মনাহনের (Monahan) মতে নাবাধ্যক্ষের বিশেষ কোন কাজ ছিল না। কারণ তাঁহার মতে মৌর্যযুগে নৌযুদ্ধের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডক্টর এইচ. সি. রায়চৌধুরীর মতে চন্দ্রগুপ্তের নৌ-বাহিনী জলদস্যু দমনে নিযুক্ত থাকিত। স্মিথের মতে মৌর্য সম্রাটগণের নৌ-বাহিনী মিশর, সিরিয়া, এপিরাস প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। অশোকের মৃত্যুকাল পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত নৌ-বাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

নগর শাসন: মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনভার সামরিক পরিষদের ন্যায় ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। পাঁচজন করিয়া সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতিতে এই পরিষদ বিভক্ত ছিল। প্রতিটি সমিতি এক একটি বিশেষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। প্রথম সমিতি শিল্পকার্যের তত্ত্বাবধান করিত। দ্বিতীয়টি বিদেশী আগন্তুকদের তত্ত্বাবধান ও উহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখিত। তৃতীয়টি নাগরিকগণের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিত। চতুর্থটি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। পঞ্চমটি শিল্পোৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিত এবং ষষ্ঠটি বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্যের একদশমাংশ কর হিসাবে আদায় করিত। এই সকল সমিতিগুলি আপন আপন বিভাগের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও সমগ্র ভাবে উহারা কতকগুলি সাধারণ দায়িত্ব গ্রহণ করিত—যেমন বাজার দর নিয়ন্ত্রণ, বাজারগুলির তত্ত্বাবধান, বন্দর ও মন্দিরাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

মেগাস্থিনিস কেবলমাত্র পাটলিপুত্র নগরীর শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, কৌশম্বী প্রভৃতি সাম্রাজ্যের প্রধান নগরগুলিতেও সম্ভবতঃ অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

রাজস্ব ঃ ভূমি রাজস্বই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান আয়। রাজস্ব প্রধানতঃ 'বলি' ও 'ভাগ' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বা এক চতুর্থাংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত এবং ইহাকে 'ভাগ' বলা হইত। কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে নিযুক্ত রাজকর্মচারীগণের ব্যয় ভার নির্বাহের জন্য যে কর আদায় করা হইত উহাকে 'বলি' বলা হইত। ইহা ছাড়া বাণিজ্য শুল্ক, জন্ম ও মৃত্যু কর, জল কর, নগরের গৃহাদির উপর কর প্রভৃতি হইতেও প্রভূত রাজস্ব আদায় হইত। রাজার ভূসম্পত্তি, বন, খনি ও রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প হইতেও যথেষ্ট আয় হইত। যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে, বিত্তশালীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হইত। ইহাকে বলা হইত 'প্রণয়' (benevolence)।

আয়

রাষ্ট্রের আয় রাজা ও রাজপরিবারের ভরণ পোষণ, সামরিক বিভাগ, মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, জনকল্যাণমূলক কার্যাদি প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইত। ইহা ছাড়া পাটলিপুত্রে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও মৌর্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

ব্যয়

বিচার ব্যবস্থা ঃ রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারপতি। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের সাহায্যে বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। অর্থশাস্ত্রে দুই প্রকার বিচারালয়ের উল্লেখ আছে—যথা 'ধর্মস্থানীয়' ও 'কণ্টকশোধন'। 'ধর্মস্থানীয় বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন তিনজন অমাত্য ও তিনজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। 'কণ্টকশোধন' বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন তিনজন অমাত্য ও তিনজন প্রদেষ্টা। এই দুই বিচারালয়ে যথাক্রমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করা হইত এবং এগুলি কেন্দ্রীয় বিচারালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিভিন্ন প্রকারের বিচারালয়

কেন্দ্রীয় বিচারালয় ব্যতীত জনপদ ও নগরে বিশেষ বিশেষ নিম্ন বিচারালয় ছিল। অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার নিম্ন বিচারালয়ের উল্লেখ আছে যথা—'স্থানীয়', 'দ্রোণমুখ' ও 'সংগ্রহণ'। ৮০০ শত গ্রাম লইয়া স্থানীয়', ৪০০ শত গ্রাম লইয়া 'দ্রোণমুখ' ও ১০টি গ্রাম লইয়া 'সংগ্রহণ' বিচারালয়গুলি গঠিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর অপরাধ বিচারের ভার 'গ্রামিক' বা গ্রাম্য প্রধানদের উপর ন্যস্ত থাকিত।

মৌর্য যুগে দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। সেই যুগে লিখিত আইন ছিল না। অর্থশাস্ত্র অনুসারে 'ধর্ম' (Sacred law), 'ব্যবহার' (agreement), চরিত্র (history and tradition বা প্রথা) ও 'রাজানুশাসন' (রাজার আদেশ) ইত্যাদি আইন বলিয়া বিবেচিত হইত। সামান্য অপরাধে শিরচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জরিমানা প্রভৃতি বিভিন্ন

আইন ও দণ্ডবিধি

প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এমন কি চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে ব্রাহ্মণগণও গুরুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন না।

গুপ্তচর বিভাগঃ বিশাল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য ও রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবার জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিত। ইহারা গোপনে সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ রাজাকে সরবরাহ করিত। অর্থশাস্ত্রে দুই প্রকারের গুপ্তচরের উল্লেখ আছে—যথা 'সমস্থা' (যাহারা বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকিত) ও 'সঞ্চয়া' (যাহারা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সংবাদ গ্রহণ করিত)। ষ্ট্রাবো 'পরিদর্শক' নামে এক শ্রেণীর গুপ্তচরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের কর্তব্য ছিল রাজাকে গোপনে সকল সংবাদ পরিবেশন করা। ষ্ট্রাবোর মতে একমাত্র রাজার বিশ্বাসভাজনগণকেই পরিদর্শক পদে নিযুক্ত করা হইত। অনেক সময় সাপুড়েগণকে গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করা হইত।

(২) **প্রাদেশিক শাসনঃ** চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্য চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—প্রাচ্য, উত্তরাপথ, অবন্তী ও দক্ষিণাপথ। অশোকের আমলে আরও একটি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা কলিঙ্গ। পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি ও তেসালী যথাক্রমে প্রদেশগুলির রাজধানী ছিল। এই সকল প্রদেশ ভিন্ন কতকগুলি স্বায়ত্ত শাসিত নগর ও গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা স্বয়ং পাটলিপুত্র হইতে প্রাচ্যের শাসনকার্য প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ছিলেন দুই প্রকারের। গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলির শাসনভার 'কুমার' উপাধিধারী রাজপুত্রগণের উপর ন্যস্ত থাকিত। অশোকের অনুশাসন লিপিতে 'কুমার' উপাধিধারী চারিজন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়। ইহারা যথাক্রমে তক্ষশীলা, কলিঙ্গ, উজ্জয়িনী ও সুবর্ণ গিরিতে শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত থাকিতেন। 'কুমার' উপাধিধারী শাসনকর্তাগণ সকল সময় নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ক্ষমতালাভ করিতেন না। অনেক সময় 'কুমারদের' সহিত 'মহামাত্র' উপাধিধারী সহকারী শাসকদের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে 'মহামাত্র' উপাধিধারী রাজকর্মচারীগণও প্রাদেশিক শাসনক্ষমতা লাভ করিতেন।

পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত

দুই প্রকারের প্রদেশিক শাসক

প্রদেশগুলি কতকগুলি জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলির শাসনভার 'সমাহরত্রি' নামক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকিত। গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' নামক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। 'গ্রামিকগণ' রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন না। ইহারা গ্রামবাসী

জনপদ

কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। গ্রামিকের উপরে থাকিতেন 'গোপ'। পাঁচটি কিংবা দশটি গ্রামের ভার 'গোপ' নামক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত।

প্রদেশসমূহে 'অন্তপাল' ও 'দুর্গপাল' নামক কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা যথাক্রমে সীমান্ত রক্ষা ও দুর্গ রক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন।

উপসংহার

দেশরক্ষক, সংগঠন ও প্রজাহিতৈষী রাজা হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার শাসনপ্রণালী ছিল শক্তিশালী ও জনকল্যাণমূলক। শাসনযন্ত্রের সাহায্যে তিনি আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(খ) **অশোকের রাজ্য শাসন** (**Administration of Asoka**) ঃ

চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত শাসনপ্রণালী বিন্দুসারের আমলে অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু অশোকের রাজত্বকালে ইহার কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অশোকের রাজকর্তব্যের আদর্শ (Asoka's Ideal of Kingship)

অশোকের শিলালিপি ও অনুশাসন লিপি হইতে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের অভিমত পাওয়া যায়। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল অতি উচ্চ। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি সর্বদাই রাজকর্তব্য পালনে যত্নবান ছিলেন। প্রজার কল্যাণ সাধন করাই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ লিপিতে তিনি বলিয়াছেন, "প্রজামাত্রই আমার সন্তান উহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলসাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য"। চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে রাজুকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, যে প্রজাবর্গের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করাই উহাদের একমাত্র কর্তব্য। "মাতা যেমন উপযুক্ত ধাত্রীর হস্তে সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তিনিও সেইরূপ তাঁহাদের (রাজুকদের) হস্তে প্রজা-বর্গের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।" তিনি সাম্রাজ্যকে ব্যক্তিগত অথবা খেয়ালখুসী চরিতার্থ করিবার যন্ত্রমাত্র হিসাবে মনে করিতেন না। "সব মুনিষে পজা সমা"—ইহাই ছিল অশোকের রাজ-কর্তব্যের আদর্শ। অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যকেই তিনি অধিক প্রাধান্য দিয়াছিলেন। ষষ্ঠ প্রস্তর লিপিতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সকল সময় এবং সকল স্থানে তিনি প্রজাদের কার্য নির্বাহ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য তিনি কখনও আত্মপ্রসাদ বা আত্মগরিমা অনুভব করেন নাই। তিনি প্রজাবর্গের নিকট নিজেকে ঋণী মনে করিতেন এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। রাজ-কর্তব্যের আদর্শ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

অশোকের শাসন প্রণালী ঃ চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত থাকিলেও উহার উন্নতিকল্পে অশোক কিছু কিছু পরিবর্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী ঃ রাজুক, যুত, পুরুষ, মহামাত্র ও ধর্মমহামাত্র

অশোকের অনুশাসন লিপিগুলিতে চার শ্রেণীর নূতন কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা, 'রাজুক', 'যুত', 'মহামাত্র' ও 'ধর্মমহামাত্র'। রাজুকগণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা সময় সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইতেন। ইহারা ইচ্ছানুযায়ী শাস্তি প্রদান ও পুরস্কার দান করিতে পারিতেন। 'পুরুষ' উপাধিধারী কর্মচারীগণ রাজুকগণের রাজানুগত্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন এবং রাজার সহিত উহাদের সংযোগ রক্ষা করিতেন। 'যুত' উপাধিধারী কর্মচারীগণ রাজকীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত থাকিতেন। 'মহামাত্র'-গণও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকিতেন।

অশোক প্রতি তিন বৎসর ও পাঁচ বৎসর অন্তর রাজুক, যুত ও প্রাদেশিক প্রভৃতি কর্মচারীদের দেশের বিভিন্ন অংশে পরিক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনুরূপ ভাবে মহামাত্রগণকেও পরিক্রমণে প্রেরণ করা হইত। প্রদেশগুলিতে জনসাধারণের উপর রাজকর্মচারীদের অত্যাচার ও অবিচার বন্ধ করাই পরিক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল।

ধর্মমহামাত্র

অশোক ধর্মমহামাত্র নামেও এক শ্রেণীর নূতন কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহারা সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতার কথা প্রচার করিতেন এবং ব্রাহ্মণ, জৈন, গান্ধার, কম্বোজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। ইহা ছাড়া ধর্ম মহামাত্রগণ বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। অশোকের শাসনকালে স্ত্রীজাতীর তত্ত্বাবধানের জন্য 'স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র' নামে আর এক শ্রেণীর মহামাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস

অশোক বিচার ব্যাপারে 'দণ্ডসমতা' ও 'ব্যবহার-সমতা' নীতির প্রবর্তন করিয়া প্রচলিত দণ্ডবিধির কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিয়াছিলেন।

নগর শাসন

অশোকের আমলে তোসালি প্রভৃতি বড় বড় নগরীতে পৌর শাসনের ভার 'নগর-ব্যবহারিক' নামে কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ''পৌর-ব্যবহারিক' ও 'নগর-ব্যবহারিক সম্ভবতঃ অভিন্ন। জনপদগুলিতে বিচারের ভার রাজুকগণের উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রজাবর্গের অবস্থা ও রাজকর্মচারীগণের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে অবহিত থাকিবার জন্য অশোক 'প্রতিবেদক' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রতিবেদক

পূর্বের ন্যায় সম্রাট পাটলিপুত্র হইতে স্বয়ং প্রাচ্যদেশ শাসন করিতেন। অন্যান্য প্রদেশগুলি সাধারণতঃ রাজপরিবারভুক্ত কুমারগণ কর্তৃক শাসিত হইত।

প্রাদেশিক শাসন

অশোকের শাসনব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদারতা। প্রজাবর্গের সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইহা স্বীকার্য যে তিনি আপন আদর্শ অনুযায়ী শাসনপদ্ধতির সংস্কার ও পুনর্গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজ কর্তব্য সম্বন্ধে অশোক যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্বের ইতিহাসে দুর্লভ। ডক্টর মজুমদারের মতে প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের বিশ্বের নৃপতিবর্গের মধ্যে অশোকের স্থান সর্বোচ্চে।

উপসংহার

মেগাস্থিনিসের বিবরণ (Megasthenes' Accounts) ঃ ব্যাবিলন অধিপতি সেলিউকসের রাষ্ট্রদূতরূপে মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় আগমণ করিয়াছিলেন। তিনি মৌর্য শাসনপদ্ধতি ও ভারতীয় জনসমাজ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থখানির অস্তিত্ব অবশ্য এখন নাই। তবে পরবর্তী গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে ইহার অংশবিশেষ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মেগাস্থিনিস রচিত বিবরণীর সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

রাজা ঃ রাজা সর্বদাই নারী-দেহরক্ষীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তিনি সর্বদাই গুপ্ত হত্যার ভয়ে আতঙ্কিত থাকিতেন। এই কারণে একই শয্যা কক্ষে তিনি দুইরাত্রি পর পর নিদ্রা যাইতেন না। দাবাখেলা ছিল রাজার খুবই প্রিয়। রাজা হস্তীপৃষ্ঠে মৃগয়ায় গমন করিতেন এবং মৃগয়ার দিনগুলি আমোদ-প্রমোদে কাটাইতেন। রাষ্ট্রীয় উৎসবে রাজা বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রজাবর্গের অভিবাদন গ্রহণ করিতেন।

রাজধানী পাটলিপুত্র ঃ মেগাস্থিনিসের মতে সেইযুগে পাটলিপুত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর সংগমস্থলে অবস্থিত এই নগরটি দৈর্ঘে প্রায় সাড়ে নয় মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। চতুর্দিকে এক গভীর পরিখা দ্বারা নগরটি পরিবেষ্টিত ছিল। ইহা ছাড়া নগরটি সুউচ্চ প্রাচীরদ্বারাও পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরে ৫৭০টি বুরুজ ও ৬৪টি তোরণ ছিল। পাটলিপুত্র ছাড়াও মেগাস্থিনিস অন্যান্য নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী নগরগুলির গৃহাদি কাষ্ঠ নির্মিত হইত

এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে অবস্থিত নগরগুলির গৃহাদি কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত হইত।

রাজপ্রসাদ ঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্মিত এবং অপূর্ব কারু-কার্যময় ছিল। মেগাস্থিনিসের মতে পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও চন্দ্রগুপ্তের রাজ প্রসাদ সুদৃশ্য ছিল। প্রাসাদের চতুর্দিকে মনোরম উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ও জাঁকজমক সম্বন্ধেও মেগাস্থিনিস এক মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

পৌর শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরের সুনিয়ন্ত্রিত পৌর শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার হস্তে নগরের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। পাঁচ জন সদস্য লইয়া এই সভা বা পরিষদ ছয়টি সমিতি বা বোর্ডে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি সমিতির উপর এক একটি বিশেষ কার্যভার ন্যস্ত থাকিত—যথা শিল্পকার্যের তত্ত্বাবধান, বৈদেশিক আগন্তুকদের তত্ত্বাবধান, নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর তত্ত্বাবধান এবং বিক্রীত সামগ্রীর কর সংগ্রহ।

জনপদ শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিস দুই শ্রেণীর উচ্চ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন—যথা 'অগ্রণময়' (Agronomoi) ও 'অষ্টনময়' (Astya-nomoi)। প্রথমোক্ত কর্মচারীগণ রাজকর সংগ্রহ, ক্ষেত্রে জলসেচন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জমিজরিপ প্রভৃতি কার্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। অপর শ্রেণীর কর্ম-চারীগণের সংখ্যা ছিল ত্রিশ। ইহাদের প্রতি পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়টি বোর্ড বা সমিতি ছিল। প্রতিটি সমিতি এক একটি বিশেষ কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিল। মেগাস্থিনিস পরিদর্শক (Overseer) নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন। জনপদগুলিতে বিচারকার্য গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলির হস্তে ন্যস্ত থাকিত। জনসাধারণের অবস্থা ও রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিত।

সামরিক বিভাগ ঃ ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার হস্তে চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এই সভাও পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। ইহারা যথাক্রমে অশ্বারোহী, নৌ-বাহিনী, পদাতিক, রথ, হস্তীবাহিনী, রসদ ও যানবাহন—এই বিভাগগুলির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিত।

শ্রেণী বিভাগ ঃ মেগাস্থিনিসের মতে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—

(১) দার্শনিক—ইহারা ছিল সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ

ছিলেন এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যালঘু ছিল বটে কিন্তু সকল প্রকার করদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন।

(২) কৃষক—ইহারা রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিত, সৈন্য বাহিনীতেও ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত না। ইহাদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল চাষ-আবাদ করা। ইহারা রাজাকে খাজনা ও সময় সময় উপহার প্রদান করিত।

(৩) পশুপালক—সাধারণতঃ ইহারা নগরে বা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিত না।

(৪) শিল্পী—ইহারা ছিল যুদ্ধাস্ত্র ও কৃষিকার্যের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত কারক। ইহারা রাজকোষ হইতে ভরণপোষণ পাইত। যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ প্রস্তুতকারকগণ রাজার নিকট হইতে পারিশ্রমিক ও খাদ্য সামগ্রী পাইত।

(৫) সৈনিক—সংখ্যার দিকদিয়া ইহারা মোটেই নগণ্য ছিল না। যুদ্ধই ছিল ইহাদের একমাত্র পেশা।

(৬) পরিদর্শক (Overseers)—ইহাদের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের সকল সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাহা রাজা অথবা রাজকর্মচারীদের নিকট পেশ করা। একমাত্র বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণকেই এই পদে নিযুক্ত করা হইত।

(৭) অমাত্য—ইহারা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সেনাপতি, বিচারপতি ও জেলা শাসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইহারা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিতেন।

মেগাস্থিনিস শ্রেণীভেদের কঠোরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সৈনিক কখনও কৃষক কিংবা শিল্পী কিংবা দার্শনিক হইবার অধিকার পাইত না। মেগাস্থিনিসের এই সামাজিক বিভাগ অনুসারে তখনকার হিন্দু সমাজের প্রচলিত জাতিভেদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বৃত্তি হিসাবেই মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে এইভাবে ভাগ করিয়াছেন।

ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রঃ মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের জনসাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। উহাদের নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত। দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না বলিলেই চলে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কেহ বিচারালয়ে যাইত না। আপোষ মীমাংসার দ্বারা উহারা নিজেরাই সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া লইত। ধর্মানুষ্ঠানের উপলক্ষ্য ব্যতীত কেহ মদ্যপান করিত না।

দাস প্রথাঃ মেগাস্থিনিসের মতে সেই যুগে দেশে দাসত্ব প্রথা ছিল না। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে ও অশোকের অনুশাসনলিপিতে দাস-প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস দাস-প্রথার প্রচলন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। সমসাময়িক গ্রীস দেশে দাস-প্রথা যেরূপ কঠোর ছিল ভারতে এই প্রথার

সেইরূপ কঠোরতা ছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার দাস-প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন নাই।

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ কৃষি ও পশুপালন জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা ছিল। ভূমির উর্বরতার প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ দৃষ্টি রাখিত। ভূমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র জলসেচ বিভাগ ছিল। কৃষকগণ রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক কখনও উৎপীড়িত হইত না। কৃষি ছাড়াও শিল্প কলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ উন্নত ছিল। খনিজ সম্পদের মধ্যে মেগাস্থিনিস স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র ও টিনের উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্ণ খনির খননকার্য প্রসঙ্গে এক প্রকার পিপীলিকার কথা মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস অলঙ্কারাদির বহুল প্রচলনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষককূল ছিল সমৃদ্ধ। খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া মেগাস্থিনিস মন্তব্য করিয়াছেন যে সেযুগে দুর্ভিক্ষ কখনও ঘটে নাই। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে তদানীন্তন ভারতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধিঃ মেগাস্থিনিস দণ্ডবিধির কঠোরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অপরাধের সংখ্যা কম হইলেও অপরাধমূলক কার্যের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। সামান্য অপরাধের জন্য অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় গুরুদণ্ডও প্রদান করা হইত।

শিক্ষাঃ মেগাস্থিনিসের মতে সেযুগে ভারতীয়গণ লিখিতে ও পড়িতে জানিত না। মেগাস্থিনিসের এই মন্তব্য সত্য নহে। সেযুগে ভারতীয়গণ লিখন পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিল যদিও বিদ্যাচর্চা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল।

মেগাস্থিনিস লিখিত বিবরণীর ঐতিহাসিক মূল্যঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণী অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অলীক এবং ভ্রমাত্মক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নির্ভরযোগ্য কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। ইহাকে অনেকে "ঘটনা ও গল্পের এক সংমিশ্রণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক জোলির (Jolly) মতে মেগাস্থিনিস অন্যান্য দেশের বহু আচার-অনুষ্ঠান ও শাসনব্যবস্থা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিদেশী, সুতরাং তাঁহার বিবরণী বিদেশীসুলভ পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট। ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করার সুযোগ তিনি পান নাই এবং জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তৃত অঞ্চল সম্পর্কে বিরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারত সম্পর্কে তাঁহার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ভারতের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি ছিলেন সরল বিশ্বাসী এবং ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার বিবরণ অতিরঞ্জিত হইয়াছে এবং সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াই তথ্য পরিবেশন

করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি পরস্পর বিরোধী উক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

কিন্তু ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার লিখিত বিবরণী সর্বাংশে অনৈতিহাসিক—এইরূপ বলা যায় না। তাঁহার বিবরণীর মধ্যে মৌর্য যুগের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বহুক্ষেত্রে তাহা সমর্থন করে। তিনি যে সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের স্বযোগ পাইয়াছিলেন সেগুলির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীর বর্ণনা, চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা ও রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে তাঁহার বিবরণী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ মৌর্য যুগের ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মেগাস্থিনিস কর্তৃক রচিত বিবরণীর মূল্য কম নয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : (Kautilya's Arthasastra) : কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (Science of Politics) মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অন্যতম ঐতিহাসিক উপাদান। বহুক্ষেত্রে মেগাস্থিনিস কর্তৃক বর্ণিত বিষয় বস্তুর সহিত অর্থশাস্ত্রের মৌলিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা ও ইহার রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। কীথ (Keeth), জোলি (Jolly), উইণ্টারনিজ (Winternitz) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মতে কৌটিল্য বা চাণক্য ইহার রচয়িতা নহেন এবং ইহা পরবর্তীযুগের রচনা। যদি ইহা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্য কর্তৃক রচিত হইত তাহা হইলে ইহাতে মৌর্য সাম্রাজ্য ও উহার শাসনব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু ইহাতে মেগাস্থিনিস কর্তৃক উল্লিখিত পৌর শাসনব্যবস্থা ও সামরিক সভাগুলির কোন উল্লেখ নাই। অর্থশাস্ত্র হইতে এইরূপ মনে হয় না যে ইহার রচয়িতা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক জোলি অর্থশাস্ত্রের রচয়িতাকে কূটনীতিজ্ঞ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে অর্থশাস্ত্রে ভারতের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ইহা খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয় নাই এবং মেগাস্থিনিসও কৌটিল্যের কোন উল্লেখ করেন নাই। জোলির মতে অর্থশাস্ত্র খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল। স্মিথের মতে অর্থশাস্ত্র মৌর্যোত্তর যুগে রচিত হইয়াছিল। কারণ প্রথমতঃ, অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষেই উপযোগী ছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে চীনা রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু মৌর্যযুগে চীনের সহিত ভারতের কোন সম্পর্ক ছিল না। তৃতীয়তঃ, অর্থশাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ মৌর্য যুগে এই ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল না। এই সকল কারণে অনেকের মতে অর্থশাস্ত্র মৌর্য যুগে রচিত

হয় নাই এবং কৌটিল্য ইহার যথার্থ রচয়িতা ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু ফ্লিট, জয়স্বাল, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত যুক্তিগুলি সমর্থন করেন না এবং উহাদের মতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ভারতীয় জনশ্রুতি ও ভারতীয় গ্রন্থাদিতে কৌটিল্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি, পঞ্চতন্ত্র ও পুরাণে কৌটিল্যের উল্লেখ আছে। পুরাণে কৌটিল্যকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের উল্লেখ আছে এবং মৌর্য যুগে এইরূপ সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার যে প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে এইরূপ মনে হয় যে অর্থশাস্ত্র যে আকারে আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা মৌর্য যুগে কৌটিল্য কর্তৃক রচিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীযুগে উহাতে কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত হইয়াছিল। যাহা হউক, যে যুগেই এই গ্রন্থখানি রচিত হউক না কেন ইহার রচয়িতা যে কৌটিল্য সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং মৌর্য যুগের উপাদান হিসাবে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়বস্তু: রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, রাষ্ট্র-ব্যবহার নীতি ও সমাজ সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

রাষ্ট্রশাসন: অর্থশাস্ত্রের বিবরণ হইতে মনে হয় যে মৌর্য সাম্রাজ্যে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভু। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অবাধ বটে কিন্তু তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কঠোর নির্দেশ ছিল। তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করিতে পারিতেন না। জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য অর্থশাস্ত্রে রাজাকে কঠোর পরিশ্রম করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজকর্তব্য

কৌটিল্যের মতে রাজধর্ম পালনে রাজা ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ বাধ্য থাকিতেন। এই সর্তেই তিনি প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণের অধিকার লাভ করিতেন। রাজা নারীদের মর্যাদা ও অন্যের সম্পত্তি রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিতেন। রাজার উপযুক্ত শিক্ষা ও আত্মসংযমের উপর অর্থশাস্ত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সুষ্ঠুভাবে রাজকর্তব্য পালনের জন্য রাজাকে মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সাহায্য ও উপদেশ লইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র রাজাই মন্ত্রী, কর্মচারী ও গৃহ-পুরোহিত নিয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। রাজা 'মহামাত্য' ও অমাত্য নামধারী রাজকর্মচারী নিয়োগ করিতেন এবং মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে

মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ও অন্যান্য কর্মচারী

দেশ শাসন করিতেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে রাজার কোন বাধ্যবাধকতার নির্দেশ নাই। রাজ্যের সকল বিষয় অবহিত থাকিবার জন্য রাজাকে গুপ্তচর নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে বহু প্রকারের গুপ্তচর ও পাঁচটি গুপ্তচর বিভাগের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রে ১৮টি বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখ আছে। প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কৌটিল্য নানাপ্রকার অধ্যক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। নগর পরিচালনার দায়িত্ব 'নগরাধ্যক্ষ' ও সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব 'বলাধ্যক্ষ' এবং কৃষি বিভাগের পরিচালনার ভার অপর এক অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত রাখিবার নির্দেশ ছিল। প্রতিটি বিভাগে বহুসংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে কর্মচারীগণের বেতনের হারও উল্লিখিত আছে।

অর্থশাস্ত্রে রাজস্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৌটিল্যের কথায় "সব কিছুই অর্থের উপর নির্ভর করে। সুতরাং রাজকোষের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষের প্রধান দায়িত্ব ছিল জমি জরিপ করিয়া রাজকর ধার্য করা। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকররূপে গ্রহণ করা হইত। ইহা ছাড়া জলকর, জমির উপর সেস্ জাতীয় অতিরিক্ত করও আদায় করা হইত। নগরগুলি হইতে শিল্পকর ও বসতবাটির উপর হইতেও কর আদায় করা হইত। এতদ্ভিন্ন রাজাকে প্রয়োজনবোধে ধনী প্রজাবর্গের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায়ের অধিকারও অর্থশাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে ধনীদের নিকট হইতে দুই প্রকারে অর্থ আদায়ের নির্দেশ আছে—যথা অতিরিক্ত কর স্থাপন বা 'কারসানার্ম' ও উহাদের সঞ্চিত অর্থ বলপূর্বক হরণ বা 'বমনাম'। যাহারা স্বেচ্ছায় রাজাকে ভূসম্পত্তি বা অর্থ প্রদান করিত—রাষ্ট্র কর্তৃক উহাদিগকে সম্মানিত করা হইত।

রাজস্ব

রাজবিচারালয় ছাড়াও কৌটিল্য কয়েকটি নিম্ন বিচারালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা 'স্থানীয়', 'দ্রোনমুখ' ও 'সংগ্রহণ'। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামলাগুলি 'গ্রামিণ' বা 'গ্রামিক'গণ দ্বারা মীমাংসিত হইত। অর্থশাস্ত্রে বিচারকার্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহাতে ১৮ প্রকারের দণ্ডবিধির নির্দেশ আছে, তন্মধ্যে ৭ প্রকারের বেত্রাঘাতের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণ প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। কিন্তু রাজদ্রোহিতার অপরাধে কোন ব্রাহ্মণ অভিযুক্ত হইলে তাহাকে জীবন্তদগ্ধ করার পরিবর্তে জলে ডুবাইয়া মারিবার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে আছে।

বিচারকার্য ও দণ্ডবিধি

সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ

সাধারণতঃ রাজপরিবার হইতে নিযুক্ত হইতেন। ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির শাসনভার 'রাষ্ট্রীয়' উপাধিধারী কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি জেলায় ও প্রতিটি জেলা কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। জেলার শাসক ছিলেন 'স্থানিক' এবং গ্রামের শাসক ছিলেন 'গোপ' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী। 'প্রদেষ্ট' নামক রাজকর্মচারী 'স্থানিক' ও 'গোপ'গণের কার্য পরিদর্শন করিতেন। প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে অবহিত থাকিবার জন্য কৌটিল্য রাজা কর্তৃক গুপ্তচর নিয়োগের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি দুই শ্রেণীর গুপ্তচরের কথা বলিয়াছেন—যথা 'সমস্থা' (যাহারা নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত) এবং 'সঞ্চারা' (যাহারা ভ্রমণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত।

প্রাদেশিক শাসন

রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতিঃ যদিও অর্থশাস্ত্রে প্রধানতঃ রাজতন্ত্র সম্মত শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি স্বায়ত্ত শাসিত উপজাতি ও স্বায়ত্ত শাসিত গ্রামগুলিরও উল্লেখ ইহাতে আছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে কৌটিল্য বিষদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শত্রু সবদাই বিরাজ করিয়া থাকে। এই কারণে রাষ্ট্রনীতিতে বৈধতা বা নৈতিকতার কোন স্থান নাই। প্রয়োজন বোধে রাজা স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন—কৌটিল্য এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি চারিটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন—যথা 'সাম' (সন্ধি ও বন্ধুত্ব) 'দান' (অর্থদান, সাহায্যদান), ভেদ (শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে বিভেদের সৃষ্টি করা) এবং 'দণ্ড' (আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বা শাস্তি প্রদান)। কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি অবাস্তব। শক্তিশালীগণ মাত্রই যুদ্ধ করিবেন। একমাত্র শক্তিই যে কোন দুইটি রাষ্ট্র বা দুই রাজার মধ্যে শান্তি বজায় রাখিতে পারে। যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র করার ক্ষমতাকেই কৌটিল্য রাজগুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ বলিয়া অতিহিত করিয়াছেন।

অর্থশাস্ত্রে নারীর স্থানঃ অর্থশাস্ত্রে নারীদের সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। বিবাহের পূর্বে ও পরে নারীগণ যথাক্রমে পিতামাতা ও স্বামীর অভিভাবকত্বে থাকিত। বিবাহের পূর্বে অভিভাবকদের নিকট বাধ্য থাকিবার কঠোর নির্দেশ ছিল।

'মানব ধর্মশাস্ত্রে' বর্ণিত বৈবাহিক রীতিনীতির সহিত অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বৈবাহিক রীতি-নীতির সাদৃশ্য দেখা যায়। নারীদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ নাই। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে ৭ বৎসর বয়সে নারীগণ সন্তান প্রসব করিত এবং ৪০ বৎসর বয়সে তাহারা বৃদ্ধাবস্থা লাভ করিত। মনুসংহিতা অনুসারে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ১২ বৎসর বয়স্কা নারীকে বিবাহ করিবে এবং ২৪ বৎসর

নারীদের বিবাহের বয়স

বয়স্ক পুরুষ ৮ বৎসর বয়স্কা নারীকে বিবাহ করিবে। অর্থশাস্ত্রে নারী ও পুরুষদের বিবাহ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে বৈবাহিক চুক্তির কথাও উল্লিখিত আছে। সমাজে জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা কঠোর থাকায় দুই বর্ণ বা জাতিভুক্ত নর-নারীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিবাহের নিন্দা করা হইয়াছে। অবশ্য মনুসংহিতায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুই বর্ণের মধ্যে বিবাহ স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এইরূপ বিবাহের সর্ত ছিল এই যে নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না।

বর্ণ বিবাহ

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকারের বিবাহের বর্ণনা আছে যথা ব্রহ্ম-বিবাহ, প্রাজাপত্যয় বিবাহ, আর্য-বিবাহ, দৈব-বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ, অসুর-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ ও পৈশাচ-বিবাহ। মনুসংহিতায় অসুর ও পৈশাচ বিবাহের নিন্দা করা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে এই আট প্রকারের বিবাহের মধ্যে কোনটিকেই নিন্দা করা হর নাই বটে তবে প্রথমোক্ত চারিটি প্রকারের বিবাহ ইহাতে সমর্থিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে নারী ও পুরুষদের পুনর্বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে। স্ত্রীবন্ধ্যা হইলে বা কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ না করিলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত। নারীগণও স্বামীর জীবিতাবস্থায় পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি পাইত। অবশ্য কৌটিল্য প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ

পুনরায় বিবাহ

বহু-বিবাহ প্রথা প্রাচীন কালে বহুল প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্রেও বহু বিবাহ প্রথা সমর্থিত হইয়াছে। গ্রীক লেখকগণও বহু-বিবাহ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের কথায়, "ভারতীয়গণ অগণিত সন্তান সন্ততির জন্য যত খুশী বিবাহ করিত।" অর্থশাস্ত্রে বহু বিবাহের উল্লেখ থাকিলেও একসময় একাধিক পুরুষকে স্বামীত্বে গ্রহণ করার উল্লেখ নাই।

বহু বিবাহ

অর্থশাস্ত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথারও উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের মতে "স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিলে বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃতি লাভ করিত।"

বিবাহ বিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের সমাজে গণিকা বৃত্তি মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। অর্থশাস্ত্রে 'গণিকা' ও 'রূপজীবিকা'-র উল্লেখ আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে নারী কখন কখন গণিকা বৃত্তি গ্রহণ করিত। আবার কখন কখন উহারা স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি গ্রহণ করিত। গণিকাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হইত। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'গণিকাধ্যক্ষ' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। 'গণিকাধ্যক্ষগন'

গণিকা বৃত্তি

গণিকাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন এবং উহাদের উপর কর ধার্য করিতেন। গণিকাগণকে নৃত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। গণিকাগণের পুত্র-কন্যাগণকে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে উপযুক্ত করিয়া তোলা হইত।

অন্যান্য আলোচনা : উপরোক্ত আলোচনাদি ছাড়াও অর্থশাস্ত্রে জনসাধারণের অবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি বিষয়েরও আলোচনা রহিয়াছে।

মৌর্যশাসনের প্রকৃতি : (Nature of Maurya Administration) মেগাস্থিনিসের বিবরণ, অর্থশাস্ত্র ও অশোকের অনুশাসনলিপি হইতে মৌর্য শাসনপ্রণালী সম্পর্কে যাহা জানা যায় তাহা হইতে মনে হয় যে শাসনব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। শাসন-ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কর্মচারীগণের নিপুণতা, উহাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ক্ষমতাভেদ এবং বিভিন্ন বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা ঐতিহাসিকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। স্মিথের মতে মৌর্যশাসনব্যবস্থা আকবরের শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল। বস্তুতঃ মৌর্য শাসনাধীনেই ভারতে জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

উন্নত শাসনব্যবস্থা

কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে মৌর্য রাজগণ ছিলেন 'স্বৈরাচারী'। চন্দ্রগুপ্তের শাসন প্রণালীর বর্ণনা প্রসঙ্গে স্মিথ মন্তব্য করিয়াছেন যে "The normal government of an Indian Kingdom appears to have been always untempered autocracy"। রোমান ঐতিহাসিক জাষ্টিনও এই মত পোষণ করেন। ইহাদের মতে মৌর্য শাসন পদ্ধতি নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপ মন্তব্যের পশ্চাতে তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে প্রথমতঃ, রাজা ছিলেন একাধারে প্রধান বিচারক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত ও প্রধান আইন-প্রণেতা। বাস্তব ক্ষেত্রে রাজা কাহারো নিকট দায়ী থাকিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর প্রথা সম্ভবতঃ জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিত। তৃতীয়তঃ, মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সময় দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল, সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করা হইত। অনেক ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির সাহায্যে রাজস্ব পর্যন্ত আদায় করা হইত। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্মিথ মৌর্য-শাসনকে "প্রাচ্যদেশ-সুলভ স্বৈরতন্ত্রের নামান্তরমাত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। চতুর্থতঃ মন্ত্রিগণের সহায়তায় মৌর্যরাজগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন বটে কিন্তু মন্ত্রিগণের

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী যুক্তি

পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবার বাধ্যবাধকতা মৌর্য রাজগণের ছিল না এবং বিদ্রোহ ব্যতীত রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না।

স্মিথ প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে

কিন্তু মৌর্য শাসন সম্পর্কে উপরোক্ত মতবাদ অতিরিঞ্জিত ও ভ্রমাত্মক বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা সকল ক্ষমতার আধার ছিলেন সত্য এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই শাসন-চক্র আবর্তিত হইত। রাজকর্মচারী নিয়োগ, বিচারকার্য পরিচালনা, যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ন্ত্রণ, গুপ্তচর নিয়োগ, প্রজাপালন প্রভৃতি বিবিধ দায়িত্বভার রাজার উপরই ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও মৌর্য শাসন পদ্ধতি 'অবিমিশ্র স্বৈরতন্ত্রের' ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—এমন কথা বলা যায় না।

রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না

প্রথমতঃ, রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না। তাঁহাকে প্রচলিত রীতি-নীতি ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে হইত। শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে বিভিন্ন বিভাগের রাজকর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হইত। জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি রাজার নির্দেশ থাকিত। অশোকের কলিঙ্গ লিপি এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। রাজা মন্ত্রিপরিষদের সহিত নানা বিষয়ে পরামর্শ করিতেন এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ করার আইনতঃ কোন বাধ্যবাধকতা রাজার ছিল না বটে তবে সাধারণতঃ সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত তিনি অগ্রাহ্য করিতেন না। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ও উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্যতা মৌর্য রাজগণ স্বীকার করিতেন। ইহা ছাড়া মৌর্যযুগে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং মৌর্য সাম্রাজ্যে একক অধিনায়কত্বের সহিত স্বায়ত্ত-শাসনের এক অভুতপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্রে স্বেচ্ছচারী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল এবং উহাদের নৃপতিগণ দৈবস্বত্বের উপর তাঁহাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা (Divine Right of Kings) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মৌর্য রাজগণ এইরূপ দাবি কখনও করেন নাই। অশোকের ন্যায় পরাক্রমশালী সম্রাটও নিজেকে দেবানাম প্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য যন্ত্র হিসাবে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন

দ্বিতীয়তঃ, মৌর্য সম্রাটগণ কর্তৃক গুপ্তচর নিয়োগের সমর্থনে ইহা বলা যাইতে পারে যে বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগেও গুপ্তচর নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ভারতে গুপ্তচরগণকে সর্বদাই রাজার চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা হইত। ("In fact in India, spies are always looked upon as the eyes

and ears of the king.") বৈদিক যুগে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার যন্ত্রহিসাবে গুপ্তচর প্রথার ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং মৌর্য যুগের পূর্বেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। ইহা ছাড়া এই প্রথার মাধ্যমেই মৌর্য রাজগণ প্রজাবর্গের অবস্থা ও রাজকর্মচারীদের কার্যাদি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক কার্যাদি

তৃতীয়তঃ, চন্দ্রগুপ্তের সময় কর-প্রথা কঠোর ছিল সত্য। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে বিশাল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সুশাসনের জন্য বিরাট সৈন্য বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল। এই সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য কর-নীতি কঠোর করা ছাড়া সেযুগে অন্য কোন উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য মৌর্যরাজগণ স্বদেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

রাজকর্তব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণা

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও মৌর্যরাজগণ কখনও রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের খেয়ালখুসী চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন নাই যাহা মধ্যযুগে ইওরোপীয় নৃপতিগণের মধ্যে দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ দেওয়া আছে। রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গিক উন্নতি সাধন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজ কর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের ধারণা পৃথিবীর ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। "প্রজামাত্রই আমার সন্তানতুল্য, পিতা যেমন পুত্রের সুখে সুখী হন আমিও প্রজাবর্গের মঙ্গলে সেইরূপ সুখী হই"। রাজকর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের এইরূপ ধারণা মৌর্যশাসনের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে মৌর্য শাসনব্যবস্থাকে কোনমতেই 'সীমাহীন-স্বৈরতন্ত্র' বলা যায় না।

মৌর্যযুগে ভারতীয় জীবনধারা (Life under the Mauryas) ঃ বিভিন্ন উপাদান হইতে মৌর্য শাসনাধীনে ভারতীয়দের জীবনধারার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। যথা,—'ধর্মশাস্ত্র', 'অর্থশাস্ত্র' ও বাৎসায়নের 'কামসূত্র' ইত্যাদি।

এক নূতন যুগের সূচনা ঃ মৌর্যরাজগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল-গুলিতে শাসনব্যবস্থা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়-গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল। অবশ্য সম্রাট বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলের বাহিরে মৌর্য আইন-বিধি বিশেষ কার্যকরী হইত না। প্রথম তিনজন মৌর্য সম্রাটের শাসনাধীনে সমগ্র উত্তর-

ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটিভাবে অব্যাহত ছিল। রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও শান্তি বিরাজিত থাকায় ভারতীয়গণ নানাভাবে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যুগেই ভারত অভাবনীয়ভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় মৌর্যযুগকে এক বিপ্লবী যুগ বলা যায়। মৌর্যযুগেই ভারতে নব-যুগের সূচনা হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

শিল্প ঃ মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শিল্প ও ব্যবসায়ীদের নিগম-প্রতিষ্ঠানের (guild) মাধ্যমে ভারতে শিল্প-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নিগমগুলি ছিল দুই প্রকারের। ব্যবসামূলক নিগম (trade guild) ও বৃত্তিমূলক নিগম (craft-guild)। ব্যবসামূলক নিগমগুলি ছিল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সাঁচী-স্তূপ-লিপি হইতে জানা যায় যে উহার ক্ষোদাই কার্য বিদিসার হস্তীদন্ত-শিল্প-নিগম কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। নিগমগুলি সেযুগে ব্যাংকের (bank) কাজ করিত। নাসিক-গুহা-লিপিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিগম-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শিল্পীগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিত। নিগম-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচলন ব্যাপক হওয়ায় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। শিল্পীগণ সমাজে সম্মানলাভ করিত যদিও সমাজে ইহারা শূদ্র বলিয়াই পরিচিত ছিল। গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় শিল্পীদের নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত, চর্ম, যন্ত্র, ধাতু, বস্ত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পগুলি ছিল প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক।

বস্ত্রশিল্প

মৌর্যযুগে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প উন্নত ছিল। দেশে ও বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। সেযুগে কাশী, কোংকন, বঙ্গ ও মহীশূর ছিল বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। সূতীবস্ত্রের সহিত রেশম ও পশম বস্ত্রেরও সেযুগে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গান্ধার পশম বস্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেযুগে কারুকার্যময় কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মসলিন বস্ত্র রোমে রপ্তানি হইত। গাঙ্গেয়-উপত্যকায় মসলিন বস্ত্রের বহু কেন্দ্র ছিল। বস্ত্রশিল্প সেযুগে বহু লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইত।

কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত ও চর্ম শিল্প

মৌর্য শিল্পীগণ কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত ও চর্ম শিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদ, কাষ্ঠ শিল্পের উৎকর্ষের চরম নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রগামী নৌ-যান, শকট, রথ প্রভৃতি নির্মাণেও মৌর্য শিল্পীগণ অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল।

ধাতু শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। অর্থশাস্ত্রে নানা প্রকার ধাতু শিল্পের উল্লেখ আছে। খনিজবিদ্যা সম্বন্ধে ভারতবাসী জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। খনির কার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও টিন-প্রভৃতি ধাতুর বহুল প্রচলন ছিল। মৌর্যযুগে নর-নারীর মধ্যে অলংকারের প্রচলন ছিল এবং মণিমুক্তা খচিত বহু মূল্যবান অলংকারও প্রস্তুত হইত।

ধাতুশিল্প

মৌর্যযুগে বণিক ও ব্যবসায়ীগণ ছিল বিত্তশালী এবং উহাদের বিপুল ঐশ্বর্যের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সাঁচী-স্তূপ-লিপিতে ধনী বণিকদের প্রচুর অর্থদানের উল্লেখ আছে। মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বণিকশ্রেণী অকাতরে অর্থদান করিতেন।

বণিক শ্রেণীর উদ্ভব

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ রাজনৈতিক শান্তি ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়াও মৌর্যযুগে বৈষয়িক উন্নতির মূলে ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য।

ভূমি-রাজস্ব সেযুগে রাষ্ট্রের প্রধান আয় ছিল বটে ; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য হইতেও প্রচুর অর্থাগম হইত। সেযুগে 'বলি' ও 'ভাগ'-এর সহিত বাণিজ্য শুল্কও রাষ্ট্রের প্রধান আয় ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন-কালে একটি স্বতন্ত্র নৌ-বিভাগ ও নাবাধ্যক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল নদী-বন্দরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সমুদ্রপথে বাণিজ্য-পোত চলাচলে উৎসাহ প্রদান করা ও সাহায্য করা। কলিঙ্গবিজয়ের পর এবং কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বিখ্যাত বাণিজ্য-বন্দরগুলি মৌর্য-রাজগণের অধিকারভুক্ত হওয়ায় সমুদ্রপথে বাণিজ্যের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। মৌর্য রাজগণের আমলে পাটলিপুত্র শহরে বহু বিদেশী বাস করিত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী। ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটি পৃথক বিভাগ ছিল।

সমুদ্র পথের গুরুত্ব বৃদ্ধি

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর হইতে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত মৌর্য রাজগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহার ফলে বৈদেশিক দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি যায়। স্থলপথ ও জলপথ ধরিয়াই বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইত। জলপথে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি হইতে ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজগুলি আরব সাগরের উপর দিয়া পারস্য উপসাগর বহিয়া পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে উপস্থিত হইত। আবার লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া ভারতীয় বাণিজ্য পোতগুলি মিশর দেশেও গমনাগমন করিত। অপর দিকে স্থলপথেও পারস্য ও এশিয়া মাইনরের ভিতর দিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রেরণ করা হইত।

বাণিজ্য পথ

খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে ভারত ও রোম-সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত

লইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই সময় চীন, গ্রীস, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকে ভারত ও মিশরের মধ্যে পণ্য-বিনিময় চলিত। 'পৌরগ্রাম' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রথম খৃষ্টাব্দে ভারত ও পশ্চিম দেশগুলির মধ্যে জোর ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। এযুগে ভারতের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য সম্পর্ক

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পশ্চিমের মিষ্ট-মদ ও শুষ্ক ডুমুর মৌর্যরাজগণ আমদানি করিতেন। ইহার বিনিময়ে পশ্চিমাঞ্চলের বণিকগণ ভারত হইতে বিলাস-সামগ্রী ও মসলিন বস্ত্র রপ্তানি করিত। ভারতের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য ছিল মূল্যবান পাথর, মণিমুক্তা, মসলা, সুগন্ধকাষ্ঠ ও সূতীবস্ত্র। পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সকল পণ্য দ্রব্যের খুব চাহিদা ছিল। মৌর্য শাসনকালে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিশেষ সমিতি বা বোর্ড গঠিত ছিল।

আমদানি ও রপ্তানী

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য : মৌর্যযুগে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্র মনোযোগী ছিল এবং বাণিজ্য পথগুলির নিরাপত্তার প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি থাকিত। প্রধানতঃ নদীপথ ধরিয়াই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের চলাচল ছিল এবং স্থলপথে গো-শকট ও উষ্ট্র-পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান করা হইত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সিন্ধুনদ ও অন্যান্য নদীগুলি ছিল প্রধান জলপথ। দেশের অভ্যন্তরে বড় বড় পথ বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ছিল। এইগুলি রাজপথ বা 'মহামার্গ' নামে অভিহিত হইত। স্থলপথে বণিকগণকে পথ দেখাইবার জন্য 'স্থল-নিয়ামক' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত। বাংলাদেশ ও মগধ হইতে সুদূর কাশ্মীর ও গান্ধার পর্যন্ত বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া যাতায়াত করিত। বস্তুতঃ মৌর্য শাসনাধীনে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

মুদ্রা : বৈদিক যুগে মুদ্রার স্থলে সামগ্রীর বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বিনিময়ের মাধ্যম (medium of exchange) হিসাবে পণ্য-বিনিময়ের পরিবর্তে মূল্যবান ধাতুর বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হইতে থাকে। হিরোডোটাসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে ভারতীয় পারসিক ক্ষত্রপগণ পারস্য সম্রাটকে স্বর্ণ পিণ্ড (gold ingots)-এ তাঁহাদের বাৎসরিক কর প্রদান করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় যে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠশতকেই স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ডের প্রচলন হইয়াছিল। সেই সময়ে বা উহার কিছু পরেই নির্দিষ্ট আকারে ও ওজনে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন শুরু

বৈদিগ যুগে পণ্য বিনিময় প্রথা

পরবর্তী যুগে ধাতুপিণ্ড ও ধাতু মুদ্রার প্রচলন

হয়। সুতরাং মৌর্য পূর্ব যুগেই মুদ্রার প্রচলন শুরু হইয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পানিনির ব্যাকরণ, জাতক ও অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার উল্লেখ আছে। স্বর্ণমুদ্রা 'নিবক' ও 'সুবর্ণ' নামে অভিহিত হইত এবং রৌপ্য মুদ্রা 'কার্যাপণ', 'প্রবন' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। 'কার্যাপণ' নামে তাম্র মুদ্রারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩২ রতি ওজনের রৌপ্য মুদ্রার উল্লেখ 'মানব-ধর্মশাস্ত্র' ও পুরাণে পাওয়া যায়। তাম্র মুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল ৮০ রতি। 'কাকনি' নামে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকারের তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্রে 'পণ' নামে এক প্রকার রৌপ্য ও 'মাবক' নামে এক প্রকার তাম্র মুদ্রার উল্লেখ আছে।

পানিনির ব্যাকরণ, জাতক ও অর্থশাস্ত্রে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র-মুদ্রার উল্লেখ

মৌর্য-শাসনকালে 'পণ' ও 'মাবক'-উভয় প্রকারের মুদ্রার প্রচলন ছিল। সেই যুগে রাজা বা রাষ্ট্রই একমাত্র মুদ্রা-প্রচারের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে বণিক, বণিক-সংঘ ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি মুদ্রা প্রচার করার অধিকার লাভ করিত। মুদ্রা হইতে মৌর্যযুগের অর্থ নৈতিক অবস্থার আভাষ পাওয়া যায়।

মৌর্যযুগে প্রচলিত 'পণ' ও 'মাবক'

সামাজিক ব্যবস্থা : হিন্দুসমাজের দুইটি বৈশিষ্ট্য—যথা বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম—মৌর্যযুগে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক লেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে বর্ণ বা জাতির বাহিরে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং নিজ নিজ বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তি ত্যাগ করাও নিষিদ্ধ ছিল—যেমন, সৈনিক উহার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষক বা শিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত না। গ্রীক লেখকগণের বিবরণী ও অশোকের অনুশাসন লিপিতে গৃহী ও ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীদের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে সে যুগে সমাজে চতুরাশ্রম প্রথার প্রচলন ছিল।

বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথার প্রচলন

কিন্তু সে যুগে বহু ধর্মমতের উদ্ভব ও বৈদেশিক জাতির আক্রমণের ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছিল। ভারতীয় ও বৈদেশিক নৃপতিগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং জনৈক সাতবাহন-রাজ বর্ণ সংমিশ্রণ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এইরূপ দৃষ্টান্তও আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্য ও শূদ্রদের সাধারণ বৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত আছে। গ্রীক লেখকগণের বিবরণ অনুসারে মৌর্যযুগে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে বৃত্তিমূলক পার্থক্যের অবসান ঘটিতে থাকে এবং ইহার স্থলে কৃষক, পশুপালক ও বণিকগণ নির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে স্বীকৃত হইতে থাকে। দার্শনিকগণের মধ্যে চিকিৎসকগণও

জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস নূতন জাতি বা বর্ণের উৎপত্তি

একটি নির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে থাকে। সুতরাং মনে হয় মৌর্যযুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পায় এবং বহু পরিবর্তন সূচিত হয়।

সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে গ্রীক লেখকগণের বিবরণী ও সমসাময়িক অনুশাসন লিপিতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক আইন-প্রণেতাগণ নারীদের সামাজিক মর্যাদা স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু উহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু নারীদের স্বাধীনতার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যুগের ইতিহাসে নাবালক পুত্রদের অভিভাবিকা হিসাবে রাজ-মহিষীগণ কর্তৃক রাজ্যশাসনের বহু দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুগণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত এবং রাজপ্রাসাদে, পর্ণকুটিরে ও দেশের সর্বত্র উহাদের অবাধ ভ্রমণাধিকার ছিল। গুণাধ্য-এর গ্রন্থে সকল শ্রেণীর নারীদের স্বাধীনতার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা স্বাধীনভাবে দর্শন আলোচনায় জীবনাতিপাত করিত এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বামীদের সহিত স্ত্রীরা ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানার্জনের অধিকার লাভ করিত না। সে যুগে নারীদের অবরোধ প্রথারও প্রচলন ছিল। রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারীরা রাজার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত হইত। ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রী স্বামীর সহিত সক্রীয় অংশ গ্রহণ করিত। এই যুগে পুণ্যবতী নারীদের দান-ধ্যানের বহু পরিচও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পুণ্যবতী রানী গৌতমী-বলশ্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। শাসন কার্যের ব্যাপারে নারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা,—স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র।

নারীর স্থান

মৌর্যযুগে দাসত্ব প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং ইহা সমাজে স্বীকৃত ছিল। অশোক দাস ও মজুরদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সকলের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশও দিয়াছিলেন। অবশ্য আরিয়ান ও মেগাস্থিনিস দাসত্ব প্রথার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ গ্রীস ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে দাসত্ব প্রথা যেরূপ কঠোর ছিল ভারতে এই প্রথার সেরূপ কঠোরতা ছিল না বলিয়াই ইহা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

দাসত্ব প্রথা

মৌর্য যুগে শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। ধর্মশাস্ত্রে অশিক্ষিত ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম-আইনে তিনটি উচ্চবর্ণের শিক্ষা-দীক্ষার নির্দেশ আছে। ব্রাহ্মণগণই একমাত্র শিক্ষকতায় অধিকার লাভ করিত কিন্তু বুদ্ধের পর বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হইয়াছিল। অবশ্য সনাতনি প্রথা অনুসারে শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর নিকট

শিক্ষা

শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীনকাল হইতেই তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। জনসাধারণের বোধগম্যের জন্য অশোকের অনুশাসনগুলি প্রাকৃত ভাষার উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় জনসাধারণ লিখন-পঠনে অভ্যস্ত ছিল। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের কতক অঞ্চলেও প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল।

শিক্ষা কেন্দ্র

শিক্ষায়তনগুলিতে প্রধানতঃ সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ছন্দ ও গণিত প্রভৃতি বিষয়ে রীতিমত পঠন-পাঠন চলিত। পানিনির সময় হইতে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) ব্যাকরণ পাঠে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত এবং ইহা ছিল প্রধান পাঠ্য বিষয়। মহাভারত ও পুরাণও পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে মৌর্য আমলে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষার বিষয়

নিগম বা 'শ্রেণীর' মাধ্যমে কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল। সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যান্ত্রিক ও খনিজ বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষাদানের উল্লেখ মনু সংহিতায় পাওয়া যায়।

কারিগরি বিদ্যাচর্চা

এইযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে চিকিৎসকদের উল্লেখ আছে। অশোক চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র

মৌর্যযুগে রচিত গ্রন্থাদির সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অনেকে অনুমান করেন যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র ও বৌদ্ধগ্রন্থ 'কথাবত্ত'—এইযুগেই রচিত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক পাতঞ্জলির রচনার মধ্যে মৌর্য যুগের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুগেই সম্ভবতঃ 'মানবধর্ম-শাস্ত্র' রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বনন, শক ও পহ্লবদের উল্লেখ আছে। মহাভারত ও রামায়ণের কোন কোন অংশ প্রাচীন কিংবদন্তী অবলম্বনে এযুগেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

সাহিত্য

ধর্ম ঃ মুদ্রা, অনুশাসনলিপি, পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' ও গ্রীক গ্রন্থকারগণের রচনা হইতে মৌর্য যুগের ধর্মনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতার পূজার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্য দুইটির প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকেও দেবতাজ্ঞানে পূজার প্রচলন এযুগেই শুরু হইয়াছিল। পানিনির গ্রন্থে বাসুদেবের উল্লেখ আছে এবং কৃষ্ণের পূর্বেই তাঁহার ভ্রাতা বলরাম খৃঃ পূর্ব

তৃতীয় শতকে দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন। পাতঞ্জলির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মৌর্যযুগে শিব, স্কন্দ ও বিশাখের মূর্তি প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইত। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ও বরুণ ছিলেন প্রধান।

বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলি এইযুগেও প্রচলিত ছিল এবং ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা, অশ্বমেধ, বাজপেয়, পুরুষমেধ ইত্যাদি। রাজন্যবর্গের মধ্যে অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান রীতিমত প্রচলিত ছিল।

এই যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মও প্রচলিত ছিল। অশোকের অনুশাসনে ব্রহ্মাণদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অযোধ্যা, বিহার ও উড়িষ্যায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও সম্ভবতঃ জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাহিরেও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ছাড়াও এই যুগে 'আজিবক' প্রভৃতি বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। বহু ধর্ম ও ধর্মমতের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও মৌর্য যুগে ধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জনসাধারণের উন্নত চরিত্র

জনসাধারণের অবস্থা: মৌর্যযুগে ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাপন-প্রণালী সম্পর্কে গ্রীক লেখকগণ বলেন যে সকল শ্রেণীর লোকেরা সুষ্ঠুজীবন যাপন করিত। সাধারণ লোকেরা ছিল শান্ত, সৎ, ও কষ্টসহিষ্ণু, উহাদের নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত। বহু নগরের উৎপত্তি ও পৌর-জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধির ফলে ধনী সম্প্রদায়ের অধিকংশই নগরবাসী হইয়া উঠিয়াছিল। নাগরিক বা নগরবাসীদের জীবন-ধারা স্বতন্ত্র ও উন্নত ছিল। নগরবাসীগণই সকল প্রকার বিলাস-ব্যসন উপভোগ করিত। বাৎসায়ণের বর্ণনা হইতে নাগরিক জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে শিক্ষিত ও ধনী যুবকদের বসবাসের পক্ষে নগরই ছিল উপযুক্ত স্থান। অবশ্য বৌদ্ধগণ সৎলোককে নগরবাসী না হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' নগর বিন্যাস ও নাগরিকগণের বাসগৃগের সুন্দর বর্ণনা অছে। ধনী নাগরিকের মনোরম অট্টালিকা, সুসজ্জিত কক্ষ, তাহার আমোদ প্রমোদ ও বেশভূষার মনোজ্ঞ বর্ণনা 'কামসূত্রে পাওয়া যায়। দেহ-চর্চা ও দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রতি ধনী নাগরিকগণ বিশেষ মনঃসংযোগ করিত। উহাদের আহার্য ছিল পুষ্টিকর এবং চাউল, গম, বার্লি, দুধ ও মাংস ছিল প্রধান খাদ্য। নাগরিকগণের মধ্যে মদের খুবই প্রচলন ছিল এবং ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য

নগর ও নগরবাসী ধনী শ্রেণী

কৌটিল্য কতকগুলি বাধানিষেধের নির্দেশ দিয়াছেন। মোটামুটিভাবে বিত্তশালীগণ আলস্যে ও আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইত।

বুদ্ধিজীবি ও অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া ভারতের জনসমাজ সেইযুগে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যথা, কৃষক, পশুপালক ব্যবসায়ী ও শিল্পী। ইহাদের মধ্যে কৃষকগণ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মৌর্যযুগের প্রথম দিকে কৃষকগণের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল এবং উহারা যুদ্ধ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিল। কৃষককুল জনহিতকর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিত বলিয়া উহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা অবিচার সাধারণতঃ করা হইত না। উহারা শহর হইতে দূরে গ্রামে বসবাস করিত। যুদ্ধকালে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি করা নিষিদ্ধ ছিল। গ্রীক লেখকগণ কৃষকগণকে বিনয়ী ও ভদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শিল্পীগণ প্রস্তুত করিত। শিল্পীগণ যে শুধু করপ্রদান হইতেই অব্যাহতি লাভ করিত তাহাই নহে উহারা সরকারের নিকট হইতে ভরণ-পোষণও পাইত। এইজন্য অবশ্য কতকগুলি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তব্য উহাদের পালন করিতে হইত।

সাধারণ জনসমাজ

চুরি-ডাকাতি সেইযুগে ছিল না বলিলেই চলে এবং সততা ভারতীয়দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। জনসাধারণের মধ্যে মদের প্রচলন ছিল এবং উহাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল খুবই সাধারণ। আইনের কোনরূপ জটিলতা ছিল না এবং লেন-দেনের ব্যপোরে পারস্পরিক সততা ও বিশ্বাস ছিল।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে মনে হয় যে মৌর্যযুগে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরা মোটামুটি শান্তিপ্রিয় ছিল এবং সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি ছিল।

মৌর্যযুগের শিল্পকলা (Maurya Art and Architecture): হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার ধ্বংসের পর প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ভারতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শিল্প-কলার নিদর্শন

ঐতিহাসিক যুগে যে সকল ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাও খৃঃ পূর্ব ৫০০ অব্দের পূর্বের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সম্রাট অশোকের আমল হইতেই প্রকৃত উন্নত শিল্পধারার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মৌর্য যুগের শিল্পকলা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মৌর্য যুগে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত অশোকের স্তম্ভগুলি, ভারুত ও সাঁচি স্তূপগুলি এবং গয়ার সন্নিকটে 'আজিবক' গুহাগুলি, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রাসাদ প্রভৃতি মৌর্য যুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অশোকের নির্মিত স্তম্ভ ও স্তূপগুলি সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের ও উন্নত রুচির সাক্ষ্য বহন করে। এক একটি অখণ্ড পাথর দিয়া স্তম্ভগুলি নির্মিত। নন্দনগড়, এলাহাবাদ, রুমিনদেই, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে বহু স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কারুকার্য ও মসৃণতা আজিও ইওরোপীয় শিল্পীদের নিকট বিস্ময়কর রহিয়াছে। সারনাথ ও অপরাপর স্তম্ভগুলিতে পারসিক শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। সারনাথের স্তম্ভশীর্ষে নির্মিত পশুমূর্তিগুলি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

স্তম্ভশীর্ষে পশুমূর্তিগুলির সহজ স্বাভাবিক রূপ লক্ষ্য করিয়া স্মিথ মন্তব্য করিয়াছেন যে এইরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন অপর কোন দেশে একান্তই বিরল, ইহাতে আদর্শ ও বাস্তবের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। সারনাথ স্তম্ভের শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া সার জন মার্শল, মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহার ক্ষোদাইকার্য ও রচনাভঙ্গী উৎকৃষ্ট এবং প্রাচীন জগতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য আর সৃষ্ট হয় নাই।

অশোকের আমলে বহু স্তূপ ও গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল। স্তূপগুলির মসৃণতা আজিও বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। এইগুলি পাথর বা ইষ্টক নির্মিত। কোথাও কোথাও স্তূপগুলি পাথরের বেষ্টনি বা রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতিটিতেই একটি বা দুইটি করিয়া কারুকার্যখচিত প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। ভারত ও আফগানিস্থানে অশোক মোট ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। হ্যাভেল-এর (Havell) মতে ভারুত ও সাঁচির স্তূপগুলির ভাস্কর্যশিল্পে অনার্য ও আর্য প্রভাবের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মৌর্যযুগে নির্মিত নগরগুলি ও রাজপ্রাসাদগুলি উন্নত স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে নদী ও সমুদ্রের নিকটবর্তী শহর ও গৃহগুলি কাষ্ঠ নির্মিত ছিল। অভ্যন্তর অঞ্চলের গৃহগুলি ইষ্টক নির্মিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদ মেগাস্থিনিসের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি বৃহৎ তোরণ ও স্তম্ভ ছিল এবং মেঝেগুলি কাষ্ঠ নির্মিত ছিল অনেকে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। অশোকের প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদটি ফা-হিয়েনকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রাসাদগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইগুলির সামান্য কিছু অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে একশত স্তম্ভ সংযুক্ত একটি বিরাট কক্ষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় শিল্পের নৈপুণ্য

মৌর্যযুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে ভারতীয় শিল্পীগণ যে অসাধারণ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ইওরোপীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের (যথা মার্শাল, মশিয়ে, স্যানহার্ত প্রভৃতি) মতে অশোকের পাটলিপুত্রের প্রাসাদ, সারনাথের প্রাসাদ ও সারনাথ-স্তম্ভের সিংহমূর্তি প্রভৃতিতে পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতি অনুকরণ করা হইয়াছিল। মার্শালের মতে পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতি ভারতীয় শিল্পীগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতায়িত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও স্থাপত্যবিদগণের (যথা শ্রীশরৎচন্দ্র, তারাপদ প্রভৃতি) মতে অশোকের স্থাপত্য পরিকল্পনার মধ্যে পারসিক বা গ্রীক প্রভাব ছিল না বরঞ্চ উহাতে আর্য ও অনার্য-শিল্পরীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। হ্যাভেলও এই মত সমর্থন করেন'। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে বৈদেশিক শিল্পরীতি ভারতীয় শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করার পরিবর্তে ভারতীয় শিল্পরীতি মধ্য-এশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

মৌর্য–শিল্পে পারসিক প্রভাব

সম্রাট অশোকের সময় হইতে তুর্কীদের আগমনকাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে শিল্পকলা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অনেকাংশেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মৌর্যশাসনকালে ভারতের বিভিন্নস্থানে বহু বৌদ্ধ সংঘরাম, স্তূপ, স্তূপের আবেষ্টনী (রেলিং), তোরণ, চৈত্য প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত সাঁচীর বৃহৎ স্তূপটি, উহার আবেষ্টনী ও তোরণ বৌদ্ধ স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারুতে স্তূপের আবেষ্টনী এবং সাঁচী স্তূপের আবেষ্টনী ও তোরণগুলিতে বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বহু উপখ্যান নিপুণভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ মৌর্য শিল্প বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল।

মৌর্য শিল্পে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ (Successors of Asoka)ঃ আনুমানিক ২৩২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সম্রাট অশোক পরলোক গমন করেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে অশোক তক্ষশীলায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। অশোকের যে বহু সন্তান-সন্ততি ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু যথার্থ ইহাদের মধ্যে কে অশোকের পরেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অশোকের শিলালিপিতে তীবরের নাম পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তীবর কোন সময় সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। সমসাময়িক সাহিত্যে মহেন্দ্র, জালুক ও কুনালের নাম পাওয়া যায়। কোথাও মহেন্দ্রকে অশোকের পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে আবার কোথাও তাঁহাকে অশোকের ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং ইহার কোন্‌টি

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ সম্বন্ধে মতভেদ

সত্য তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বায়ু পুরাণ* অনুসারে অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুনাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুনালের পর বন্ধুপালিত, ইন্দ্রপালিত, দেববর্মন ও বৃহদ্রথ যথাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে অশোকের পুত্র জালুক কাশ্মীর রাজ্যের কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতে গান্ধার রাজ্যে অশোকের উত্তরাধিকারী ছিলেন বীরসেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ দিব্যবদনে অশোকের উত্তরাধিকারীগণের নিম্নোক্ত তালিকা পাওয়া যায়—যেমন সম্প্রতি, বৃহস্পতি, বৃষসেন, পুষ্যধর্মণ ও পুষ্যমিত্র। এইরূপ পরস্পর বিরোধী তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া অশোকের পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণের সময়ানুক্রম স্থির করা অসম্ভব।

গার্গী সংহিতা অনুসারে অশোকের পৌত্র দশরথ মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডক্টর এইচ, সি, রায়চৌধুরী দশরথ ও বন্ধুপালিতকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। দশরথের পর 'সম্প্রতি সিংহাসনে আরোহণ করেন।' তিনি জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'পাটলিপুত্রকল্প' নামক গ্রন্থে সম্প্রতিকে 'ভারত-অধিশ্বর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্মিথের মতে সম্প্রতি অবন্তি ও পশ্চিম ভারতের অধিশ্বর ছিলেন। জৈন গ্রন্থে সম্প্রতিকে পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর অধিশ্বর বলা হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ, বায়ু পুরাণ ও গার্গী সংহিতায় সালিশুক নামে অশোকের অপর এক উত্তরাধিকারীর নাম পাওয়া যায়। ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে সম্প্রতির পুত্র বৃহস্পতি ও সালিশুক ছিলেন অভিন্ন।

মৌর্য বংশের অবসান

পুরাণ ও বাণভট্ট রচিত 'হর্ষ চরিত' অনুসারে বৃহদ্রথ ছিলেন মৌর্য বংশের শেষ রাজা। তিনি ১৮৫ খৃঃ পূর্বাব্দে নিজ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of Maurya Empire)ঃ চন্দ্রগুপ্ত ও কৌটিল্যের চেষ্টায় যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়। সাম্রাজ্যের এই পতন আকস্মিক ঘটনা নহে। বিবিধ কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

(১) ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অশোকের প্রতি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ মৌর্য সম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। শাস্ত্রীর মতে এই বিদ্বেষের কারণ ছিল—অশোক কর্তৃক পশুবলি

বিষ্ণু পুরাণ—অনুসারে অশোকের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন—সুয়সাস, দশরথ, সংগত সালিশুক, শতধাবন ও বৃহদ্রথ। মৎস-পুরাণ অনুসারে-অশোকের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন—দশরথ, সম্প্রতি, শতধাবন ও বৃহদ্রথ।

নিষিদ্ধকরণ ; 'দণ্ড সমতা' ও ব্যবহার-সমতা' নীতির প্রবর্তন এবং ধর্মমহামাত্র নিয়োগ। শাস্ত্রী মনে করেন যে পশুবলি রহিত আইন একমাত্র ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা-নীতির প্রবর্তন করিয়া অশোক ব্রাহ্মণদের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করিয়া অশোক ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণগণ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া মৌর্যবংশের বিলোপ-সাধন করিয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত

কিন্তু ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ শাস্ত্রী-মহাশয়ের অভিমতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, অহিংসা-নীতি অনুসরণ করিয়াই অশোক প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ইহা কোন শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। তাহা ছাড়া বহু প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণও প্রণী হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন। 'শ্রুতি'-সাহিত্যে ইহার উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তঃ, দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা নীতি প্রবর্তন করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শ্রেণী-নির্বিশেষে একই পদ্ধতির বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোন চেষ্টা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ধর্মমহামাত্রগণ যে কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার করিয়াই বেড়াইতেন এমন কথা বলা যায় না। ধর্মপ্রচার করা ছাড়াও ধর্মমহামাত্রগণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ রাখিতেন। অধিকন্তু ধর্ম-মহামাত্রগণ যে কেবলমাত্র অব্রাহ্মণদের মধ্য হইতেই নিয়োগ করা হইত এইরূপ কোন প্রমাণ বা নিদর্শন নাই। একথা অস্বীকার করা যায় না যে অশোক ছিলেন পরধর্ম-সহিষ্ণু এবং ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রাহ্মণদের তিনি শ্রমণদের ন্যায়ই শ্রদ্ধা করিতেন ও অর্থদান করিতেন। সুতরাং অশোকের প্রতি ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

ডক্টর রায়চৌধুরী ও মজুমদারের মত

(২) **সাম্রাজ্যের বিশালতাঃ** মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশালতা উহার পতনের একটি কারণ। সেই যুগে দ্রুত গমনাগমন ব্যবস্থার অভাব ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রাখিবার অসুবিধার ফলে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির পক্ষে সর্বত্র আধিপত্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

(৩) **প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচারঃ** সেই যুগে রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিত্বের উপর। অশোক শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজকর্মচারীদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর

করায় প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক শাসকগণ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতেন। অশোকের শিলালিপিতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর এই অত্যাচার চরমে পৌছিয়াছিল। ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসকগণ সাম্রাজ্যের সহিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(৪) **স্বতন্ত্র জাতিগুলির বিদ্রোহঃ** নীতির দিক দিয়া অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বতন্ত্র জাতি ও উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যতা ও সমতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে মৌর্যশাসনভুক্ত করার পরিবর্তে অশোক ইহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই স্বায়ত্ত-শাসিত জাতিগুলি ছিল অন্ধ্র, পুলিন্দ, কম্বোজ, রাষ্ট্রীক, ভোজ, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র। অশোকের মৃত্যুর পর ইহারা শক্তিশালী হইয়া মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে সাহায্য করিয়াছিল।

(৫) **পরবর্তী সম্রাটগণের অযোগ্যতাঃ** সাম্রাজ্যের দুর্দিনে শাসন-ভার বহন করিবার বা ভাঙ্গন হইতে উহাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি ও যোগ্যতা অশোকের পরবর্তী রাজগণের ছিল না। কল্হণের 'রাজতরঙ্গিনী' অনুসারে অশোকের মৃত্যুর পর জালুক কাশ্মীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া কনৌজ পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তারানাথের গ্রন্থ অনুসারে বীরসেন গান্ধারে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং আশোকের উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে "His (Asoka's) Sceptre was the bow of Ulysses which could not be drawn by any weaker hand"।

(৬) **অশোকের অহিংসা-নীতির কুফলঃ** কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-বিজয়-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকেও 'ভেরী-ঘোষের' স্থলে 'ধর্ম-ঘোষের' নীতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা ঘটিয়াছিল। এই দুর্বলতাহেতু আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছিল এবং ব্যাক্ট্রীয় গ্রীকগণের আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে বিদেশী আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া এই সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

উপসংহারঃ অশোকের ধর্মবিজয় নীতি কিয়দংশে মৌর্য সাম্রাজ্যের

পতনের কারণ হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তিনি দিগ্বিজয় নীতি অনুসরণ করিলেও কোন এক সময় এই সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যই ঘটিত। কিন্তু সভ্য জগতে তিনি ভারতের যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহা দুই হাজার বৎসর পরে আজও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

অশোক কর্তৃক স্থাপিত ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারার অক্ষুণ্ণতা

প্রশ্নমালা

1. Describe the Career of Chandragupta Maurya.
2. Give a brief account of Civil and Military administration of Chandragupta Maurya.
3. Describe Asoka as a ruler.
4. Describe Asoka as a missionary.
5. Explain Asoka's Dharma.
6. Give an account of the administrative system of the Mauryas.
7. What was the extent of Asoka's empire ? How was it governed ?
8. What measures Asoka adopted for the spread of Buddhism within and outside his empire ?
9. Review Asoka's Place in history.
10. Give an account of the Social and economic condition of the people under the Mauryas.
11. What were the causes of the downfal of the Maurya empire ? How far was Asoka responsible for the downfall ?
12. Critically examine the accounts of Megasthenes.

তৃতীয় অধ্যায়

মৌর্যোত্তর যুগে ভারত ঃ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক
(Post-Maurya Period : Political and Cultural)

রাজনৈতিক অনৈক্য ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হইল এবং একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। মগধে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। সাতবাহনগণ দক্ষিণ ভারতে মগধ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইল। চেত-বংশের নেতৃত্বে কলিঙ্গ পুনরায় স্বাধীন হইল এবং কিছুকাল এই রাজবংশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাধিক রাজন্যবর্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অধিকন্তু আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ লইয়া ব্যাক্ট্রীয় গ্রীকগণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের এক বিরাট অঞ্চল দখল করিয়া বসিল। ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া তিনশত বৎসরের মধ্যে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিল। এই সকল বৈদেশিক জাতিগুলির আগমনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক সংহতি কয়েক শত বৎসরের জন্য বিনষ্ট হইয়া গেল।

শুঙ্গ বংশ—খৃঃ পূঃ ১৮৫-৭৩ (The Sungas)

তথ্যাদি (Sources) ঃ শুঙ্গ-বংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল—পুরাণ, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'। এতদ্ভিন্ন কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নামক নাটক হইতে পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিদর্ভের রাজার সহিত অগ্নিমিত্রের যুদ্ধের কাহিনী পাওয়া যায়। 'দিব্যবদন' ও অযোধ্যা অনুশাসনলিপি হইতেও শুঙ্গ বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়।

উৎপত্তি (Origin) ঃ শুঙ্গ বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম নাটকে শুঙ্গগণকে বৈম্বিকা-বংশ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পানিনির মতে শুঙ্গগণ বৈদিক যুগের রাজা দিবোদাসের পুরোহিত ভরদ্বাজের বংশ-সম্ভূত। দিব্যবদনে পুষ্যমিত্র-শুঙ্গকে মৌর্যবংশ-সম্ভূত বলা হইয়াছে। আবার কাহারও মতে ইহারা ইরাণীয় সূর্য দেবতা 'মিত্রের' বংশ-সম্ভূত। কীথ ও ম্যাকডনেল (Keith and MacDonell)—বলেন যে 'অশ্বলায়ন শুত-সূত্রে' শুঙ্গগণকে শিক্ষক বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে এবং শুঙ্গীপুত্র নামে জনৈক শিক্ষকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহা হউক, শুঙ্গবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতবাদ থাকা সত্ত্বেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পুষ্যমিত্র শুঙ্গকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (খৃঃ পূঃ ১৮৫-১৪৯) : মৌর্যদের পর শুঙ্গগণ মগধে ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে ১০ জন মৌর্যসম্রাট ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর মৌর্য সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। 'হর্ষচরিত'—অনুসারে সৈন্য পরিদর্শনকালে নীচ কুলোদ্ভব সেনাপতি পুষ্যমিত্র সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এইরূপ বলা হইয়াছে যে অশোকের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের রাজত্বকালে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সেই সুযোগে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন।

বৃদ্ধবয়সে সিংহাসনে আরোহন করিয়া পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি 'সেনাপতি' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন।

পুষ্যমিত্রের রাজ্য সীমা

দক্ষিণে তাঁহার সাম্রাজ্য নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পাটলিপুত্র, অযোধ্যা ও বিদিশা (বর্তমান বেসনগর) উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অশোকের তুলনায় পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ছিল। তারানাথের বিবরণী অনুযায়ী পাঞ্জাবের জলন্ধর ও শিয়ালকোট শুঙ্গ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালের দুইটি ঘটনা হইল বিদর্ভ যুদ্ধ ও গ্রীক আক্রমণ।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে বিদিশার শাসনকর্তা ও পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের সহিত বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে

বিদর্ভ যুদ্ধ

বিদর্ভকে একটি নূতন রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহার রাজা যজ্ঞসেনকে মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের আত্মীয় বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৃহদ্রথের রাজত্বকালে যজ্ঞসেন বিদর্ভের শাসনকর্তা ছিলেন এবং পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্য-সিংহাসন দখল করিলে যজ্ঞসেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কথিত আছে যে যজ্ঞসেনের জনৈক আত্মীয় মাধবসেন যজ্ঞসেনের বিরুদ্ধে অগ্নিমিত্রের সাহায্যলাভের আশায় গোপনে বিদিশা অভিমুখে যাত্রাকালে যজ্ঞসেন কর্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হন। অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনের নিকট মাধবসেনের মুক্তি দাবী করিলেন। কিন্তু যজ্ঞসেন ইহাতে অসম্মত হইলে অগ্নিমিত্র বিদর্ভ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যজ্ঞসেন পরাজিত হইলেন এবং বিদর্ভ রাজ্য যজ্ঞসেনের দুই আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টিত হইল।

স্মিথের মতে কলিঙ্গরাজ খারবেল মগধ আক্রমণ করিয়া পুষ্যমিত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু খারবেল ও পুষ্যমিত্র সমসাময়িক ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ্যালান (Allan)-এর মতে হাতীগুম্ফ শিলা-লিপিতে খারবেল কর্তৃক যে রাজার পরাজয়ের কথা উল্লিখিত

আছে তাঁহার নাম ছিল বাহ্‌সতিমিত। স্থতরাং বাহ্‌সতিমিত ও পুষ্যমিত্র—এই দুই নামের অভিন্নতা প্রমাণ করা যায় না।

কালিদাস ও পাতঞ্জলির বিবরণী হইতে জানা যায় যে পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় গ্রীকগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া সকেত (অযোধ্যা) ও মধ্যমিকা (চিতোরের সন্নিকটে) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। 'গার্গী-সংহিতায়' উল্লিখিত আছে যে গ্রীকগণ পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং পরাজিত হইয়া কিংবা স্বেচ্ছায় তাহারা ফিরিয়া যায়। গার্গী সংহিতা অনুসারে এই ঘটনা পুষ্যমিত্রের রাজত্বের প্রথম দিকে ঘটিয়াছিল। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে উল্লিখিত আছে যে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বের শেষের দিকে গ্রীকগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। যুবরাজ অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়া আর্যাবর্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে গ্রীকগণের নেতা ছিলেন মিনান্দার অথবা ডিমেট্রিয়াস। দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বিদর্ভ-বিজয় ও যবন-বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন।

গ্রীক আক্রমণ

অশ্বমেধ যজ্ঞ

বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদন' ও তারনাথের গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দিব্যবদনে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শে পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্ম বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে পাটলিপুত্রে অবস্থিত 'কুকুতরমা' নামক বৌদ্ধ বিহারটি ধ্বংস করেন এবং শকল (পাঞ্জাব) পর্যন্ত সমস্ত বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস করেন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে হত্যা করেন। বৌদ্ধগণের প্রতি পুষ্যমিত্রের অকথ্য অত্যাচারের কথা স্মিথও স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের অনেকে এইরূপ কাহিনী বিশ্বাস করেন না। ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে শুঙ্গ-রাজত্বকালেই ভারুতের বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি নির্মিত হইয়াছিল ; স্থতরাং পুষ্যমিত্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বা বৌদ্ধ-নিধনকারী বলা যায় না। শুঙ্গরাজগণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দুধর্মী। কিন্তু তাই বলিয়া উহারা পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ডক্টর আর, এস, ত্রিপাঠীর মতে পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সত্য কিন্তু শুঙ্গ-রাজত্বকালে নির্মিত ভারতের বৌদ্ধ স্তূপ ও বেষ্টনীর নিদর্শন হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে শুঙ্গরাজগণ কখনই পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। তবে ইহা সত্য যে রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধগণ কিঞ্চিৎ নির্যাতিত হইয়াছিল এবং ইহার জন্য উহারা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী ছিল। মৌর্য বংশের অবসানে বৌদ্ধগণ স্বভাবতই পুষ্যমিত্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এবং পাঞ্জাবে উহারা পুষ্যমিত্রের বিরুদ্ধে গ্রীকগণকে প্রাকাশ্যভাবে সাহায্যও করিয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজদ্রোহিতার

ধর্ম: শুঙ্গরাজগণ কি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন ?

অপরাধের নিমিত্ত শাস্তিবিধানের জন্যই পুষ্যমিত্র বৌদ্ধগণের প্রতি কঠোর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ-নিধন নীতি কখনই গ্রহণ করেন নাই।

পুষ্যমিত্রের উত্তরাধিকারীগণঃ ৩৬ বৎসর রাজত্ব করার পর খৃঃ পূর্ব ১৪৯ অব্দে পুষ্যমিত্র পরলোক গমন করেন ও পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনি বিদিশার শাসনকর্তা ছিলেন এবং বিদর্ভ-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কালিদাস রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের নায়ক। অগ্নিমিত্রের পর সুজ্যেষ্ঠ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে সুজ্যেষ্ঠ-র পর সুমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্যমিত্রের রাজত্ব-কালে তিনি গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সুমিত্র ও বসুমিত্র ছিলেন অভিন্ন। রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্বল ও অলসপ্রিয়। ফলে তাঁহার সময় হইতেই শুঙ্গ সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। 'হর্ষচরিত' হইতে জানা যায় যে সুমিত্র নৃত্য ও সঙ্গীতের খুব প্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গীতাসরেই মুলাদেব নামে জনৈক আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। সম্ভবতঃ এই মুলাদেব ছিলেন কোশল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সুমিত্রের রাজত্বকালেই পাঞ্চাল, কৌশম্বী ও মথুরার স্বাধীন রাজ্যগুলির উদ্ভব হয় এবং শুঙ্গ সাম্রাজ্য মগধ ও মধ্য ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

অগ্নিমিত্র, সুজ্যেষ্ঠ, সুমিত্র, বজ্রমিত্র, ভগবত ও দেবভূতি

সুমিত্রের পর ১২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বজ্র মিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নয় বৎসর রাজত্ব করেন। ১১৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ভগবত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর দেবভূতি ৮২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবভূতি ছিলেন শুঙ্গবংশের শেষ রাজা। 'হর্ষচরিত' হইতে জানা যায় যে দেবভূতি নারীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং মন্ত্রী বাসুদেবের প্ররোচনায় এক নারী পরিচারিকার হস্তে দেবভূতি নিহত হন। এইভাবে বাসুদেব শুঙ্গবংশের অবসান ঘটাইয়া এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শুঙ্গ রাজত্বকালের গুরুত্ব (**Importance of Sunga Period**)ঃ ভারতের ইতিহাসে শুঙ্গবংশের রাজত্বকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথমতঃ, শুঙ্গরাজগণ গ্রীকগণের অগ্রগতি প্রতিহত করিয়া শুধু যে আর্যবর্তের নিরাপত্তাবিধান করিয়াছিলেন এমন নহে, ভারতীয় রাজন্যগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতেও উহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই সংকটকালে শুঙ্গরাজগণ দুর্বলতা প্রকাশ করিলে উত্তর ভারত গ্রীক পদানত হইত সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, শুঙ্গ যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে পুনরভ্যুদয় ঘটে গুপ্তযুগে তাহার চরম অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। 'মনুস্মৃতি' এই যুগেই

রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই যুগের অনুশাসন লিপিগুলি হইতে মনে হয় যে 'ভগবত' ধর্মও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। তৃতীয়তঃ, এই যুগেই শিল্পকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ভারুত-স্তূপ, সাঁচী স্তূপের তোরণ ও বেষ্টনী, অজন্তার চৈত্য-প্রকোষ্ঠ, বেসনগরের গরুড়-স্তম্ভ, বৌদ্ধ-গয়ার প্রস্তর বেষ্টনী, নাসিকের চৈত্য-প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি—শুঙ্গ-যুগের শিল্পকলার চরম নিদর্শন। চতুর্থতঃ, এই যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই যুগেই বিদিশা ও গোনর্দ ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

কান্ব-বংশ—খৃঃ পূঃ ৭৩-২৮ (The Kanva Dynasty)

শুঙ্গবংশের পর কান্ব-বংশের রাজত্ব শুরু হইল। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে ১১২ বৎসর শুঙ্গ রাজত্বের পর কান্বগণ রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন। 'হর্ষরচিত' অনুসারে জনৈকা নারী-পরিচারিকা কর্তৃক দেবভূতির হত্যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর, জি, ভাণ্ডারকার কান্বগণকে শুঙ্গ-ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুঙ্গরাজগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কান্বগণ পরবর্তীকালের পেশোয়াদের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু শুঙ্গ-সিংহাসন দখল করেন নাই। কিন্তু ভাণ্ডারের মত স্মিথ ও ডক্টর রায়চৌধুরী কর্তৃক সমর্থিত হয় নাই। পুরাণ অনুসারে কান্ববংশের চারিজন রাজা ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্মিথের মতে খৃষ্ট পূর্ব ৭৩ হইতে ২৮ অব্দ পর্যন্ত কান্ববংশের রাজত্ব চলিয়াছিল।

কান্ব-বংশের উৎপত্তি ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

কান্ববংশের রাজগণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে কান্ব-রাজ্য যে শুঙ্গ-রাজ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঞ্জাব গ্রীকগণের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। বিদিশায় শুঙ্গ রাজপরিবারের কেহ কেহ রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ মগধের মধ্যেই কান্ব-রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। এই বংশের চতুর্থ-রাজা সুদর্শন দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের রাজা সিমুক কর্তৃক পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হন। ইহার পরে 'মিত্র' উপাধি-ধারী কয়েকজন রাজা মথুরা ও মগধে কিছুদিন রাজত্ব করেন। ইহাদের সহিত শুঙ্গ বা কান্ববংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা জানা যায় না।

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রসমূহ (Kingdoms of the Deccan)

কলিঙ্গের চেতবংশ ঃ সম্রাট অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ রাজ্য বিজিত হইলেও কলিঙ্গের শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় নাই। অশোকের মৃত্যুর পর চেত বা

চেদীবংশীয় খারবেল নামে জনৈক পরাক্রান্ত রাজার নেতৃত্বে কলিঙ্গ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে খারবেলের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে খারবেল গণিত, আইন, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় কলিঙ্গ বংশের নরপতি। কিন্তু প্রথম দুই বংশের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খারবেল রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। রাজ্যাভিষেকের প্রথম বৎসরে তিনি কলিঙ্গের পূর্ব রাজধানীর সংস্কার সাধন করেন; দ্বিতীয় বৎসরে তিনি পশ্চিম ভারতে যুদ্ধাভিযান চালাইয়া মূশিকগণের রাজধানী বিধ্বস্ত করেন; চতুর্থ বৎসরে বর্তমান বেরার অঞ্চলের অন্তর্গত 'রথিক' ও ভোজগণকে পরাজিত করেন; ষষ্ঠ বৎসরে পৌর ও জনপদগুলিকে বিশেষ অধিকার দান করেন; অষ্টম বৎসরে উত্তর ভারতে যুদ্ধাভিযান চালাইয়া গয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করিয়া রাজগৃহের রাজাকে পরাজিত করেন; দ্বাদশ বৎসরে অঙ্গ ও মগধের রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়া প্রচুর উপঢৌকন আদায় করেন; সেই বৎসরে দক্ষিণ ভারতে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তিনি পাণ্ড্য রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করিয়া কলিঙ্গের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করেন। কথিত আছে তাঁহার আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া জনৈক যবন-রাজা মথুরায় পলায়ন করিয়াছিলেন।

খারবেল

রাজ্য জয়

খারবেল শুধু যোদ্ধা হিসাবেই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি সুশাসকও ছিলেন। তিনি জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্যও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শিল্প-সাহিত্যেরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্ম-কর্মের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। তাঁহার আমলে বহু মন্দির ও গুহা নির্মিত হইয়াছিল। হাতীগুম্ফ শিলালিপিতে* তাঁহাকে "শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারক ও ধর্ম-রাজা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

খারবেলের গুণাবলী

হাতীগুম্ফ শিলালিপি :—ডক্টর জয়স্বালের মতে খারবেলের হাতীগুম্ফ-শিলালিপি ভারত ইতিহাস রচনার এক অমূল্য উপাদান। মৌর্য-পূর্ব যুগের সময়ানুক্রমিক (chronology) ও জৈন ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে এই শিলালিপির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ৪৫০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত ভারতের বংশানুক্রমিকের (dynastic chronology) সুস্পষ্ট পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে মহাবীরের দেহত্যাগের একশত বৎসরের মধ্যে জৈনধর্ম উড়িষ্যায় রাষ্ট্রীয়-ধর্মে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ৪৫০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক ঐক্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার সামাজিক চিত্রও ইহাতে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত অন্ধ্র-রাজ্যের তৃতীয় রাজা প্রথম সাতকর্ণীর সম্পর্কেও ইহাতে উল্লেখ আছে।

সাতবাহন বংশ (The Satavahanas)
(খৃঃ পূঃ ২৭ হইতে তৃতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত)

তথ্যাদি (Sources)ঃ সাতবাহন বা অন্ধ্রগণের সম্পর্কে এ পর্যন্ত খুব সামান্যই অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং সেইগুলিতেও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। পূর্ব-দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম-দাক্ষিণাত্য হইতে যথাক্রমে ১৭টি ও ১৯টি অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে কিছু মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিগুলির মধ্যে নায়নিকার 'নানাঘাট-শিলালিপি', ও গৌতমীপুত্রের 'নাসিক-প্রশস্তি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎ-কথা হইতেও সাতবাহনগণ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

বংশ-পরিচয়ঃ সাতবাহনগণের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। পুরাণে সাতবাহনগণকে অন্ধ্র বলা হইয়াছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল অন্ধ্রগণের বাসভূমি। বৈদিক সাহিত্যে, মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে ও অশোকের অনুশাসনলিপিতে ইহাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সাতবাহনগণকে অন্ধ্রবংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন না। সম্ভবতঃ সাতবাহনগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে অনার্যদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। শিলালিপিতে ইহাদিগকে সাতবাহন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—অন্ধ্র বলিয়া নহে। ইহাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলি মধ্য ভারত ও উত্তর-দাক্ষিণাত্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তেলেগু বা অন্ধ্রদেশে ইহাদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে পরবর্তীকালে সাতবাহনদের আধিপত্য যখন কৃষ্ণা নদীর মোহনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে সেই সময় হইতেই সাতবাহনগণ 'অন্ধ্র' নামে পরিচিতি লাভ করে।

সাতবাহন শাসনকাল সম্পর্কে মতভেদঃ সাতবাহনদের শাসন-কালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ আছে। কোন কোন পুরাণ অনুসারে ১৯ জন রাজা ৩০০ বৎসর অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবার কতকগুলি পুরাণ অনুসারে এই বংশের ৩০ জন রাজা ৪০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্য-পুরাণ অনুসারে এই বংশ ৪৬০ বৎসর পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিল। বায়ু-পুরাণ অনুসারে এই বংশ ৩০০

হাতীগুম্ফ-শিলালিপি সম্পর্কে জয়স্বালের মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রে ডক্টর আর, সি, মজুমদার কর্তৃক সমর্থিত হয় নাই। মহাভারতের যুগে কলিঙ্গ-বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল এমন কথা ডক্টর মজুমদার স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নন্দবংশের আমলেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। ডক্টর মজুমদার খারবেলকে কলিঙ্গের তৃতীয়-বংশের অন্তর্গত বলিয়াও মনে করেন না।

বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। অপর একটি পুরাণ অনুসারে সিমুক ছিলেন সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কান্ববংশের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। আমরা জানি যে তৃতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে সাতবাহন বংশের অবসান ঘটিয়াছিল। যদি পুরাণ অনুসারে সিমুককে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বায়ু-পুরাণ অনুসারে এই বংশের রাজত্বকাল ৩০০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং কান্ববংশের পরে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং তৃতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হইয়াছিল—এই মতবাদই অধিক নির্ভরযোগ্য। সমগ্র দাক্ষিণাত্য ব্যতীত মগধ ও মধ্য ভারতের কিয়দংশ সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণা নদীর তীরে ধান্যকুট ছিল সাতবাহনদের রাজধানী।

সিমুক, কৃষ্ণ ও সাতকর্ণী ঃ পুরাণ অনুসারে সিমুক কান্ববংশের বিলোপ সাধন করিয়া সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে সিমুক বৌদ্ধ ও জৈনদের জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের শেষের দিকে তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইয়া নিহত হন।

সিমুকের ভ্রাতা কৃষ্ণ ছিলেন এই বংশের পরবর্তী রাজা। এই বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন সাতকর্ণী। পুরাণ অনুসারে সাতকর্ণী ছিলেন কৃষ্ণের পুত্র। সাতকর্ণীর মহিষী নায়নিকার অনুশাসন লিপি হইতে সাতকর্ণীর রাজত্বের মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়। সাতকর্ণী পশ্চিম মালয়, নর্মদা উপত্যকা ও বিদর্ভ জয় করিয়া সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি পশ্চিম মালব জয় করিয়া দুইটি অশ্বমেধ ও একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হাতীগুম্ফ শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে সাতকর্ণী কলিঙ্গরাজ খারবেল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল বর্তমান পৈথান।

সাতকর্ণীর রাজ্য বিস্তার

সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী নায়নিকা বেদশ্রী ও শক্তিশ্রী নামক নাবালক পুত্রদ্বয়ের অভিভাবিকারূপে কিছুদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এই সময় সাতবাহনগণকে শক, পহ্লব ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। এই সকল বৈদেশিক জাতিগুলির আক্রমণের ফলে সাতবাহন রাজ্যের আয়তন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপকূলে অবস্থিত এই রাজ্যের কিয়দংশ বিদেশী শত্রুদের হস্তগত হইয়া পড়ে। এই সকল বৈদেশিক জাতিগুলির ক্রমাগত আক্রমণ শুধু সাতবাহন রাজ্যেই নহে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

বৈদেশিক জাতির আক্রমণ

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীঃ বৈদেশিক জাতিগুলির আক্রমণের ফলে যখন সাতবাহন রাজ্য তথা সমগ্র দাক্ষিণাত্য খণ্ড, বিখণ্ড হইতেছিল সেই সময় সৌভাগ্যবশতঃ সাতবাহন বংশে গৌতমীপুত্র-সাতকর্ণী নামক পরাক্রান্ত নরপতির আবির্ভাব হয়। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ১০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি যে শুধু সাতবাহন বংশের বিলুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এমন নহে—বহু রাজ্য জয় করিয়া তিনি সাতবাহন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি মালব ও কাথিয়াবাড়ের শক-শাসকগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের লুপ্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। ইহার পর তিনি গুজরাট ও রাজপুতানার বহু অঞ্চল স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার মাতা গৌতমী-বলশ্রীর এক শিলালিপিতে তাঁহার রাজ্য জয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং শক, যবন (গ্রীক) ও পহ্লবগণের উচ্ছেদকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত শিলালিপিতে তাঁহাকে উত্তর কংকন, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী (পশ্চিম মালব) প্রভৃতি দেশের অধিশ্বর বলা হইয়াছে। সিংহাসনারোহণের অষ্টাদশ বৎসরে তিনি শক-রাজ নহপাণকে (ক্ষহরত বংশ) পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। অন্ধ্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রাজ্য বিস্তার

গৌতমী বলশ্রীর শিলালিপি

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ১০৬ হইতে ১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী যে শুধু সুদক্ষ যোদ্ধাই ছিলেন তাহা নহে, সমাজ সংস্কারক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি সকল বর্ণের স্বার্থ রক্ষা করিতে, যত্নবান ছিলেন কিন্তু বর্ণ সংমিশ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। নাসিক প্রশস্তির বিবরণ অনুযায়ী তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্পচূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজাকল্যাণকারী শাসক।

সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপন

অনেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ও কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কখনই 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন নাই এবং তিনি বিক্রম-শকাব্দও প্রবর্তন করেন নাই। তিনি 'বর-বরণ-বিক্রমচারু-বিক্রম' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি সূচিত হয় না।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ও বিক্রমাদিত্য কি অভিন্ন

বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী : গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩১-১৫৪ খৃঃ)। সাতবাহন রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অন্ধ্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্য প্রদেশের কতকাংশ ও করমণ্ডল উপকূল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। এই সময় মালব ও কাথিয়াবাড়ের শক-রাজ্য দুইটি রুদ্রদামনের অধিকারভুক্ত ছিল। রুদ্রদামন ও বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর মধ্যে দীর্ঘ-সংগ্রাম চলিতে থাকে। অনেকের মতে সাতবাহন-রাজ রুদ্রদামনের নিকট দুইবার পরাজিত হইয়াছিলেন। এই দুই রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী : যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী সাতবাহন বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ১৫০ হইতে ১৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পশ্চিমী শক-ক্ষত্রপগণের রাজ্যের দক্ষিণাংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা হইতে মনে হয় যে তাঁহার আমলে সাতবাহনগণের নৌ-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রদেশ উভয়ই তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন : যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর মৃত্যুর অনতিকাল মধ্যেই সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। এই বংশের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে সাতবাহন সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইয়া যায়। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর চার কিংবা পাঁচজন উত্তরাধিকারী তৃতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সামন্তরাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়া পড়ে। আভিরগণ মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে এবং ইক্ষাকুগণ অন্ধ্রদেশ দখল করিয়া লয়। অবশেষে পহ্লব ও ভকটকগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে সাতবাহণ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা (Administration of the Satavahanas) :

অনুশাসনলিপি, মুদ্রা ও সমসাময়িক সাহিত্য হইতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল সহজ ও সরল। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। রাজতন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। সাতবাহন রাজগণ 'রাজা' উপাধি ধারণ করিতেন। 'দৈবস্বত্বে' (Divine Right of Kings) তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন না। আইনতঃ রাজার ক্ষমতা সীমাহীন হইলেও তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। রাজা রাজধানী নগরীতে (প্রতিস্থান, নাসিক ও বিজয়ান্তি) অবস্থান করিয়া রাজ্য-শাসন করিতেন। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ সমর-অধিনায়ক এবং স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা

করিতেন। রাজার জেষ্ঠ্যপুত্রকে 'যুবরাজ' বলা হইত এবং তাঁহাকে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করা হইত না। রাজপরিবারের অপরাপর 'কুমার'-গণকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত। রাজা নাবালক হইলে তাঁহার পিতৃব্য বা তাঁহার মাতা রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

প্রাদেশিক শাসন

সামন্ত-শাসিত অঞ্চলগুলি ছাড়া সাতবাহন সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এগুলিকে 'জনপদ' বলা হইত। কতকগুলি 'অহর বা জেলা লইয়া এক একটি জনপদ গঠিত ছিল। প্রতিটি 'অহর' কতকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত ছিল। উচ্চ রাজকর্মচারী বা কুমারগণ কর্তৃক প্রদেশগুলি শাসিত হইত। ইহাদের মধ্যে অমাত্য, মহারথি, মহাভোজ (শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কর্মচারীগণ সামরিক বিভাগের ভার প্রাপ্ত ছিলেন) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'গ্রামিক' নামক কর্মচারীর হস্তে গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত থাকিত। প্রাদেশিক কর্মচারীগণ অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ইহাদের সহিত রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে 'মহামাত্র' ও 'ভাণ্ডগরিকা' নামে পরিচিত কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আয়

অমাত্য ও সামরিক কর্মচারীগণ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইহাদের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ-সংঘাতের ফলেই পরিশেষে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। রাজস্ব-প্রথা মোটেই কঠোর ছিল না। ভূমিকর ও লবণের একচেটিয়া ব্যবসাই ছিল রাজার প্রধান আয়।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা—(Society and Religion):

সমাজ চারিটি শ্রেণী

সমাজ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 'মহারথি', 'মহাভোজ' ও 'মহা-সেনাপতি'গণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা ছিলেন সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধার একমাত্র অধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন অমাত্য, মহামাত্র, ভাণ্ডগরিকা, স্বার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠী। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন লেখক, বৈদ্য, সুবর্ণকার ও কৃষক। চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন সূত্রধর, মালাকার, লৌহকার ও মৎস্যজীবী।

'নির্গম' বা 'শ্রেণী'।

চাষী ও বণিকগণ কতকগুলি 'গৃহ' ও 'কুলে' বিভক্ত ছিল। ইহাদের প্রত্যেকটি প্রধানকে যথাক্রমে 'গৃহপতি, ও 'কুলপতি' বা 'কুটুম্বি' বলা হইত। 'গৃহপতি' ও 'কুলপতি'-গণ যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'নির্গম' বা শ্রেণী' সাতবাহন সমাজের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 'নির্গম' বা 'শ্রেণীগুলির' আধিক্য দেখিয়া মনে হয় সাত-বাহন সাম্রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রচলন ছিল। 'নির্গম'গুলি শুধু

যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত তাহা নহে ইহারা আধুনিককালের ব্যাঙ্কেরও কার্য করিত।

সাতবাহন-সাম্রাজ্যে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ই প্রচলিত ছিল। সাতবাহন রাজাগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ ও তাঁহারা বহু যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। নায়নিকার 'নানাঘাট' অনুশাসন লিপিতে বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর দক্ষিণা দানের প্রথাও প্রচলিত ছিল। অনেক সময় দক্ষিণা হিসাবে গ্রাম দান করা হইত। সাতবাহন রাজগণ বাসুদেব, ইন্দ্র, সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করিতেন। 'শিবপালিত', শিবদত্ত প্রভৃতির উল্লেখ হইত মনে হয় শিব ও 'স্কন্দ' পূজাও প্রচলিত ছিল। কুষাণ আমলেও স্কন্দ ও বিশাখ জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন।

ধর্ম

যাগ-যজ্ঞাদির অধিক প্রচলন

সাতবাহন রাজগণের ধর্মসহিষ্ণুতার ফলে সাতবাহন সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মেরও বহুল প্রচার ছিল। তাঁহারা হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারেও সাহায্য করিয়াছিলেন। নাসিক, ভাজ, বেদশা, কোন্দন প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধগুহাগুলি বৌদ্ধধর্ম প্রসারের নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন এই যুগে বহু বৌদ্ধ স্তম্ভও নির্মিত হইয়াছিল। সাতবাহন রাজগণ ছাড়াও অভিজাতগণ এবং বণিকগণও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সাতবাহন আমলে যবন, শক ও পহ্লব প্রভৃতি বৈদেশিকগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সাতবাহন আমলে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বজায় ছিল ইহা অনুমান করা যায়।

হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সম প্রচলন

ধর্ম সহিষ্ণুতা

সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব (Importance of Satavahana Rule)ঃ তিনশত বৎসর ব্যাপী সাতবাহন বংশের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

(১) **দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঃ** এই বংশের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল।

(২) **ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ঃ** শক, পহ্লব, যবন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আক্রমণ হইতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সাতবাহন রাজগণই রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৩) **দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতার প্রসার ঃ** দাক্ষিণ ভারতে নূতন আর্য-সভ্যতার প্রসার সাতবাহন যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মধ্যভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিয়া সাতবাহনগণ উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতা ও দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যে এক বিস্ময়কর সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন। মৌর্যযুগে আর্যাবর্তের প্রাধান্য দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল এবং

ইহার ফলে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতিও তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। পরবর্তীকালে সাতবাহনগণ দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনঃস্থাপনে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সমন্বয়ে এক নূতন আর্যসভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। চতুর্থ শতকে পহ্লব, চের ও পাণ্ড্যরাজ্যে আর্য সংস্কৃতির যে প্রভাব দেখা যায় উহার মূলে ছিল সাতবাহনগণের অবদান। পানিকর যথার্থই বলিয়াছেন যে "তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়া সাতবাহনগণ ভারতে সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।"

(৪) **সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সাতবাহনগণের অবদান ঃ** সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সাতবাহনগণের অবদান কম নহে। সাতবাহন-গনের রাজধানী প্রতিস্থান সেই যুগের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। টলেমি রচিত গ্রন্থে ও গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থে সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রতিস্থান নগরীর অবদান সম্পর্কে বহু বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও সাতবাহনগণের অবদান কম নহে। অমরাবতী, গোলি ও নাগার্জুন কোণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে সকল স্তূপ ও চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল তাহা দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার চরম নিদর্শন।

(৫) **উদার ধর্মনীতি ঃ** সাতবাহনগণের ধর্মনীতি ছিল উদার। তাঁহাদর আমলে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমভাবেই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী সাতবাহন রাজগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বৌদ্ধদের জন্য বহু স্তূপ ও বিহার নির্মাণ ও প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন। নাসিক ও ভিল্না শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। সাতবাহনগণের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম কখনই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিত না।

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণ
(Foreign Invasions in the Post-Maurya Period)
গ্রীক—শক—পহ্লব—কুষাণ

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ভারতের অভ্যন্তরে যেরূপ নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল সেইরূপ একাধিক বৈদেশিক জাতিগুলিও ভারত আক্রমণ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ব্যাক্ট্রীয়-গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণগণ ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ভারতে গ্রীক রাজ্য স্থাপন (Bactarian Greeks): আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর সিরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া সেলিউকস যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্য-ভাগে ভাঙ্গিয়া পড়িল। একে একে পার্থিয়া, (খোরাসান ও কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল), ব্যাক্ট্রীয়া (বা বহ্লীক—হিন্দুকুশ ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) প্রভৃতি প্রদেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ব্যাক্ট্রীয়া এশিয়ায় গ্রীকসভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যাক্ট্রীয় ও পার্থিয়ান বা পহ্লবগণের নেতা ছিলেন যথাক্রমে প্রথম ডিওডোটাস (Diodotus I) ও অর্সকেস (Arsakes)।

সিরিয়া সাম্রাজ্যের পতন

খৃষ্ট পূর্ব ২৫০ অব্দে ব্যাক্টীয়-র শাসনকর্তা প্রথম ডিওডোটাস সিরিয়া সাম্রাজ্যের অধিপতি আন্টিয়োকসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। প্রথম ডিওডোটাসের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ডিওডোটাস ব্যাক্ট্রীয়ার রাজা হইলেন। ব্যাক্ট্রীয়ার তৃতীয় রাজা ইউথিডিমস সিরিয়ার অধিপতি তৃতীয় আন্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। অবশেষে স্বীয় রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য আন্টিয়োকস ইউথিডিমসের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির শর্তস্বরূপ আন্টিয়োকাস ব্যাক্ট্রীয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং নিজ কন্যার সহিত ইউথিডিমসের পুত্র ডিমেট্রিয়াসের বিবাহ দিলেন। ব্যাক্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আন্টিয়োকস খৃঃ পূঃ ২০৬ অব্দে ভারত অভিযানে বাহির হইলেন এবং কাবুল-উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে সুভগসেন নামক জনৈক ভারতীয় রাজার সহিত আন্টিয়োকস যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সিরিয়ার উপর রোম সাম্রাজ্যের আক্রমণের সম্ভাবনায় তৃতীয় আন্টিয়োকস সুভগসেনের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তৃতীয় আন্টিয়োকস বা ইউথিডিমস ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কতদূর রাজ্য বিস্তার করিয়া ছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না।

সিরিয়া-ব্যাক্ট্রীয়া সংঘর্ষ

সিরিয়া রাজ তৃতীয় আন্টিয়োকসের ভারত অভিযান

ইউথিডিমসের পুত্র ডিমেট্রিয়াস ভারত ও ব্যাক্ট্রীয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের পর ডিমেট্রিয়াসই ভারতের অভ্যন্তরে গ্রীক অভিযান চালাইয়াছিলেন। তাঁহার ভারত অভিযান অনুসরণ করিয়াই পরিবর্তী গ্রীক অভিযানগুলি পরিচালিত হইয়াছিল। ডিমেট্রিয়াসের ভারত-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের সম্বন্ধ নিগূঢ় হইয়া উঠিল।

ডিমেট্রিয়াসের ভারত অভিযান

ডিমেট্রিয়াসের সিংহাসনারোহণের সময় ব্যাক্ট্রীয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও গ্রীক-অভিযানের অনুকূল ছিল। খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ডিমেট্রিয়াস হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতের এক বিরাট অংশ দখল করিলেন। অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর কর্তৃত্ব রাখিবার উদ্দেশ্যে ডিমেট্রিয়াস কতকগুলি শহর ও সেনানিবাসের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শহর ও সেনানিবাসগুলি পরবর্তী গ্রীক অভিযানে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

ডিমেট্রিয়াস কর্তৃক পাঞ্জাব দখল

ভারতে ডিমেট্রিয়াস কতদূর রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ষ্ট্রাবো-র মতে ব্যাক্ট্রীয় গ্রীকগণের মধ্যে ডিমেট্রিয়াস ও মিনান্দারই অধিক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ডিমেট্রিয়াস ও মিনান্দার সিন্ধুদেশে সৌরাষ্ট্র, কুচ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। যুগ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে যবনগণ (গ্রীক) অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, মথুরা ও পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' ও কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকেও যবন-আক্রমণের উল্লেখ আছে। যাহা হউক, ডিমেট্রিয়াসের নেতৃত্বে গ্রীকগণ যে ভারতের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে গ্রীকগণের ভারত অভিযানের নেতা ছিলেন ডিমেট্রিয়াস এবং তিনি পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্রের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

ডিমেট্রিয়াস যখন ভারত-অভিযানে ব্যস্ত সেই সময় ইউক্রেটাইডিস (Eucratides) নামক জনৈক গ্রীক সেনাপতি ব্যাক্ট্রীয়া দখল করিয়া লইলেন। ডিমেট্রিয়াস ব্যাক্ট্রীয়া পুনরাধিকারে অসমর্থ হইয়া অতঃপর সিন্ধু-উপত্যকায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল আধুনিক শিয়ালকোট। গ্রীকরাজগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দ্বিভাষিক (গ্রীক ও ভারতীয়) মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। ডিমেট্রিয়াসের মৃত্যুর পর ব্যাক্ট্রীয়া-রাজ্য ইউক্রেটাইডিস ও ডিমেট্রিয়াসের পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। গ্রীকরাজগণের মধ্যে মিনান্দারই ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নরপতি। ইউথিডিমসের পরিবারের সহিত মিনান্দারের কি সম্পর্ক তাহা সঠিক জানা যায় না। মিলিন্দ পঞ্‌হো নামক পালিগ্রন্থে মিনান্দারকে রাজ-পরিবারভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইউথিডিমসের পরিবারের সহিত মিনান্দারের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

ইউক্রেটাইডিস কর্তৃক ব্যাক্ট্রীয়ার সিংহাসন দখল

মিনান্দার

মিনান্দারের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে র‍্যাপসনের মন্তব্য

ঐতিহাসিক র‍্যাপসনের মতে মিনান্দার ডিমেট্রিয়াসের কন্যা আগাথক্লিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম ষ্ট্রাটো (Strato I) ছিলেন মিনান্দারের পুত্র।

ষ্ট্রাবোর মতে আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও মিনান্দার অধিক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রার বিভিন্নতা ও বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সেগুলির আবিষ্কার হইতে মনে হয় যে মিনান্দার বহু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। প্লুটার্ক মিনান্দারকে বহু নগরীর অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব হইতে কাথিয়াবাড় পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং শকল (বর্তমান শিয়ালকোট) ছিল তাহার রাজধানী। সম্ভবতঃ তিনি ইউক্রেটাইডিসের পরিবারের নিকট হইতে হস্তচ্যুত ব্যাক্ট্রীয়া রাজ্যের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পৌত্র বসুমিত্র কর্তৃক মিনান্দার পরাজিত হইয়াছিলেন।

মিনান্দারের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

'মিলিন্দ-পঞ্হো'* নামক পালিগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কর্তৃক বৌদ্ধগণ নির্যাতিত হইলে বহু বৌদ্ধ মিনান্দারের রাজধানীতে আশ্রয় লইয়াছিল। 'দিব্যবদনে' বৌদ্ধগণের প্রতি মিনান্দারের সদয় ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সুতরাং মিনান্দার যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মিনান্দার কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

মিনান্দারের রাজত্বকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। সাধারণতঃ খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মিনান্দার রাজত্ব করিয়াছিলেন। বলিয়া অনেকে মনে করেন। ডক্টর ডি, সি, সরকার এর মতে তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব ১১৫-৯০ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক র‍্যাপসনের মতে মিনান্দার বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক। র‍্যাপসনের কথায় "বিজেতা অপেক্ষা দার্শনিক হিসাবেই মিনান্দার কুরুদের রাজা জন্মেঞ্জয় ও বিদেহর রাজা জনকের ন্যায় অবিস্মৃত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন"। মিলিন্দ-পঞ্হো অনুসারে "কূটনীতিজ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়া মিনান্দার ছিলেন অদ্বিতীয়"।

মিনান্দারের গুণাবলী

গ্রীক শাসনের অবসান: উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাক্ট্রীয় গ্রীকগণ প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে ঐক্যের একান্ত অভাব ছিল। ইউথিডিমস ও ইউক্রেটাইডিস-এর বংশধরগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে গ্রীকশক্তি বহুল

ঐক্যের অভাব

* **মিলিন্দ-পঞ্হো:**—এই গ্রন্থে মিনান্দার ও বৌদ্ধধর্মাচার্য নাগসেনের কথোপকথন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মিনান্দারের জিজ্ঞাসাবাদ সন্নিবিষ্ট আছে।

পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাক্ট্রীয়ার সিংহাসন সুরক্ষিত করিয়া ইউক্রেটাইডিস কাবুল উপত্যকা, গান্ধার ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ দখল করেন। তিনি সম্ভবতঃ নিজপুত্র হেলিওকল্‌স্ (Heleocles) কর্তৃক নিহত হন (খৃঃ পূঃ ১৫৫)। হেলিওকল্‌স্-এর মৃত্যুর পর শকগণ ব্যাক্ট্রীয়া অধিকার করিয়া লয়। ইউক্রেটাইডিসের বংশধরগণ অতঃপর আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন হারমিওস। কাবুল উপত্যকায় তাঁহার রাজ্য সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং রাজ্যের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক যথাক্রমে শক, পহ্লব ও ইয়ো-চি নামক জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকে। বহু চেষ্টা করিয়াও হারমিওস বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশেষে পহ্লবগণের নিকট পরাজিত হইয়া হারমিওস নিহত হন। এইভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুইশত বৎসর রাজত্ব করার পর গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে।

ইউথিডিমস ও ইউক্রেটাইডিস পরিবারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা

শকগণ কর্তৃক ব্যাক্ট্রীয়া অধিকার

পহ্লবগণ কর্তৃক গ্রীক শাসনের অবসান

গ্রীক শাসনের গুরুত্ব (Importance of Greek Rule) : অনেকের মতে ভারতে ব্যাক্ট্রীয় গ্রীক শাসন আলেকজাণ্ডারের শাসন অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ও গ্রীকগণের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উভয় জাতি পরস্পরের সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ভারতীয় আদর্শ ও ভারতীয় ধর্ম বহু গ্রীক শাসকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। অন্ততঃ দীর্ঘকাল ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে বসবাস করার ফলে ভারতীয়দের বহু আচার অনুষ্ঠান গ্রীক সমাজেও প্রবেশ করিয়াছিল এবং কালক্রমে গ্রীকগণ একরূপ ভারতীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে ভারতীয়গণও গ্রীক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রা ও শিল্পকলায় গ্রীক-প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই যুগেই ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পকলার সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হয়।

ভারতে শক রাজ্য স্থাপন (The Sakas) :

তথ্যাদি (Sources) : যে সকল বৈদেশিক আক্রমণকারীগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকশাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল উহারা ছিল শক, পহ্লব বা পার্থিয়ান ও ইয়ো-চি বা কুষাণ।

রামায়ণ, মহাভারত, চৈনিক গ্রন্থাদি ও 'মহাভাষ্যে' শকদের ভারত আক্রমণের কথা উল্লিখিত আছে। শকদের মধ্য-ভারতে বসতি স্থাপনের

কথা মারকাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত আছে। গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণী ও সমুদ্রগুপ্তের 'প্রশস্তি'তেও ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শক জাতির আদি বাসস্থান ঃ শক বা সিথিয়ান (Scythian) জাতির আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার সির-দরিয়া নদীর উত্তরাঞ্চলে। পারস্য সম্রাট প্রথম দারায়ুসের অনুশাসন লিপিতে শকদের তিনটি শাখার কথা উল্লিখিত আছে। পাসিপলিস-অনুশাসন লিপিতে শক ও মক এই দুইটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই দুইটি শাখা সিস্তান অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করিত। ঐতিহাসিক র‍্যাপসনের মতে শকদের তৃতীয় শাখাটি ইওরোপে কৃষ্ণ-সাগরের উত্তরাঞ্চলে বাস করিত।

খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মধ্য-এশিয়ার ইয়ো-চি নামে অপর এক জাতির আক্রমণের ফলে শকগণ উহাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শকগণ ব্যাক্ট্রিয়া দখল করে। ইহাদের অনেকেই হিলমন্দ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে বহু শক মধ্য এশিয়া হইতে বহির্গত হইয়া এবং হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্তে বসতি স্থাপন করে। অতঃপর ইহারা পার্থিয়ান বা পহ্লবগণের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইহারা পহ্লব রাজ্যের কতকাংশ দখল করিয়া লয়। কিন্তু মিথ্রিডেটিস (খৃঃ পূঃ ১২৩-৮৮) নামক জনৈক রাজা পহ্লব রাষ্ট্রের শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধার করিলে শকগণ পহ্লব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আফগানিস্থানের দক্ষিণাঞ্চলে নূতন করিয়া বসতি স্থাপন করে। উহাদের নামানুসারে এই অঞ্চল শকস্থান বা সিস্তান নামে পরিচিত হয়। অনেকের মতে মধ্য এশিয়া ও ভারত-সীমান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গ্রীক রাজ্যগুলির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শকগণ প্রথম দিকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কালক্রমে শকগণ সিন্ধু উপত্যকা এবং পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করিয়া একাধিক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যাক্ট্রিয়া দখল

আফগানিস্থানে বসতি স্থাপন

সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে সম্ভবতঃ আদি শকদের সহিত পহ্লব ও ইরাণীদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ভারত আগমন করিয়া উহারা ভারতীয় পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল এবং ভারতীয় নাম ও ধর্মও গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয়দের সহিত শকদের বৈবাহিক সম্পর্কের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' শকগণকে 'বিশুদ্ধ-শূদ্র' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'মনু-সংহিতায়' শকগণকে নিম্ন-ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

ভারতীয় শকদের পরিচয়

শকরাজগণ 'ক্ষত্রপ' (Satrap) নামে পরিচিত ছিলেন। শকরাজগণকে প্রধানতঃ দুইটি শাখায় বিভক্ত করা যায়—উত্তর-ক্ষত্রপ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ক্ষত্রপ।

দুইটি শাখায় বিভক্ত

উত্তর ভারতের শকগণ: ভারতীয় শিলালিপিতে শকরাজগণের মধ্যে ময়েস বা মোগ-এর (Mahes or Moga) নামোল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তিনি খৃঃ পূঃ ২০ হইতে ২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শক-অধিকার স্থাপন করেন। তক্ষশীলার অনুশাসনলিপি ও মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি গান্ধারের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্য কাবুল উপত্যকা ও পূর্ব-পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

ময়েস বা মোগ

মোগ-এর পর রাজা হইলেন প্রথম আজেস (Azes I)। অনেকের মতে আজেস ছিলেন মোগ-এর জামাতা। তিনি সম্ভবতঃ পূর্ব-পাঞ্জাব দখল করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক-মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক-শাসনব্যবস্থায় পারসিক ও গ্রীক শাসনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম আজেস

প্রথম আজেসের পর দ্বিতীয় আজেস (Azes II) শক-সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই ভারত সীমান্তে শক-অধিকৃত অঞ্চলগুলি পহ্লব-রাজ গণ্ডোফারনিসের অধিকারে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয় আজেস

মথুরায় আর একটি শক্তিশালী শক-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার ক্ষত্রপ রাজুবুল পূর্ব-পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহাকে 'মহাক্ষত্রপ' ও 'অপ্রতিহত-চক্র-ক্ষত্রপ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে তিনি প্রথমে ক্ষত্রপ এবং পরে মহাক্ষত্রপরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মথুরার শক রাজ্য

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকগণ: শকজাতির অপর এক শাখা 'ক্ষহরত' (Ksharatas) নামে পরিচিত ছিল। নাসিককে রাজধানী করিয়া এই ক্ষহরতগণ মালব, কাথিয়াবাড় ও মহারাষ্ট্রের এক অংশে রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি ও মুদ্রাতে ভূমক (Bhumaka) ও নহপান (Nahapana) নামে দুইজন শক-ক্ষত্রপের নাম পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতের শকরাজগণের মধ্যে ভূমক-এর নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তিনি শকগণের ক্ষহরত-বংশ-সম্ভূত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নহপানের পূর্বেই রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ক্ষহরত শাখা ও নহপান

ক্ষহরত-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ ছিলেন নহপান। নাসিকে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি সাতবাহনদের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের এক বিরাট

অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র নহপানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা উষভদত্তের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে নহপানের রাজ্য পুণা ও নাসিক হইতে আজমীড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উষভদত্ত নহপানের রাজ্যের শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নহপানের প্রধান সেনাপতি। ব্রাহ্মণদের প্রতি নহপানের দানশীলতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে তিনি ১১৯ হইতে ১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। নহপানের রাজনৈতিক প্রাধান্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানকে পরাজিত করিয়া ক্ষহরত-শক্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন।

শকক্ষত্রপগণের আর একটি শাখা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। র‍্যাপসন এই বংশকে 'কর্দমক' (Kardamaka) নামে আখ্যা দিয়াছেন। চষ্টন ছিলেন এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অনেকের মতে চষ্টন ১৩০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ প্রথমে কুষাণদের অধীনে শাসনকর্তা ছিলেন। টলেমি রচিত ভূগোলে চষ্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার অনুশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে তিনি ও তাঁহার পৌত্র রুদ্রদামন যুগ্মভাবে রাজত্ব করিতেন। চষ্টন সম্ভবতঃ সাতবাহনদের নিকট হইতে নহপানের রাজ্যের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর শক-ক্ষত্রপগণ

রুদ্রদামন (১৩০—১৫০ খৃষ্টাব্দ)ঃ কর্দমক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদামন। রুদ্রদামনের পিতার নাম ছিল জয়দমন। সম্ভবতঃ জয়দমন ১৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। জুনাগড় শিলালিপি হইতে রুদ্রদামনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চষ্টনের রাজত্বকলে সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর একাধিক আক্রমণের ফলে কর্দমক বংশের যে শক্তি ম্লান হইয়াছিল, রুদ্রদামন তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সাতবাহনরাজ পুলমায়ীকে পরাজিত করিয়া মালব, সৌরাষ্ট্র ও কংকন দখল করিয়াছিলেন। জুনাগড় শিলালিপি অনুসারে মালব, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মাড়বার, উত্তর-কংকন ও সিন্ধু-উপত্যকা রুদ্রদামনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার

রুদ্রদামন শুধু যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি সুশাসক, বিদ্বান এবং গুণগ্রাহীও ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, সংগীত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। প্রজাহিতৈষী রাজা হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলের সুদর্শন-হ্রদের সংস্কার সাধন

রুদ্রদামনের চরিত্র

করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি প্রজাবর্গের নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করেন নাই। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া তিনি অকারণে প্রাণনাশ পছন্দ করিতেন না। তিনি একটি মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে রাজ্য-শাসন করিতেন।

শক শাসনের অবসান ঃ রুদ্রদামনের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, যদিও শিলালিপি ও মুদ্রায় অনেকের নাম পাওয়া যায়। দমজাদশরি ছিলেন রুদ্রদামনের উত্তরাধিকারী। দমজাদশরীর এক পুত্রের নাম ছিল জীবতমান। কিন্তু দমজাদশরীর পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রথম রুদ্রসিংহ। র‍্যাপসন-এর মতে রুদ্রসিংহ ও জীবতমান এক অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে রুদ্রসিংহ জয়লাভ করেন। ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে রুদ্রসিংহের উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রথম রুদ্রসেন। জীবতমান কর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রায় মহাক্ষত্রপ-জীবতমানের নাম পাওয়া যায়। রুদ্রদামনের পর প্রথম রুদ্রসিংহের পুত্র প্রথম রুদ্রসেন ছিলেন উজ্জয়িনীর তৃতীয় শক-ক্ষত্রপ। উজ্জয়িনীর শেষ শক-ক্ষত্রপ ছিলেন তৃতীয় রুদ্রসিংহ। তিনি দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক নিহত হন। ৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় রুদ্রসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং আভীর ও সাতবাহনদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রভৃতি কারণে শক সাম্রাজ্য দুর্বল ও সংকুচিত হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কংকন, সিন্ধু, রাজপুতানা ও মালব শকদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। পরবর্তী শতাব্দীর প্রারম্ভেই চষ্টন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রপ বংশের অবসান ঘটে। ২৯৫ হইতে ৩৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন মহাক্ষত্রপের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শুধু 'ক্ষত্রপ' উপাধিধারী শকরাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। শক-শক্তির পতনের অপর সম্ভাব্য কারণ হইল উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাসনীয় বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রুদ্রদামনের এক উত্তরাধিকারী তৃতীয় রুদ্রসেন পশ্চিম ভারতে শক-আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শকদের আধিপত্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম-ভারতে শক-শাসনের উচ্ছেদ সাধন করেন।

পার্থিয়ান বা পহ্লব শাসন (The Pahlavas)

পহ্লবদের স্বাধীনতা ঘোষণা

আনুমানিক ২৪৮ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ব্যাক্ট্রীয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পহ্লবগণ সিরিয়ার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন আর্সকেশ। কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছিল

পহ্লব বা পার্থিয়ান জাতির বাসভূমি। ২৪৮ হইতে ২২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত আর্সকেশ স্থাপিত রাজবংশ পারস্যে রাজত্ব করে।

মিথ্রিডেটিস (২৭১—১৩১ খৃঃ পূঃ)-এর অধীনে পহ্লবগণ শক্তিশালী হইয়া ইউক্রেটাইডিসের নিকট হইতে ব্যাক্ট্রিয়ার দখল করিয়া লন। রোমান ঐতিহাসিক আবাসিয়াসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মিথ্রিডেটিস ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে গান্ধারের এক অংশ শক অধিকার হইতে পহ্লবদের অধিকারে চলিয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে নিম্ন সিন্ধুর আধিপত্য লইয়া পহ্লব নেতৃবর্গের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সময় পহ্লব রাজগণের অনেকেই পেশোয়ারে রাজত্ব করিতে থাকেন।

মিথ্রিডেটিস ও পহ্লব রাজ্যের বিস্তার

ভারতীয় পহ্লব রাজগণের মধ্যে গণ্ডোফার্ণিস ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। কাবুল, কান্দাহার ও তক্ষশীলা তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। কাবুল উপত্যকায় তিনি গ্রীকরাজ হারমেত্তসকে পরাজিত করিয়া উক্ত অঞ্চলে গ্রীক শাসনের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার রাজত্বকালে সেণ্ট-টমাস নামক জনৈক খৃষ্ট ধর্মযাজক তাঁহার রাজসভায় আগমণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

গণ্ডোফার্ণিস

গণ্ডোফার্ণিসের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে জানা যায় যে আফগানিস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশের পহ্লব রাজ্যগুলি অবশেষে কুষাণগণ কর্তৃক বিজিত হয়।

পহ্লব শাসনের অবসান

কুষাণ-সাম্রাজ্য (The Kushan Empire)

কুষাণ যুগের গুরুত্বঃ রোলিনসন (Rawlinson)-এর মতে "ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুষাণ-যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগেই সদ্য-উদ্গিত খৃষ্টধর্ম পূর্ণ-বিকশিত বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসিয়াছিল এবং উভয় ধর্ম পরিব্যাপ্ত পৌত্তলিকতার দ্বারা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।" এই যুগেই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং বাণিজ্য-পথ ধরিয়া মধ্য-এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই যুগেই শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নব-যুগের সূচনা হইয়াছিল। এই যুগেই গ্রীকপ্রভাবে ভারতীয় শিল্পনীতি এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের

পতনের পর এই যুগেই সমগ্র উত্তর ভারত ও মধ্য-এশিয়ার কতক অঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগেই মহাযান বৌদ্ধধর্মমতের উদ্ভব এবং মনুষ্য প্রতিকৃতিতে বুদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর পূজার প্রচলন শুরু হইয়াছিল।

তথ্যাদি (Sources) : কুষাণ রাজত্বকাল সম্পর্কে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল চৈনিক গ্রন্থাদি। চৈনিক গ্রন্থাদি হইতে ইয়ো-চি-জাতির চীন দেশ হইতে ভারতে আগমণের বিবরণ পাওয়া যায়। কুষাণ আমলের মুদ্রা কুষাণ-রাজগণের কালনিরূপন (Chronology) ও তাঁহাদের ধর্ম সম্পর্কে জানিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় কদফিসেস-এর মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। কনিষ্কের মুদ্রায় বহু দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ধর্ম সম্পর্কে কনিষ্ক ছিলেন উদার। গান্ধার শিল্পের কতকগুলি নিদর্শন হইতে কুষাণ আমলের শিল্পোন্নতির ও জনসাধারণের শিল্পরুচির আভাস পাওয়া যায়। কুষাণ আমলের অনুশাসনলিপির বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন পান-কু রচিত 'প্রথম-হান-বংশের ইতিহাস', নাগার্জ্জুন রচিত 'মধ্যমিকা সূত্র', অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্ধচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও কুষাণ-আমলের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

ভারতের দিকে ইয়ো-চি-জাতির অগ্রসর : শক-পহ্লবগণের পরে কুষাণগণ ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় কুষাণগণ ইয়ো-চি নামক মধ্য-এশিয়ার একটি যাযাবর জাতির শাখা।

কুষাণ জাতির পরিচয় ও আদিম বাসভূমি

ইয়ো-চি গণের আদিম বাসভূমি ছিল চীন দেশের কান-স্থ প্রদেশে। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইয়ো-চি-গণ হিউং-নু (হুণ) নামক মধ্য-এশিয়ার অপর এক যাযাবর জাতির দ্বারা আক্রান্ত হন। ইয়ো-চি-গণের নেতা পরাজিত হইয়া নিহত হন। কথিত আছে যে হিউং-নু-গণের নেতা ইয়ো-চি নেতার মাথার খুলি দিয়া সুরা-পাত্র নির্মান করিয়াছিলেন। ইয়ো-চি-গণ পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে উ-সুং (Wu-Sung) নামক এক বর্বর জাতি কর্তৃক উহারা আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু উ-সুং-গণ পরাজিত হইল। ইয়ো-চি-গণ পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা সুরু করিলেন। ইহার পর ইয়ো-চি-গণকে শকদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইল। শকগণ পরাজিত হইয়া নূতন গৃহের সন্ধানে ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উহাদের বাসভূমি সিরদরিয়া অঞ্চল ইয়ো-চি-গণের হস্তগত হইল। ইহার পর প্রায় কুড়ি বৎসর ইয়ো-চি-গণ

হিউং-নু জাতি কর্তৃক বিতাড়িত

সিরদরিয়া অঞ্চলে শান্তিতে বসবাস করেন। কিন্তু ইহার পর উ-সুং-গণ কর্তৃক পুনরায় আক্রান্ত হইলে ইয়ো-চি-গণ সিরদরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করিয়া অক্ষু উপত্যকায় (Oxus Valley) আশ্রয় লইলেন। এইস্থানে বহুদিন বসবাস করিবার পর উহাদের জীবনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। প্রথমতঃ, উহারা যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্থিতিশীল জীবন-যাত্রা গ্রহণ করিলেন ও কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইয়ো-চি-গণের সংহতি বিনষ্ট হইল। উহারা পাঁচটি শাখায় * বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই সকল শাখার মধ্যে কুষাণ শাখা কালক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

ইয়োচিগণের সিরদরিয়া অঞ্চলে আগমণ : পুনরায় বিতাড়িত অক্ষু উপত্যকায় আগমণ : পাঁচটি শাখায় বিভক্ত

ভারতে কুষাণ রাজ্য স্থাপন : প্রথম কদফিসেস (Kadphises I) : অক্ষু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করিবায় প্রায় একশত বৎসর পরে (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে) কুষাণ-নায়ক কুজুল-কদ্‌ফিসেস অন্যান্য শাখাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া 'ওয়াং' অর্থাৎ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। এইভাবে ভারতে কুষাণ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচিত হইল। তিনি হিন্দুকুশের দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়া কিপিন ও কাবুল দখল করেন। তিনি ব্যাক্ট্রিয়াতেও স্বীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পারস্যের সীমান্ত হইতে সিন্ধু অথবা ঝিলাম নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণ রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় রোম-সম্রাট অগষ্টাসের মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৫ হইতে ৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কদফিসেস (Kadphises II) : প্রথম কদ্‌ফিসেসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস কুষাণ সিংহাসনে আরোহন করেন। স্মিথের মতে দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস ৭০ হইতে ১১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ৬৫ হইতে ৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকার এক বিরাট অংশ জয় করিয়া তিনি ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় প্রদেশগুলির শাসনভার মহাসেনাপতি উপাধিধারী প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করেন। প্রথম কদ্‌ফিসের ও দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেসের রাজ্যজয়ের ফলে চীন ও রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

* **কুষাণদের পাঁচটি শাখা** :—(১) হিউ-মি (Hieu-mi), (২) কুই-সাং (Kuei-shaung), (৩) হি-থুম (Hi-thum), (৪) চুং-মো (Chamg-mo) এবং (৫) কাও-ফু (Kao-fu).

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি রোম সম্রাট ট্রজানের রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি গ্রীক-মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রা হইতে তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং 'মহেশ্বর', 'রাজতিরাজা', 'সর্বলোকেশ্বর'—প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কণিষ্ক (Kanishka)

কণিষ্কের রাজ্যারোহণকাল সম্পর্কে মতভেদঃ কণিষ্কের রাজ্যারোহণকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে।

ফ্লীটের মতে

ফ্লীটের মতে কণিষ্ক কদ্‌ফিসেস রাজাদের পূর্বেই রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি খৃষ্ট পূর্ব ৫৭ শকাব্দের প্রবর্তক। কিন্তু এই মতের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্য প্রমাণ

শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে জানা যায় যে গান্ধার কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত গান্ধারে কুষাণ অধিকার স্থাপিত হয় নাই। উপরন্তু কণিষ্কের মুদ্রায় রোমাণ মুদ্রার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এই মুদ্রা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কদ্‌ফিসেস রাজগণ যে রোমের অনুকরণে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং কদ্‌ফিসেস রাজগণের পরেই কণিষ্ক সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ইহা সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে কণিষ্ক কদ্‌ফিসেস রাজগণের উত্তরাধিকারী ছিলেন যদিও তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

ভাণ্ডারকরের মত

ভাণ্ডারকরের মতে কণিষ্ক ২৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈনিক ও তিব্বতীয় সূত্রে ইহা সমর্থিত হয় নাই।

মার্শাল স্মিথের মত

মার্শাল, স্মিথ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে কণিষ্ক ১২৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতও সমর্থিত হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে কণিষ্ক তাঁহার রাজ্যারোহণ উপলক্ষ্যে একটি সম্বৎ প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

টমাস ও র‍্যাপসনের মত

সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে টমাস ও র‍্যাপসন প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতই অধিকতর সমর্থনযোগ্য। তাঁহাদের মতে কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একটি সম্বৎ প্রচলন করিয়াছিলেন। কণিষ্ক প্রবর্তিত সম্বৎকে শকাব্দ বলা হইয়া থাকে এবং পশ্চিম ভারতের শকরাজগণ বহুদিন পর্যন্ত এই সম্বৎটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

রাজ্যজয় ঃ কণিষ্কের রাজ্যারোহণের সময় আফগানিস্থান, সিন্ধুর এক বিরাট অংশ, পাঞ্জাব এবং পার্থিয়া ও ব্যাক্ট্রীয়ার কিয়দংশ কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কণিষ্ক বহু রাজ্য জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর জয় করিয়া উহা স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীরে বহু বৌদ্ধ এবং কণিষ্কপুর নামে একটি শহরের পত্তন করিয়াছিলেন। কল্হণ-রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' অনুসারে সেই সময় কাশ্মীরে হুষ্ক, যুষ্ক ও কণিষ্ক নামে তিনজন রাজা নিজেদের নামানুসারে তিনটি শহরের পত্তন করিয়াছিলেন। জ্ঞানী-রাজা জুষ্ক জুষ্কপুর বিহার ও 'জয়স্বামীপুর' শহরের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহু মঠ ও চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে কণিষ্ক মগধ আক্রমণ করিয়া পাটলিপুত্র দখল করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে পাটলিপুত্র অধিকারের সময় বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষ কণিষ্ক কর্তৃক ধৃত হইয়া কণিষ্কের রাজধানীতে আনীত হইয়াছিলেন। অশ্বঘোষ যে কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয় যে মগধের কিছু অংশ কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে গাজীপুর ও গোরখপুর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক পার্থিয়ার রাজাকেও পরাজিত করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছিলেন।

কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিস্তার

উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপগণের বিরুদ্ধেও কণিষ্ক যুদ্ধাভিযান চালাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শকক্ষত্রপ চষ্টন কণিষ্কের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং কণিষ্কের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে গান্ধার কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার।

ভারতের বাহিরে কণিষ্ক চীন সাম্রাজ্যের সহিতও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব তুর্কীস্থানের অন্তর্গত কাশগড়, খোটান ও ইয়ারকন্দ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন সম্রাট হো-তি-র রাজত্বকালে চীন সেনাপতি পান-চাও-এর নিকট কণিষ্ক পরাজিত হন। ইহার কিছুকাল পরে কণিষ্ক অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চীন-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া চীন-সাম্রাটের এক পুত্রকে প্রতিভূরূপ নিজ রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণীতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

চীনের সহিত যুদ্ধ

কাশগড়, খোটান ও ইয়ারকন্দ জয়

কণিষ্কের সাম্রাজ্যকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ভারতের

বাহিরে কাশগড়, খোটান ও ইয়ারকন্দ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভারতে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া তাঁহার ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। বিহার ও বাংলা-দেশেও তাঁহার সময়ের প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্কের সাম্রাজ্যের দুইভাগ

কণিষ্ক তাঁহার রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার হইতে রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল 'মহাক্ষত্রপ' 'খরপল্লন' প্রভৃতি উপাধিধারী কর্মচারীগণ কর্তৃক শাসিত হইত এবং উত্তরাঞ্চল সেনাপতি 'লাল' ও 'বস্পসি' উপাধিধারী ক্ষত্রপগণ কর্তৃক শাসিত হইত।

রাজ্য শাসনব্যবস্থা

কণিষ্কের ধর্মমত (Kanishka's Religion): বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের মতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে কণিষ্কের কোন বিশিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে কণিষ্ক বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার পূর্ব প্রচারিত মুদ্রার উল্লেখ করা যাইতে পরে। এই মুদ্রাগুলিতে বহু দেবতার মূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস

সম্ভবতঃ সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহর পরবর্তী মুদ্রা-গুলিতে বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায়। অনেকের মতে বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষের প্রভাববশতঃ কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও কণিষ্ক অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কণিষ্কের ধর্মীয়-উদারতা

অশোকের ন্যায় কণিষ্কও বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং উহার বিস্তারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলিন। তিনি বহু পুরাতন বৌদ্ধ বিহারগুলির সংস্কার সাধন ও বহু নূতন বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্যও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া-ছিলেন। পেশোয়ারে তিনি একটি বিশাল বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মঠটি সেই যুগের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কথিত আছে যে এজিসিলাওস (Agesilaos) নামে জনৈক গ্রীক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এই মঠটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও কণিষ্ক বহু বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধ-

কণিষ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

গ্রন্থাদি চীনা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। কণিষ্ক গান্ধার শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলের ভাস্কর ও চিত্র-শিল্পীগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধ উপাসকগণের সংখ্যাও অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মহাযান ও হীনযান ধর্মমত

কণিষ্কের সময় বৌদ্ধ সমাজ 'মহাযান' ও 'হীনযান'* এই দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সার সংকলন ও সাম্প্রদায়িক অনৈক দূর করার উদ্দেশ্যে কণিষ্ক অশোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গান্ধার কিংবা জলন্ধরে এক বৌদ্ধ সংগীতি বা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহা চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ-সংগীতি নামে পরিচিত। সুপণ্ডিত, বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ এই অধিবেশনের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সভায় সমগ্র বৌদ্ধ গ্রন্থাদি পুনর্বিবেচিত হয় এবং 'ত্রিপিটক' যথা 'বিনয়-পিটক' 'সূত্ত পিটক' ও 'অভিধর্ম পিটক' নামে পরিচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তিনটির উপর অসংখ্য টীকা প্রস্তুত করা হয়। এই গুলি একত্রে 'মহাভিভাষ্য' নামে পরিচিত হয়। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে 'মহাভিভাষ্য' গ্রন্থটি একখানি অমূল্য সম্পদ। এই অধিবেশনে বৌদ্ধ ধর্মমতের যথার্থ ব্যাখ্যা গৃহীত হয় এবং উহা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়া একটি স্তূপে রখিবার ব্যবস্থা করা হয়। চতুর্থ বৌদ্ধ সভায় 'মহাযান' মতবাদ গৃহীত হয়।

চতুর্থ বৌদ্ধসভা

বৌদ্ধ ধর্মের নব রূপায়ন

কণিষ্কের আমলেই বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর দেখা যায়। পূর্বে বিভিন্ন চিহ্ন (symbol) দ্বারা বুদ্ধের উপাসনা করা হইত। কিন্তু 'মহাযান' মতবাদ অনুসারে বুদ্ধের প্রতিকৃতি উপাসনার প্রচলন শুরু হয়। পূর্বে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি পালিভাষায় রচিত হইত। কিন্তু এই সময় হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি রচনায় সংস্কৃতের প্রচলন শুরু হয়।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা (Patron of Arts and Literature) কণিষ্ক শিল্প এবং সাহিত্যেরও একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে বহু উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজসভায় বহু খ্যাতনামা মনীষী অবস্থান করিতেন। ইহাদের মধ্যে 'বুদ্ধ-চরিত' রচয়িতা

* **'মহাযান' ও 'হীনযান'ঃ** বৈশালীতে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ মহাসভার সিদ্ধান্ত সকলে গ্রহণ করিতে না পারিলে বৌদ্ধগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং উহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এই সম্প্রদায় দুইটি 'মহাযান' ও 'হীনযান' নামে পরিচিতি লাভ করে। মহাযান মতাবলম্বীরা সাধনার মূল্য স্বীকার করে ও বুদ্ধকে মনুষ্য জাতির ত্রাণকর্তা বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ ইহারা বোধিসত্ত্বে বিশ্বাসী। অপরদিকে হীনযান মতাবলম্বীরা অহিংসা ও ব্যক্তিগত নির্বাণ লাভ করার সাধনাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে। ইহারা বুদ্ধের নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী।

অশ্বঘোষ, বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা চরক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কণিষ্কের রাজত্বকালে শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগে গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পকলার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহা 'গান্ধার শিল্প নামে প্রসিদ্ধ। অমরাবতী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি তক্ষশীলা ও কাশ্মীরের সন্নিকটে কনিষ্কপুর প্রভৃতি নগর সে যুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন।

কণিষ্কের রাজত্বের গুরুত্ব (Importance of Kanishka's Rule)

কণিষ্কের কৃতিত্ব

কণিষ্কের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। তিনি যে কেবল কুষাণবংশেরই শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন এমন নহে, সাম্রাজ্য-স্রষ্টা, সুশাসক, সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক হিসাবে তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া অভিহিত করা যায়। একাধিক কারণে কণিষ্কের রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **রাজনৈতিক ঐক্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন**—কণিষ্কের সাম্রাজ্য পশ্চিমে খোরাসান হইতে পূর্বে বিহার এবং উত্তর খোটান হইতে দক্ষিণে কংকন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণিষ্কের পূর্বে কোন ভারতীয় নৃপতি মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কখনও সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। ভারত ও ভারতের বাহিরে রাজ্য বিস্তৃতি কণিষ্কের রণদক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। এতদ্ভিন্ন মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করিয়া কণিষ্ক ভারতের এক বিশাল অংশে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) **বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার**ঃ অশোকের অসমাপ্ত কার্য কণিষ্ক সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ভারতের বাহিরে রাজ্য জয়ের ফলে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারলাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাযান' বৌদ্ধধর্মমত, তিব্বত, চীন ও জাপানে প্রসারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে আনুমানিক ৬১-৬৭ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদি চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

(৩) **মহাযান সম্প্রদায়ের প্রাধান্য**ঃ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কণিষ্কের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করিয়া এবং অগণিত বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম

পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল ; 'মহাযান' ধর্মমত প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল এবং ভারতের বাহিরে এই মতবাদ প্রসারলাভ করিয়াছিল।

(৪) **সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষ**—কণিষ্ক সাহিত্য ও শিল্পের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। তাঁহার রাজসভায় যে সকল মনীষী অবস্থান করিতেন তন্মধ্যে অশ্বঘোষ নাগার্জুন ও বসুমিত্র সমধিক উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে কবি দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধচরিত' (মহাকাব্য পদ্ধতিতে, ইহাতে বুদ্ধের জীবনী চিত্রিত আছে), 'সৌন্দরানন্দ কাব্য' (বুদ্ধের জীবনী প্রসঙ্গে লিখিত), ও বজ্রসূচি' (ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদের বিরুদ্ধে লিখিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে অশ্বঘোষকে মিলটন, ভলটেয়ার ও গেটে-র **(Goethe)** সহিত তুলনা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন রচিত 'শত-সহস্রিকা-প্রাজ্ঞ পরিমিতা' ও 'মধ্যমিকা সূত্র' সে যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। বৌদ্ধ দর্শন 'মহাভিভাষ্য' রচয়িতা বসুমিত্র এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণেতা চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। এই সকল মনীষীদের রচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়াছিল।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও কণিষ্কের রাজত্বকালে বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কণিষ্কের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। পেশোয়ারে তাঁহার নির্মিত মঠ, মথুরা ও কণিষ্কপুর-নগরী, অমরাবতীতে প্রাপ্ত বৃহৎ প্রস্তর-পদক, মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মূর্তি প্রভৃতি সেই যুগের শিল্পকলার চমৎকার নিদর্শন। কণিষ্কের রাজত্বকালে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পকলার সংমিশ্রণে উদ্ভূত গান্ধার শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কণিষ্কের রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

কণিষ্ক ও অশোক (Kanishka and Asoka)ঃ অশোকের সহিত কণিষ্কের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, উভয়েই সিংহাসন আরোহণের ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। দ্বিতীয়তঃ, উভয়েই সর্বান্তঃকরণে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, উভয়েই বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে ও বৌদ্ধসংঘের দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে সমভাবেই যত্নবান ছিলেন। অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি বা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং কণিষ্ক গান্ধার কিংবা জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ-সংগীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধসংঘের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করাই উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল। অশোক ভারত, সিংহল ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কণিষ্কও তিব্বত, চীন

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য

ও জাপানে উহা প্রচারের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এক কথায় এই ব্যাপারে অশোকের অসমাপ্ত কার্য কণিষ্ক সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকে কণিষ্ককে 'দ্বিতীয় অশোক' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

উভয়ের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। অশোক ছিলেন 'হীনযান' ধর্মমতে বিশ্বাসী। কিন্তু কণিষ্ক ছিলেন 'মহাযান' মতের সমর্থক। কণিষ্ক অশোকের ন্যায় অহিংসা-নীতি গ্রহণ করেন নাই এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যুদ্ধবিগ্রহও পরিত্যাগ করেন নাই। চারিত্রিক মহানতা ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া অশোক কণিষ্ক অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন। এই কারণে কণিষ্ককে 'দ্বিতীয় অশোক' বলিয়া অভিহিত করিলে অশোকের মহত্ত্বকে ম্লান করা হয়।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন (Fall of the Kushan Empire):

পতনের কারণ

প্রথম কণিষ্কের রাজত্বকালে কুষাণ সাম্রাজ্য যে গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পরবর্তী কুষাণরাজগণের দুর্বলতা, প্রাদেশিক কুষাণ শাসকগণের স্বাধীনতা ঘোষণা, পারস্যে সাসানীয় বংশের উত্থান এবং গুপ্ত সম্রাটগণের ক্রমাগত আক্রমণ, প্রভৃতি কারণে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

কনিষ্কের পর বসিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মথুরা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই তাঁহার শাসন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অপর কোন অঞ্চলে তাঁহার মুদ্রা বা অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে কুষাণ সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির উপর তাঁহার কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

হুবিষ্কের আংশিক সাফল্য

বসিষ্কের পর হুবিষ্ক সিংহাসন আরোহণ করিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের বিনষ্ট অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। সম্ভবতঃ এই বিষয়ে তিনি আংশিক সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। কারণ মথুরা ছাড়াও পূর্ব আফগানিস্থান, কাবুল ও উহার পশ্চিম সীমান্তের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁহার মুদ্রা ও অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হুবিষ্কের সমসাময়িককালে দ্বিতীয় কণিষ্কের রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়।

কুষাণ শাসকগণের স্বাধীনতা ঘোষণা

হুবিষ্কের পর প্রথম বাসুদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ বর্তমান উত্তর প্রদেশের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য সীমাবদ্ধ

ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলগুলি কুষাণ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বাসুদেবের রাজত্বকালেই কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক কুষাণ শাসকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বাসুদেবের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুষাণ-সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়ে।

প্রথম বাসুদেবের উত্তরাধিকারীগণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ বাসুদেবের পর তৃতীয় কণিষ্ক ও দ্বিতীয় বাসুদেব যথাক্রমে ২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথম বাসুদেবের উত্তরাধিকারীগণের আমলেই কুষাণ সাম্রাজ্যের যথার্থ পতন শুরু হয়। ভারতের অন্তর্দেশে কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল ভারতীয় নৃপতিগণের হস্তগত হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন নাগ, যোদ্ধেয়, মালব ও কুনিন্দগণ। অনুশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের এক শতাব্দী পূর্বেই নাগগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পদ্মাবতী ও মথুরা—নাগ-গণের শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। ডক্টর আলতেকর (Altekar)-এর মতে কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যোদ্ধেয়গণও আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন। শতদ্রু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে যোদ্ধেয়গণের রাজ্য প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। যোদ্ধেয় ও কুষাণগণের তাম্র মুদ্রার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয় যে কুষাণ শাসনের উচ্ছেদ করিয়াই যোদ্ধেয়গণ কুষাণদের অনুকরণে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। মালব ও কুনিন্দগণও কুষাণ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাজপুতানায় মালবনগর ছিল মালবদের রাজধানী। যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কুনিন্দগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

বাসুদেবের উত্তরাধিকারীগণের আমলে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। সাসানীয় রাজগণ ব্যাক্ট্রীয়া, আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া উক্ত অঞ্চলগুলিতে কুষাণ শাসনের বিলোপ সাধন করেন। পশ্চিমী 'ক্ষত্রপ' ও সাতবাহনদের শাসন উচ্ছেদ করিয়া সাসানীয় সাম্রাজ্য সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বিস্তারলাভ করে। উত্তর-পশ্চিম ভারত সাসানীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে পরিণত হয়। ২৭৬-৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কুষাণগণ সাসানীয় শাসন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ক্রমে ভারতীয় সীমান্তের ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিগুলির মধ্যে কুষাণগণ

সাসানীয় ও গুপ্তরাজগণের আধিপত্য বিস্তার, হূণ ও মুসলমানগণের আক্রমণ ও শাহী বংশ কর্তৃক কুষাণ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন

বিলীন হইয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে এই অঞ্চলগুলি গুপ্ত সম্রাটগণের হস্তগত হয়। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর কুষাণগণকে যথাক্রমে হুণ ও মুসলমানগণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষার্ধে পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশ কর্তৃক কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

কুষান শাসনব্যবস্থা (Kushan Administrative System): কুষাণরাজগণের মুদ্রা ও অনুশাসনলিপি হইতে কুষাণ শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণ শাসনব্যবস্থায় বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই শাসন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ক্ষত্রপ শাসন। ক্ষত্রপগণ ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ভারতীয় ক্ষত্রপগণ একরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। বৈদেশিক উপাধিধারী কর্মচারীগণ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেন—যথা, ষ্টেটেজস্, মেরিডাক্ প্রভৃতি। বিদেশী কর্মচারীগণের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেই নিযুক্ত থাকিতেন। ভারতীয় কর্মচারীগণ ভারতের অভ্যন্তরেই নিযুক্ত থাকিতেন যথা অমাত্য, মহাসেনাপতি ইত্যাদি।

বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ

বৈদেশিক ও ভারতীয় কর্মচারী

রাজতন্ত্রই ছিল প্রচলিত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন অঞ্চলে প্রজাতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। কুষাণ রাজগণ 'মহেশ্বর', 'দেবপুত্র' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। কুষাণ আমলে একই সময়ে দুইজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। হুবিষ্ক ও দ্বিতীয় কণিষ্ক যুগ্মভাবে রাজত্ব করিতেন এইরূপ প্রমাণ আছে। কুষাণ সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল যথা,—রাষ্ট্র, অহর, জনপদ, দেশ ও বিষয়।

রাজতন্ত্র

যুগ্ম শাসন

বিভিন্ন ভাগ

কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কুষাণ আমলে রোমের স্বর্ণমুদ্রা ভারতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। কুষাণ মুদ্রায় কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির উপাস্য দেব-দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। জনগণের উপর কুষাণ সম্রাটগণ উহাদের ধর্মমত চাপাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ইরান, ব্যাক্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশের জনগণের উপাস্য দেব-দেবীর মূর্তিও কুষাণ-মুদ্রায় দেখা যায়। কুষাণ-মুদ্রায় ক্ষোদিত দেব-দেবীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল হেলিওস, ওরলাঙ্গো, শক-সান, সীরো, লাও, সাসেনা, ওসো ইত্যাদি। দ্বিতীয় কদফিসেসের মুদ্রায় শিবমূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। কুষাণ মুদ্রায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে কুষাণ সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম সমভাবে প্রচলিত ছিল।

মুদ্রা

মৌর্যোত্তর যুগে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ

(Post-Maurya Culture)

ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতে গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির শাসন চলিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। বর্তমান কালের আফগানিস্থানে কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণগণ ভারতের কতকগুলি প্রদেশ দখল করিয়াছিল মাত্র। গ্রীকদের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত বিজিত হয় নাই। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর কোন গ্রীক সৈন্যবাহিনী সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভারতে রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কতিপয় গ্রীক নৃপতি ভারত সীমান্তে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতের অন্তর্দেশে গ্রীকগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিল বলিয়া কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং গ্রীক বা কুষাণগণ উত্তর ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতীয়দের উপর বিজয় সম্পন্ন করিয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। বরঞ্চ গ্রীক ও কুষাণগণের অনেকেই ভারতীয় রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়া ও ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভারতীয় জনসমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। শক ও পহ্লবদের সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। মৌর্যোত্তর যুগে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছিল। গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণগণ ছাড়াও এই যুগে রোম ও চীনের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। ফলে ভারতে এক বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই যুগের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতিতে এই সমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৈদেশিকগণের আগমণের ফলে এক বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয়

মৌর্যোত্তর যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই যুগেই নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, পাতঞ্জলি, চরক, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কালিদাস প্রভৃতি মনীষীদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই যুগেই সর্বশ্রেষ্ঠ পালি-গ্রন্থ 'মিলিন্দ-পঞ্হো' রচিত হইয়াছিল। এই যুগে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্বঘোষ। অশ্বঘোষ ছিলেন কণিষ্কের সমসাময়িক ও অযোধ্যা-নিবাসী। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধ-চরিত', 'বজ্রসূচি', সূত্রালংকার', 'সারিপুত্র-

সাহিত্য

প্রকরণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকাব্যের পদ্ধতি অনুসরণে 'বুদ্ধচরিত' রচিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের জীবনী চিত্রিত আছে। 'সূত্রালংকারে' গদ্য ও পদ্যে রচিত বহু কিংবদন্তী সন্নিবিষ্ট আছে। 'বজ্রসূচী' নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। 'সারিপুত্র-প্রকরণ' একটি মনোজ্ঞ নাট্য কাব্য।

অশ্বঘোষ

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অশ্বঘোষের পরেই নাগার্জুনের স্থান। প্রথম মহাযান-সূত্র-'শতসহস্রিকা-প্রাজ্ঞ-পরমিতা' নামক গ্রন্থখানি তাঁহার রচনা। 'মাধ্যমিকা-সূত্র'-ও তাঁহার রচনা। নাগার্জুন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিক গ্রন্থাদিতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহাযান ধর্মমতের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক।

নাগার্জুন

এতদ্ভিন্ন কালিদাস রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম', চরক রচিত আয়ুর্বেদশাস্ত্র 'চরক-সংহিতা', পাতঞ্জলি রচিত 'মহাভাষ্য', মনু-রচিত 'মনুসংহিতা' যাজ্ঞবল্ক্য রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থাদি এই যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্পের যে উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল—তাহা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। এই উৎকর্ষতা গুহা-মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের চারি-পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অগণিত গুহা-মন্দির ও গুহা-আবাসস্থল নির্মিত হইয়াছিল। অশোকের আমলে নির্মিত গুহা-মন্দির ও গুহা-চৈত্যগুলি শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে বটে কিন্তু সেইগুলি খুব বড় বা কারুকার্যময় ছিল না। কিন্তু পরবর্তী যুগের বৃহৎ গুহাগুলি যথা,—ভাজা, চেদশা, কোন্দন, জুনার, নাসিক, অজন্তা, ইলোরা ও উদয়গিরি প্রভৃতি স্থানীয় গুহাগুলি উন্নত শিল্প-নৈপুণ্য ও শিল্পরুচির সাক্ষ্য বহন করে।

শিল্প

ভারতীয় শিল্পোৎকর্ষতার চরম নিদর্শন হইল পূর্ববর্তী যুগে নির্মিত স্তূপগুলিতে কারুকার্যময় প্রবেশদ্বারের সংযোজন। সাঁচী স্তূপের চারিটি কারুকার্যময় প্রবেশদ্বার ইহার চমৎকার নিদর্শন। ইহা ছাড়া ভারুত-স্তূপের তোরণ ও আবেষ্টনী, অমরাবতী স্তূপ ও উহার আবেষ্টনী প্রভৃতিতেও সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

উপরোক্ত শিল্প-নিদর্শনগুলিকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প বলা যায়।

মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীকগণ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। এই

অঞ্চলের শিল্পীগণ বিদেশাগত শিল্পরীতি হইতে প্রেরণালাভ করিয়া এক নূতন শিল্প-রীতির প্রবর্তন করিয়াছিল। ইহা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। মানুষের যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ করার কৌশল ছিল এই শিল্প-রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। গান্ধার শিল্প-রীতি অনুসরণেই বুদ্ধের অসংখ্য প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়াছিল। গান্ধার শিল্পে মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গান্ধার শিল্প-রীতির দ্বারা মথুরা অমরাবতীর শিল্প-রীতি প্রভাবিত হইয়াছিল বটে কিন্তু এই শিল্প-রীতি ভারতের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং পরবর্তীকালের ভারতীয় শিল্পে ইহার কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ভারতের বাহিরে যেমন চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গান্ধার শিল্পরীতি যথেষ্ট সাফাল্য অর্জন করিয়াছিল।

গান্ধার শিল্প

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসার লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে মিনান্দার, কণিষ্ক প্রভৃতি বিদেশাগত নৃপতিগণও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৌর্যোত্তর যুগে বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর ঘটিয়াছিল। এই যুগে বুদ্ধ 'দেবতা' ও 'দেবতিদেব'-রূপে পূজিত হইতে থাকেন। বৌদ্ধ ভাস্কর্যে বুদ্ধের প্রতিকৃতির প্রচলন এই যুগেই শুরু হয়। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ব্যাপক প্রচলন এই যুগেই শুরু হয়। মৌর্য যুগে 'হীনযান' বৌদ্ধ ধর্মমতই ছিল জনপ্রিয়। কিন্তু এই যুগে 'মহাযান' ধর্মমত জনপ্রিয় ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রবর্তক ছিলেন দক্ষিণ ভারতের খ্যাতনামা দার্শনিক নাগার্জুন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান ধর্মমত চীন এবং পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রসারলাভ করিয়াছিল। 'নাগার্জুনকণ্ডা' অনুশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারকগণ কাশ্মীর চীন, তোসালী, গান্ধার, বঙ্গ, সিংহল প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ-মাতঙ্গ চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ধর্ম

মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম

বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও মৌর্যোত্তর যুগে 'ভাগবত' বা বৈষ্ণবধর্মও বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রীকগণের মধ্যে 'ভাগবত' ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তক্ষশিলার রাজা এণ্টালকিভাসের দূত হেলিওডোরাস (Heliodoros) রাজধানী বেসনগরে (বিদিশা) ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একটি গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় তিনি ভাগবত ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বাসুদেব ও কৃষ্ণের উপাসনার সহিত এই যুগে শিব-পূজারও

ভাগবত ও অন্যান্য ধর্ম

যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কুষাণ-রাজ দ্বিতীয় কদ্‌ফিসেস শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার সময়কার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে এই যুগে সীমান্ত অঞ্চলে অভারতীয় গ্রীক ও ইরাণীয় দেব-দেবীরও পূজা প্রচলিত ছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ধর্ম-উদারতা ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি। এই যুগে ধর্ম-

ধর্ম-উদারতা

বিরোধের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারত এই যুগে অনগ্রসর ছিল না। রাওয়ালপিণ্ডির অনতিদূরে অবস্থিত তক্ষশীলা নগরটি বিদ্যা-শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। চরকের শিষ্য শল্যবিদ্যায় পারদর্শী জীবকের জীবনী হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের সময়েও তক্ষশীলা সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল।

শিক্ষা

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও চীন, গ্রীস, ইরাণ, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের জন্য তক্ষশীলায় আসিতেন। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে পানিনি, কাত্যায়ণ পাতঞ্জলী, জীবক, চাণক্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের বহু নৃপতি ও সামন্তগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ইহা ছাড়া কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। 'ধর্মপদ' হইতে জানা যায় যে মহলি নামক জনৈক লিচ্ছবী-যুবক তক্ষশীলার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মৌর্যোত্তর যুগে বাণিজ্য বিস্তৃতি

(Expansion of Trade in Post-Maurya Period)

মৌর্য যুগে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে। মৌর্য যুগে বহির্জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মৌর্যোত্তর যুগেও বহির্জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই পশ্চিমী দেশগুলি ও আফ্রিকার সহিত

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। জলপথে লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া হইত। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হইতে সেইগুলি রোম ও অপরাপর দেশগুলিতে লইয়া

যাওয়া হইত। অপর দিকে স্থলপথেও পারস্য ও এশিয়া মাইনরের ভিতর দিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ভূমধ্যসাগরের উপকূলে লইয়া যাওয়া হইত। এই স্থলপথটি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর হইতেই বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। কুষাণ আমলে রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। স্থলপথে পালমিরা (Palmyra) নগরী ও জলপথে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের ভিতর দিয়া রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত।

রোমের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক

রোম হইতে সোনা, রূপা, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে ভারতে আমদানী করা হইত। অপরদিকে ভারত হইতে মসলিন ও সূতীবস্ত্র রোমে রপ্তানি করা হইত। ভারতীয় মসলিনবস্ত্র রোমে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে রোমের অভিজাত-বংশীয়া নারীগণ প্রকাশ্য রাজপথে মসলিন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং ইহার ফলে সমাজে ব্যাভিচারের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে রোম সরকার রোমে মসলিনবস্ত্র আমদানি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রোম ও

রোমের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক

ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান ব্যাপারে ভারতেরই অধিক লাভ হইত। কারণ ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের জন্য রোম হইতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ ভারতে আমদানি হইত। পণ্ডিচারীর নিকট রোমান বাণিজ্য কেন্দ্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রোমান মুদ্রার অনুকরণে ভারতে মুদ্রাও নির্মিত হইত। বাণিজ্যের সহিত রোম ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে ভারত হইতে ন্যূনতম নয়বার রোম সম্রাটগণের নিকট রাষ্ট্রদূত প্রেরিত হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল। আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয়গণ স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন এরূপ নিদর্শনও আছে।

মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি—নৌরা (কানানোর), কাসারা (কাবেরীপত্তন), মৈসলিয়া (অন্ধ্র) বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক

এই বন্দরগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি হইতে মসলা, সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু আমদানি করা হইত। টলেমি-র বিবরণ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সুদূর প্রাচ্যের সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে আফ্রিকার উপকূলে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ স্থাপনের নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'পেরিপ্লাস নামক' গ্রন্থ হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা জানা যায়।

মৌর্যোত্তর যুগে মধ্য-এশিয়া ও প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত ভারতের সম্পর্ক

(Relations with the Central Asiatic and Neighbouring Countries)

প্রাচীন কলে হইতেই বহির্জগতের সহিত ভারতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। ঐতিহাসিক যুগেও উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতে যেমন বহিরাগত জাতিগুলি প্রবেশ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল তেমনি ভারতীয়গণও প্রতিবেশী দেশগুলিতে গমনাগমন করিয়া উহাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

আফগানিস্থান

হিন্দুকুশের অপর পারে অবস্থিত দেশগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক মৌর্য যুগেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কপিশা (বর্তমান আফগানিস্থান) রাজ্য বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন-সাং এই রাজ্যে বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। দিগম্বর-জৈন সম্প্রদায়ের বহু লোকেরাও এই রাজ্যে বসবাস করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক কপিশা বিজিত হইলে উহা আফগানিস্থান নামে পরিচিত হয়।

নেপাল

নেপাল হিমালয়ের অংশ বিশেষ। লিচ্ছবী বংশের রাজত্বকাল হইতেই নেপালের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই লিচ্ছবী-গণই বৈশালী ত্যাগ করিয়া নেপালে এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কথিত আছে অশোকের কন্যা চারুমিত্রা নেপালে আগমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। লিচ্ছবীগণের পূর্বে অভীরগণ নেপালে রাজত্ব করিত। নিমিশ নামে জনৈক ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজা নেপাল জয় করিয়াছিলেন। নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম সমভাবেই প্রচলিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ

হিউয়েন-সাং শ্রীক্ষেত্র ও দ্বারাবতী নামে ব্রহ্মদেশের দুইটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। স্থল ও জল উভয় পথেই প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের সম্বন্ধ ছিল। ভারতীয় বণিকগণ ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। কথিত আছে অশোক ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বেই ব্রহ্মদেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য বিস্তার শুরু হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শাক্যবংশীয় রাজপুত্র অভিরাজ কর্তৃক ইরাবতী উপত্যকায় রাজ্য স্থাপনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতের সহিত তিব্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সপ্তম শতাব্দীতে স্রং-সান-গাম্পো নামক জনৈক তিব্বতীয় রাজার আমলে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। কথিত আছে তিনি ভারতের একাংশ দখল করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য দীপংকর (অতীশ) তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে তথায় গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রচনা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণের নিকট ভারত পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া নেপাল ও সিকিমের ভিতর দিয়া তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রাচীনকাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

তিব্বত

মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ, মন্দির, চৈত্য ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার খোটান, কাশগড়, তুরফান কুচি প্রভৃতি দেশগুলিতে এক সময় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছিল। কুষাণগণের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়া। মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়াই হিউয়েন-সাং ভারতে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। এই অঞ্চলে যে সকল স্তূপ, চৈত্য ও মূর্তি পাওয়া গিয়াছে উহাতে ভারতীয় শিল্প-রীতির আভাষ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত বহু পাণ্ডুলিপিও সংস্কৃত, প্রাকৃত ও খরোষ্ঠী ভাষায় লিখিত। এক সময় খোটান ও কাশগড় বৌদ্ধ ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে খোটান, কাশগড় ও ইয়ারকন্দ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

মধ্য এশিয়া

খৃষ্ট পূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বেই প্রতিবেশী চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চীনা রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্বন্ধ গভীর ছিল। চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল দুই প্রকারের—বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক। খৃষ্ট পূর্বাব্দেই জল ও স্থল পথে চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। বহ্লিকদেশের ভিতর দিয়া চীনা-রেশমবস্ত্র ভারতে আসিত। ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের ভিতর দিয়াও দুইটি বাণিজ্য পথ ছিল। পূর্ব-চীনের বন্দরগুলি হইতে সমুদ্র পথে চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলাচল ছিল। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে চীনের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল।

চীন
বাণিজ্য সম্পর্ক

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথে সিংহল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ভারত হইতে চর্ম, অভ্র ও মূল্যবান প্রস্তর চীনে রপ্তানি করা হইত।

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া পরবর্তীকালে চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্য এশিয়া হইতে খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বহু চৈনিক সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদির অন্বেষণে ভারতে আসিয়াছিলেন। ১২১ খৃষ্টাব্দে চীনের হানবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালে জনৈক চীনা সেনাপতি মধ্য এশিয়া হইতে একটি বুদ্ধমূর্তি চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। হানবংশীয় সম্রাট সিং-তি-র অনুরোধক্রমে ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ-মাতঙ্গ নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে গমন করেন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করিতে সাহায্য করেন। কণিষ্কের আমলে চীনের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগও স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে চীনের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং তথায় বহু বৌদ্ধমঠ ও চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। চীন হইতে বহু শিক্ষার্থী ও ভিক্ষু বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্য এশিয়া ও চীনে ভারতীয় শিল্পধারা ঃ

চীনে ভারতীয় শিল্পধারা

মধ্য এশিয়া ও চীনে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় শিল্পরীতিও প্রবেশ করিয়াছিল। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তথায় বহু চৈত্য, মঠ, স্তূপ, বিহার ও গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এইগুলিতে ভারতীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। চীনের লো-ইয়াং নগরের নিকটবর্তী পর্বত গাত্রে বুদ্ধ ও বোধিসত্বের মূর্তি খোদিত করা রহিয়াছে। চীনদেশের বৌদ্ধ গুহাগুলি অজন্তার অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের কা-মিয়েন গুহার চৈত্যটি অজন্তার অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। কা-মিয়েন গুহায় বহু মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির নির্মাণকার্যে ভারতীয় শিল্পীগণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাক্যবুদ্ধ, বৌদ্ধকীর্তি ও কুমারবোধি নামে তিনজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী চীনে গমন করিয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ফলে চৈনিক ও ভারতীয় শিল্পধারায় এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অরেলস্টাইন মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থান খনন করিয়া বহু বৌদ্ধমঠ, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবমূর্তি ও স্তূপ এবং ভারতীয় ভাস্কর্য ও শিল্পকলার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। যে সকল স্তূপ, মূর্তি ও বিহার আবিষ্কৃত

হইয়াছে সেইগুলিতে ভারতীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। খোটান ও কাশগড়ে আবিষ্কৃত গুহাগাত্রে বহু চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কাশগড়ের 'দাম্‌দান্' গুহায় বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলিতে গান্ধার শিল্পরীতির সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে। ফুচীর গুহামন্দিরগুলিতে অজন্তার শিল্পরীতির আভাস সুস্পষ্ট। চীনের সীমান্তে অবস্থিত তুং-ওয়াং নামক স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ গুহামন্দির ও বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই গুহাগুলির প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্যে অজন্তা ও গুপ্তযুগের শিল্পরীতির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এক কথায় মধ্য এশিয়ায় ধর্মের সহিত ভারতীয় শিল্পরীতিও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় শিল্পধারা

মৌর্যোত্তর যুগের সামাজিক পরিবর্তন

(Social Changes in the Post-Maurya Period)

'স্মৃতি-শাস্ত্র' (সামাজিক বিধিনিয়ম সম্বলিত গ্রন্থ) হইতে মৌর্যোত্তর যুগের সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। এই যুগে পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুত্থান, বৌদ্ধধর্মে 'মহাযান' ও 'হীনযান' ধর্মমতের উৎপত্তি এবং বৈদেশিক জাতিগুলির আগমন প্রভৃতি কারণে ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মৌর্য-যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা সুদৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক জাতিগুলির আগমনের ফলে এই প্রথা শিথিল হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদ প্রথাও দুর্বল হইয়া পড়ে। শক,পহ্লব, গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজে বিলীন হইয়া যায়। পশ্চিম ভারতেও ক্ষত্রপগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রথম নৃপতিগণের নাম ছিল সম্পূর্ণ বৈদেশিক—যেমন ঘামোটিকা (Ghsamotika), চষ্টন (Chashtana), নহপান (Nahapana) প্রভৃতি। কিন্তু ইহাদের উত্তারাধিকারীগণ সম্পূর্ণ ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—যেমন বিশ্বসেন, রুদ্রসিংহ, বিজয়সিংহ রুদ্রসেন ইত্যাদি। এই সকল পরবর্তী ক্ষত্রপগণ উহাদের বৈদেশিক ভাষা ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু দেব-দেবীর উপাসকে পরিণত হন এবং সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেন। গ্রীকদেরও কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে। বৈদেশিকগণের সহিত ভারতীয় এবং বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মী রাজন্যবর্গের বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখও পাওয়া যায়।

এই যুগেই বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ এশিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতিগুলির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম প্রচারকগণও সুদূর প্রাচ্যের বহু বর্বর ও আদিম জাতিগুলির মধ্যে ভারতীয় আচার-ব্যবহার প্রসার করিয়াছিলেন।

মৌর্যোত্তর যুগে নারী সমাজেও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মৌর্যযুগে নারীগণ নানা প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিত এবং বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুনীগণ সর্বত্র স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পারিত। পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু নারীদের মধ্যে তাহা নিষিদ্ধ ছিল। রাজাদের দেহরক্ষীর কার্যে নারীগণ নিযুক্ত হইত এইরূপ প্রমাণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজপরিবারের নারীগণ তাঁহাদের পুত্রদের অভিভাবীকারূপে রাজ্য শাসন করিতেন এইরূপ প্রমাণও আছে। কিন্তু মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিকগণের আগমনের ফলে নারীদের স্বাধীনতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং উহাদের অন্তঃপুরবাসিনী করিয়া তুলিবার চেষ্টা শুরু হয়। ফলে নারী সমাজে অবরোধ প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয়। নারী শিক্ষার পথও রুদ্ধ হইয়া পড়ে। সেযুগে রাজপরিবার ও সমাজের উচ্চ বর্ণের মধ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রশ্নমালা

1. Give a short history of the Satavahana dynasty.
2. Give an account of the Indo-Greek dynasties and examine the extent of Greek influence on Indian culture.
3. Give an account of the Saka rule in India.
4. Briefly describe the rule of the Kushans in India with special reference to Kanishka.
5. Who were the Kushans? Whom do you regard as their greatest ruler and why?
6. Account for the importance of the Kushan rule.
7. Give an account of the decline and fall of the Kushan Empire.
8. Describe the cultural results of the foreign invasions in India in the post Maurya period.
9. Write what you know of Indian culture in the Maurya period.
10. Give a short account of the India's commercial and cultural contacts with her neighbours in post Maurya period.

চতুর্থ অধ্যায়

গুপ্ত-সাম্রাজ্য (Gupta Empire)

তথ্যাদি (Sources) : গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় উপাদানের অভাব নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) **পুরাণ :** গুপ্তরাজগণের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় পুরাণ একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। পুরাণের সংখ্যা হইল ১৮। ইহাদের মধ্যে বায়ু-পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ ও ভগবৎ-পুরাণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইসব পুরাণ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য, উহার সীমানা ও প্রদেশগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। এইগুলি হইতে গুপ্তরাজগণের নাম এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বহির্ভূত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণ হইতে সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজবংশের যথা, বকাটক, নাগ, শক প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়।

(২) **ধর্মশাস্ত্র :** ধর্মশাস্ত্র হইতেও প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রগুলির অধিকাংশই গুপ্ত-যুগে রচিত হইয়াছিল।

(৩) **মকন্দক-নীতিসার :** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী শিখর কর্তৃক এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। ইহাতে রাজ-কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট আছে।

(৪) **নাটক :** গুপ্তযুগে রচিত নাটকগুলিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য উপাদান। কৌমুদি-মহোৎসব' নামক নাটক হইতে সেই যুগে মগধের রাজনৈতিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ডক্টর জয়স্বাল-এর মতে এই নাটকখানি ৩৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ডক্টর দীক্ষিত-এর মতে এই নাটকখানি হইতে গুপ্তবংশের উৎপত্তি ও উত্থানের বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। (খ) 'নাট্যদর্পন' নাটক হইতে জানা যায় যে রামগুপ্ত ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। রামগুপ্ত ও জনৈক শকরাজের মধ্যে যুদ্ধে রামগুপ্ত পরাজিত হইয়া স্বীয় মহিষী ধ্রুবদেবীকে শকরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত নারীর পোষাকে শকরাজের শিবিরে প্রবেশ করিয়া শক-রাজকে হত্যা করেন। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(গ) মুদ্রারাক্ষস—বিশাখদত্ত কর্তৃক রচিত এই নাটকখানি অপর মূল্যবান উপাদান। যদিও ইহাতে মৌর্য-সাম্রাজ্য সম্পর্কেই বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে—

তথাপি গ্রন্থকার গুপ্ত-সাম্রাজ্য সম্পর্কেও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে গুপ্তরাজগণের ধর্ম সম্বন্ধে জানা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে শক, যবন, কম্বোজ, গান্ধার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের বিবরণও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

(৫) **বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী**—ফা-হিয়েন ও ইৎসিং নামক চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণীও গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

(৬) **অনুশাসন লিপি**—গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ অনুশাসন লিপিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, উদয়গিরির গুহালিপি; মথুরার শিলালিপি, সাঁচীর শিলালিপি, ভিতরী স্তম্ভলিপি প্রভৃতি হইতে গুপ্তরাজগণের কৃতিত্ব ও তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে জানা যায়।

(৭) **মুদ্রা**—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও গুপ্তরাজগণের কৃতিত্ব সম্পর্কে গুপ্তরাজগণ কর্তৃক প্রচারিত মুদ্রা উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই সকল মুদ্রা হইতে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কথা জানা যায়।

গুপ্ত বংশের উত্থানের পূর্বে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

(Political condition of Northern India before the rise of the Guptas): কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তীকালে উত্তর ভারতে একাধিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে নাগ, অহিচ্ছত্র, অযোধ্যা, কৌশম্বী, বকাটক প্রভৃতি রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে অর্জুনয়ন, মালব, কুনিন্দ প্রভৃতি রাজ্যগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য।

রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্য সমূহ

(১) **নাগ রাজ্য**: নাগগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। পুরাণ হইতে জানা যায় যে নাগ-রাজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল বিদিশা, কান্তিপুরা, মথুরা ও পদ্মাবতী। বিদিশার নাগরাজাগণের মধ্যে শিশ, ভোগী ও সদাচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে মহারাজ ভবনাগ নামে জনৈক নাগ-রাজা ছিলেন প্রথম রুদ্র সেনের মাতামহ এবং প্রথম রুদ্রসেনের পৌত্র ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভবনাগ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এলাহাবাদ-স্তম্ভ লিপিতে নাগগণের বিরুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ আছে। নাগবংশের সহিত সমুদ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। পুরাণে পদ্মাবতী রাজ্যের নয়জন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। মথুরা রাজ্যের নাগ রাজা মহারাজ বীরসেন ছিলেন পরাক্রান্ত।

(২) **অহিচ্ছত্র রাজ্য**—মুদ্রা হইতে অহিচ্ছত্র রাজ্যের রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীতে উহারা রাজত্ব করিতেন। ইহাদের মধ্যে ভদ্রঘোষ, সূর্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও ফাল্গুনীমিত্র ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) **অযোধ্যা রাজ্য ঃ** মুদ্রা হইতে অযোধ্যা-রাজ্যের রাজগণের মধ্যে ধনদেব ও বিশাখদেবের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ধনদেব ছিলেন কোশলের রাজা এবং অনেকের মতে তিনি ছিলেন পুষ্যমিত্রের বংশধর।

(৪) **কৌশম্বী রাজ্য ঃ** কৌশম্বী রাজ্যের রাজগণের মধ্যে সুদেব, অশ্বঘোষ, অগ্নিমিত্র, দেবমিত্র, বরুণমিত্র প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

(৫) **বকাটক রাজ্য ঃ** বকাটক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্যশক্তি। তিনি বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। সমসাময়িক মুদ্রায় তাঁহাকে ইন্দ্র ও বরুণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন ছিলেন এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি নর্মদা নদী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে রাজ্য-জয়ের পর তিনি সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবরসেনের পর প্রথম রুদ্রসেন বকাটক সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। সম্ভবতঃ প্রথম রুদ্রসেন ও এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত রুদ্রদেব ছিলেন অভিন্ন।

(৬) **অর্জুনয়ন রাজ্য ঃ** ভরতপুর ও আলোয়ার লইয়া অর্জুনয়ন নামক প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্যটি গঠিত ছিল। ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীকদের পরেই অর্জুনয়নগণ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। সাময়িকভাবে শকগণ অর্জুনয়নগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু কুষাণগণের পরে পুনরায় অর্জুনয়নগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ইহারা গুপ্তরাজগণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্য সমূহ

(৭) **মালব রাজ্য ঃ** মালব রাজগণ ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক। সেই সময় এই রাজ্য পাঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে মালবগণ আধুনিক রাজস্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। জয়পুরের সন্নিকটে মালবনগর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ইহারা বিক্রম অব্দের অনুসরণ করিত। শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মালবগণ জয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশেষে ইহারা গুপ্তরাজগণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

(৮) **কুনিন্দ রাজ্য ঃ** মুদ্রা হইতে কুনিন্দ রাজ্যের ইতিহাস জানা যায়। যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। কুনিন্দ শাসকগণের মধ্যে অমোঘভূতির নাম পাওয়া যায়।

(৯) **কুলত রাজ্য :** কুনিন্দগণ কুলতগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ইহারা কাবুল উপত্যকায় বসবাস করিত। মুদ্রা হইতে বীর্যস্য ও ভদ্রস্য-এর নাম পাওয়া যায়। অবশেষে কুলতগণ গুপ্তরাজগণ কর্তৃক বিজিত হয়।

গুপ্ত বংশের উৎপত্তি (Origin of the Gupta Dynasty) : গুপ্তবংশের উৎপত্তি ও উহার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুঙ্গ ও সাতবাহন আমলের ভারতীয় দলিলপত্রে 'গুপ্ত' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ গুপ্ত রাজ বংশের সহিত এই 'গুপ্ত' নামধারী ব্যক্তি বিশেষের কোন সম্পর্ক ছিল না। ডক্টর জয়স্বাল গুপ্তগণকে জাঠ গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। ডক্টর রায় চৌধুরী গুপ্তগণকে ধরণগোত্রীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এইরূপ অভিমত যথার্থ নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ডক্টর ডি, সি, গাঙ্গুলী-র মতে গুপ্তরাজগণের আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে, মগধে নহে। চৈনিক পরিব্রাজক (৬৭২ খৃষ্টাব্দ)-ইৎসিং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে তাঁহার ভারত পরিভ্রমণের পাঁচশত বৎসর পূর্বে মহারাজা শ্রীগুপ্ত নামে জনৈক রাজা চৈনিক ধর্মযাজকদের জন্য নালন্দার ২৪০ মাইল পূর্বদিকে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা 'চীনের মন্দির' নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং ইৎসিং-এর বর্ণনা অনুসারে নালন্দার পূর্বদিকে অবস্থিত বাংলাদেশকেই বুঝায় এবং মহারাজ শ্রীগুপ্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণু-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ ও ভগবৎ পুরাণে বলা হইয়াছে যে গুপ্তরাজগণের আদি বাসস্থান ছিল মগধে। সম্ভবতঃ গুপ্তরাজগণ প্রথমে বাংলাদেশেই রাজত্ব করিতেন এবং পরে উহারা মগধে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রীগুপ্ত (২৪০-২৮০ খৃষ্টাব্দ) : প্রভাবতী গুপ্তের পুণা তাম্র অনুশাসন লিপিতে শ্রীগুপ্তকে গুপ্তবংশের অধিরাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ডক্টর আর, সি, মজুমদার-এর মতে গুপ্তবংশের শ্রীগুপ্ত ও ইৎসিং কর্তৃক উল্লিখিত মহারাজা শ্রীগুপ্ত অভিন্ন। সম্ভবতঃ শ্রীগুপ্ত বাংলার কোন এক অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচকে 'মহারাজা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ যথার্থ স্বাধীন ছিলেন কিনা বা অপর কোন রাজার সামন্ত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ঘটোৎকচ : ঘটোৎকচকে শ্রীগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তের দুইটি অনুশাসন লিপিতে ঘটোৎকচকে প্রথম গুপ্তরাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকাল বা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, ৩২০-৩৪০ (Chandra Gupta I) : গুপ্তবংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। গুপ্ত রাজগণের

মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'মহারাজা ধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি ৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে পুরাণে উল্লিখিত আছে যে "প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সকেত (অযোধ্যা) ও মগধ (দক্ষিণ বিহার) প্রভৃতি অঞ্চল গুপ্তরাজের অধিকাভুক্ত রহিবে।" প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সকেত কিংবা প্রয়াগ বিজয়ের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বৈশালীও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল না। এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপিতে নেপাল গুপ্ত-সাম্রজ্যের সীমান্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে। কতকগুলি সাহিত্যে মগধ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে কিন্তু এই তথ্য নির্ভরযোগ্য নহে। 'কৌমুদী-মহোৎসব' নামক নাটকে স্থন্দরবর্মনকে মগধের অধিশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কথিত আছে যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পাটলিপুত্র আক্রমণকালে স্থন্দরবর্মন গুপ্ত রাজকে বাধা প্রদান করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লিচ্ছবী বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লিচ্ছবীদের সাহায্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মগধ জয় করিয়াছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিচ্ছবী-গুপ্ত বৈবাহিক সম্পর্কের উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পন করিয়াছেন। স্মিথের মতে লিচ্ছবী রাজকন্যাকে বিবাহ করায় মগধ তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গুপ্ত বংশের প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে লিচ্ছবী রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় ও ক্ষুদ্র গুপ্ত বংশের অধিপতিগণ সার্বভৌমত্বের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ নিজেদের "লিচ্ছবীকন্যার বংশধর" বলিয়া গর্ববোধ করিতেন। কিন্তু এ্যালেন (Allen) ও ডক্টর মজুমদার স্মিথের মত সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবী রাজকন্যার বিবাহের সময় লিচ্ছবীগণ সমাজে মোটেই সমাদৃত ছিল না। মনু-সংহিতায় লিচ্ছবীগণকে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা নিম্ন-ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ডক্টর মজুমদারের মতে লিচ্ছবী বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক গুপ্তবংশের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল—সামাজিক মর্যাদা নহে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গৌতম বুদ্ধের সময় লিচ্ছবীগণ যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও গৌরব অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় উহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একমাত্র নেপাল উপত্যকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র বিহার, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশের কিছু অংশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ খৃষ্টাব্দ)
(Samudra Gupta)

সিংহাসনারোহণ ঃ এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি* হইতে জানা যায় যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাহার পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের মনোনয়নের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ ('তুল্য-কুলজ') মর্মাহত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপির এইরূপ উল্লেখের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মনে করেন যে সম্ভবতঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে উত্তারিকার সংক্রান্ত বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল। কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রায় 'কচ'-নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মিথের মতে 'কচ' ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক ভ্রাতা এবং সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্ত ও কচ্ ছিলেন অভিন্ন। সমুদ্রগুপ্তের পূর্বনাম ছিল কচ এবং রাজ্যজয়ের পর তিনি সমুদ্রগুপ্ত নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তথাকথিত কচ কর্তৃক প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রার অপর দিকে সর্বরাজোচ্ছেত্তা' কথাটি ক্ষোদিত দেখা যায়। গুপ্তবংশের সরকারী দলিলপত্রে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা উপাধিটি এক-মাত্র সমুদ্রগুপ্তের প্রতিই প্রযুক্ত করা হইয়াছে।

সিংহাসনারোহণ কাল সম্পর্কে মতভেদ

সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের যথার্থকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। নালন্দার তাম্রলিপি অনুসারে তিনি ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ডক্টর মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩৪০ ও ৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ডক্টর (আর, কে,) মুখার্জির মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩২৫ হইতে ৩৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রধান উপাদান

এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ রাজকবি হরিষেন রচিত প্রশস্তি, সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রা ও চৈনিক ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থাদি হইতে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

---

* **এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপি ঃ**—অশোকের একটি স্তম্ভে গুপ্ত রাজকবি হরিষেণ কর্তৃক রচিত প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এলাহাবাদের দুর্গে এই স্তম্ভখানি রক্ষিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন তারিখ নাই। ফ্লিটের মতে প্রশস্তি খানি সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরই উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ফ্লিটের মন্তব্য সমর্থিত হয় নাই। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পরই ইহা রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রশস্তিখানির গুরুত্ব যথেষ্ট। ইহাতে কবি হরিষেণের কাব্য-প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কতকাংশ পদ্যে রচিত। ইহাতে সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষা, বিদ্যোৎসাহীতা রাজ্য জয় ও রাজ্য-শাসন প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে।

গুপ্ত সম্বৎ ঃ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ফ্লিট (Fleet) প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্ত সম্বতের প্রবর্তক এবং ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সিংহাসনারোহণের কথা প্রচার করিলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞগণ আশ্বস্তবোধ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মিথ মন্তব্য করেন, "A great step in advance was gained by Fleet's determination of the gupta era"। আল্-বিরুণীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই ফ্লিট উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আল্-বিরুণীর মতানুসারে গুপ্ত ও শক সম্বতের মধ্যে ব্যবধান ছিল ২৪১ বৎসরের। শক সম্বৎ শুরু হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে সুতরাং এই হিসাবে বিচার করিলে গুপ্ত সম্বৎ ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে শুরু হইয়াছিল বলা যায়।

ফ্লিটের বিশ্লেষণ আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সমর্থিত হয় নাই। ডক্টর শ্যাম শাস্ত্রীর মতে গুপ্ত সম্বৎ ২০০-২০১ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়। শ্রীগোবিন্দ পাই-এর মতে ২৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সম্বৎ প্রবর্তিত হয়। ডক্টর ভাণ্ডারকারও ফ্লিটের মন্তব্য সমর্থন করেন নাই। কিন্তু ফ্লিটের মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তির অভাব নাই। কুমার গুপ্ত ও বন্ধুবর্মণের মান্দাশোর অনুশাসনলিপিতে ফ্লিটের মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ভিলসার অনুশাসনলিপিতে গুপ্ত সম্বতের ৯৬ সালে সম্রাট কুমার গুপ্তের সর্বপ্রথম তারিখ পাওয়া যায়। কুমার গুপ্তের কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রায় গুপ্ত সম্বতের ১৩৬ সালের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফ্লিটের মতানুসারে কুমার গুপ্ত ৪১৪ হইতে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ফ্লিটের মন্তব্য গ্রহণ করিলে কুমার গুপ্তের রাজত্বের সময়ের সহিত মান্দাশোর অনুশাসন লিপির তারিখের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্বতের ৯৩ সালে অর্থাৎ ৪১২-১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। মুদ্রার সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে শক সম্বতের ৩০৪ অর্থাৎ ৩৮২ খৃষ্টাব্দে শক বংশের অবসান ঘটিয়াছিল।

রাজ্যজয় (Conquests) ঃ রাজ্য জয়ের জন্য সমুদ্রগুপ্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং এই কারণে স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হরিষেণ রচিত প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা

মহাপদ্মনন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায় সমুদ্রগুপ্তও দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌটিল্য কর্তৃক প্রচারিত রাষ্ট্রীয় নীতির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। "শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করিবে ও শত্রু নিপাত করিবে"—কৌটিল্যের এই নীতি সমুদ্রগুপ্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন।

(১) উত্তর ভারত ঃ এলাহাবাদ প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের নয়জন রাজাকে পরাজিত করিয়া উহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই নয়জন রাজা ছিলেন রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মন,

গণপতিনাগ, অচ্যুত, নাগসেন, নন্দীন, বলবর্মন প্রভৃতি। অচ্যুত ছিলেন আধুনিক বেরেলী জেলার অন্তর্গত অহিচ্ছত্র রাজ্যের রাজা। বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' হইতে জানা যায় যে নাগসেন ছিলেন পদ্মাবতী ও মথুরার নাগ-বংশের রাজা। রুদ্রদেব (বা প্রথম রুদ্রসেন) ছিলেন বকাটক বংশের রাজা। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যের পূর্বাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। গণপতিনাগ ছিলেন নাগসেনের উত্তরাধিকারী এবং ধরের অধিপতি ('ধরধীশ')। তিনি ছিলেন পরাক্রান্ত রাজা ও সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদলের নেতা। চন্দ্রবর্মণ ছিলেন সুশুনিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) রাজ্যের অধিপতি।

উত্তর ভারতে রাজ্য জয় সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত মধ্য প্রদেশের অরণ্যময় অঞ্চলের রাজ্যসমূহের (আটবিক রাজ্য) উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। আর্যাবর্তের প্রায় সকল রাজ্যই গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা উপাধি ধারণ করেন।

(২) **দক্ষিণ ভারত ঃ** আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্ত যে সকল রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজা, কৌরলের মন্তরাজ, কোত্তরের স্বামীদত্ত, এরণ্ডের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অভমুক্তার নীলরাজ, কুস্থলাপুরের ধনঞ্জয় সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দক্ষিণ ভারতের এই অভিযান সামরিক দিক হইতে সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সমুদ্রগুপ্ত বিজিত রাজ্যগুলিকে স্বরাজ্যভুক্ত না করিয়া বিজিত রাজন্যবর্গের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ সুদূর পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণ ভারতের উপর নিরংকুশ আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

দক্ষিণাপথের পরাজিত রাজণ্যবর্গের প্রতি আচরিত নীতি ঃ আর্যা-বর্তের অনুসৃত নীতির সহিত ইহার পার্থক্য

(৩) **সীমান্ত রাজন্যবর্গের আনুগত্য লাভ ঃ** সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে আতঙ্কিত হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের যথা,—সমতাত, কামরূপ, নেপাল, মালব, অর্জুনয়ন, আভীর প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া কর প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। এমন কি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও গুজরাটের শক রাজগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সমতাত রাজ্যটি কামরূপের দক্ষিণে কর্ণসুবর্ণের (আধুনিক মুর্শিদাবাদ), এবং তাম্রলিপ্তির (আধুনিক মেদিনীপুর জেলা) পূর্বে অবস্থিত ছিল। আধুনিককালের আসাম লইয়া কামরূপ রাজ্যটি গঠিত ছিল। সমুদ্র-গুপ্তের সমসাময়িক কামরূপ-রাজ ছিলেন পুষ্যবর্মন, মতান্তরে সমুদ্রবর্মন।

তৎকালীন নেপাল রাজ্যটি গণ্ডক ও কুশি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক নেপাল-রাজ ছিলেন প্রথম জয়দেব। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় মালব রাজ্যটি পাঞ্জাবের এক অংশ লইয়া গঠিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের আমলে এই রাজ্যের সুনির্দিষ্ট রাজ্যসীমা জানা যায় না। ডক্টর মজুমদারের মতে মালব রাজ্যটি সম্ভবতঃ মেবার, টোঙ্ক ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের কিছু অংশ লইয়া গঠিত ছিল। অর্জুনয়ন রাজ্যটি আগ্রা ও মথুরার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। আভীর রাজ্যটি ঝাঁসী ও ভিল্‌সার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক (Foreign Relations) : সমুদ্র গুপ্তের সামরিক খ্যাতি কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাহিরেও এই খ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্মন একদল দূত ভারতে অশোকস্তূপ পরিদর্শনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলীয় দূতগণ ভারতে যথেষ্ট আদর ও আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা রাজা মেঘবর্মনের নিকট এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে সেই সময় তাঁহারা ভারতের কোথাও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন নাই। চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে সিংহলীয় রাজা ভারতে তাঁহার প্রজাবর্গের স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিবার জন্য সংঘরাম নির্মাণের সংকল্প করেন এবং বুদ্ধগয়ায় একটি সংঘরাম প্রতিষ্ঠার অনুমতি চাহিয়া সমুদ্রগুপ্তের নিকট প্রচুর উপঢৌকন-সহ দূত প্রেরণ করেন।

সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে উক্ত সংঘরামটি নির্মিত হয়। হিউয়েন-সাং এই সংঘরামটি মহাবোধি সংঘরাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রায় এক হাজার মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধভিক্ষুগণ এই সংঘরামে বাস করিতেন। সমুদ্রগুপ্তের নিকট সিংহল-রাজের দূত প্রেরণের কথা এলাহাবাদ প্রশস্তিতেও উল্লিখিত আছে।

সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যথা,—মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের হিন্দু উপনিবেশগুলির উপরও সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বা পরে ভারতের কোন হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি এই সকল উপনিবেশগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

অশ্বমেধ যজ্ঞ : দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা : ডক্টর মজুমদারের মতে কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতানা, সিন্ধু ও গুজরাট ভিন্ন প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ডক্টর আর, কে, মুখার্জীর মতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্মদা এবং উত্তরে হিমালয় ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করিতেন তাহা উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার বাহিরে ছিল স্বায়ত্তশাসিত করদ ও মিত্ররাজ্য। তাঁহার সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনের সহিত স্বায়ত্ত শাসনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্তের ধর্ম ঃ সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অপর ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকার বসুবন্ধু ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements) ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সমুদ্রগুপ্তই সমগ্র ভারতে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা এবং রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়াই স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ভারতের সনাতন দিগ্বিজয় আদর্শের মূর্তপ্রতীক ছিলেন এবং দিগ্বিজয়ী-রূপে তিনি বিশ্বের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দের অন্যতম।

ভারতের নেপোলিয়ন

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভারতে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়া ভারতে আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁহাকে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কারণেই সম্ভবতঃ তিনি 'বিক্রমাকে' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। শান্তি ও অহিংসার প্রতি অশোকের যেরূপ অনুরাগ ছিল যুদ্ধ ও পররাজ্য গ্রাসের প্রতি সমুদ্রগুপ্তের সেইরূপ আকর্ষণ ছিল।

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গঠন

সামরিক প্রতিভার সহিত তিনি কূটনীতিজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। আর্যাবর্তে তিনি দিগ্বিজয় নীতি অনুসরণ করিয়া এই অঞ্চলের সকল রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতেও তিনি সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতি মিত্রতামূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ দক্ষিণ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলির উপর নিরংকুশ আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়াই তিনি এই অঞ্চলের রাজন্যবর্গের আনুগত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার

কূটনৈতিক দূরদর্শিতা

পরিচায়ক। সীমান্ত রাজন্যবর্গের সম্পর্কেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা নহে তিনি একাধারে বিদ্যোৎসাহী, সুকবি, সুদক্ষ শাসক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার জন্য এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁহাকে 'কবিরাজ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি বহু কাব্য রচনা করিয়া সুধী সমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি বিদ্যা ও বিদ্বানদের পরম পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত আট রকমের মুদ্রায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় বৈদেশিক দেব-দেবীর স্থলে লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল। এক কথায় তাঁহার মুদ্রাগুলি বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল এবং তাঁহার সর্বভারতীয় মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা

শাসক হিসাবেও তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বৈদেশিক প্রভাব হইতে শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় রাজকর্মচারীদের উপাধি ক্ষমতা ও উহাদের পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুস্পষ্ট করা হইয়াছিল। উত্তর ভারতে মুসলমানদের অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে অব্যাহত ছিল।

ধর্মের দিক দিয়াও তিনি ছিলেন উদার। সিংহলরাজ মেঘবর্মণকে বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধমঠ নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধুকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করার ব্যাপারে তাঁহার পরধর্ম সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। বীর, বিদ্বান, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী ও সুশাসক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন।

পরধর্ম সহিষ্ণুতা

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৩ খৃষ্টাব্দ)

(Chandragupta II-Vikramaditya)

সিংহাসনারোহণ : সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী কে ছিলেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিকদের মতে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র কর্তৃক রচিত 'নাট্যদর্পণ' নামক নাটক হইতে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র

রামগুপ্ত বনাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

রামগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বিশাখদত্ত কর্তৃক রচিত 'দেবী-চন্দ্রগুপ্তম্' বাণভট্ট কর্তৃক রচিত 'হর্ষচরিত' এবং রামগুপ্তের নামাঙ্কিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর আলটেকর (Altekar) মন্তব্য করেন যে সমুদ্রগুপ্তের পর রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নহেন। রামগুপ্ত ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য শাসক, এই সুযোগে জনৈক শক রাজা রামগুপ্তকে পরাজিত করিয়া তাঁহার মহিষী ধ্রুবদেবীকে শক রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। রামগুপ্তের কনিষ্ঠভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া নারীর বেশ ধারণ করিয়া শক রাজার শিবিরে গমন করেন এবং শক রাজকে হত্যা করিয়া ধ্রুবদেবীকে উদ্ধার করেন। পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন এবং এই ধ্রুবদেবী ছিলেন প্রথম কুমার গুপ্ত ও গোবিন্দ গুপ্তের মাতা। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের (৮৭১ খৃষ্টাব্দ) 'সঞ্জন-অনুশাসন' লিপিতে উল্লিখিত আছে যে "জনৈক গুপ্ত যুবরাজ গুপ্তরাজকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও রাজমহিষীকে অধিকার করিয়াছিলেন"। কিন্তু সিলভা-লেভী প্রমুখ ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণও রামগুপ্তকে সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত সম্রাট বলিয়া মনে করেন।

রামগুপ্ত কর্তৃক সিংহাসন লাভের স্বপক্ষে আলটেকরের যুক্তি

ডক্টর মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিগণ উপরোক্ত ঘটনার ঐতিহাসিকতা অগ্রাহ্য করিয়া বলেন সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শক্তি এমন হীন হয় নাই যাহার সুযোগে জনৈক শক রাজা সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিতে পারেন বা তাঁহার মহিষীকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, মৌর্যদের ইতিহাস সম্পর্কে 'মুদ্রারাক্ষস' ও 'অশোকবদন' গ্রন্থগুলি যেরূপ নির্ভরযোগ্য 'দেবী চন্দ্রগুপ্তম' সেইরূপ নির্ভর-যোগ্য নহে। তৃতীয়তঃ, ডক্টর আলটেকর, সিলভা-লেভি প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অথর্ববেদ, 'ধর্মসূত্র', বশিষ্ঠ-অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়া বলেন যে বৈদিকযুগে বিধবা ভ্রাতৃবধু বিবাহ অবৈধ ছিল না, সুতরাং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক ভ্রাতৃবধু ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করা মোটেই অবৈধ বা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু অথর্ববেদ-যুগের ভারতীয় সামাজিক রীতি-নীতি ও গুপ্ত যুগের ভারতীয় সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং গুপ্তযুগে এইরূপ বিবাহ নিন্দনীয় ছিল। সুতরাং সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এইরূপ বিবাহ করিবেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না। চতুর্থতঃ, সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসন লিপিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মনোনয়নের কথা উল্লিখিত আছে।

আলটেকর লেভি প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতামতের বিরুদ্ধে ডক্টর মজুমদার প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতামত

সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে রামগুপ্ত নামে অপর কেহ সিংহাসন দখল করিতে পারেন এইরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পঞ্চমতঃ, গুপ্ত রাজগণের মুদ্রা ও অনুশাসন লিপিতে রামগুপ্ত নামে কোন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত রামগুপ্ত কোন স্থানীয় নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা ও 'গুপ্ত' উপাধির উপর নির্ভর করিয়া আলটেকর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত করেন।

উপরোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ডক্টর মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বিভিন্ন নামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিহিত হইতেন—যথা বিক্রমাদিত্য, নরেন্দ্র চন্দ্র, সিংহচন্দ্র, দেবরাজ, দেবশ্রী ইত্যাদি। তাঁহার মাতার নাম ছিল দত্ত বা দত্ত দেবী। তাঁহার দুই মহিষী, দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁহার মহিষীদের নাম ছিল ধ্রুবদেবী ও কুবের নাগ। তাঁহার দুই পুত্রের নাম ছিল কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত এবং কন্যার নাম ছিল প্রভাবতীগুপ্ত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরিচয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্বন্ধঃ গুপ্তরাজগণের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া স্বীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আর্যাবর্ত জয়ের পর গুপ্তরাজগণ অন্যান্য রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে এবং রাজ্য বিস্তার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত, শক, কুষাণ ও অন্যান্য রাজবংশের রাজকুমারীগণকে উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও স্বীয় সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মধ্যভারতের পারাক্রান্ত নাগ-বংশের রাজকন্যা কুবের নাগকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কন্যা প্রভাবতীকে বিদর্ভের বকাটক রাজ দ্বিতীয় রুদ্র-সেনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রুদ্রসেনের সহিত বৈবাহিত সম্পর্ক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক-গণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। সুতরাং রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুন্তলের কদম্ব-রাজ ককুতস্থবর্মণের অনুশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে গুপ্ত বংশে তাঁহার কন্যাদের বিবাহ হইয়াছিল। ভোজ ও ক্ষেমেন্দ্রের রচনা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কুন্তল-রাজের নিকট রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নাগ ও বকাটক বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

কদম্ববংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার (Conquests): দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার ন্যায় প্রতাপশালী শাসক ও পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব হইল সৌরাষ্ট্র অধিকার করিয়া আরব সাগর পর্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার করা। তিনি প্রথমে পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজা তৃতীয় রুদ্রসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই সময় শক রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলিতেছিল। জনৈক শক কর্মচারী শ্রীধরবর্মণ শক রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া মালবে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সবন্ততঃ শক রাজ্যের অপরাপর অঞ্চলেও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ চলিতেছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকরাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া উহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব-মালবে তিনি শিবির স্থাপন করিলেন। সাঁচী ও উদয়গিরির অনুশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে তিনি পূর্ব-মালবে তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনী, মন্ত্রিবর্গ, সেনাপতি ও করদ-মিত্ররাজগণকে সমবেত করিয়া শক-রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে কয়েক বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর পশ্চিম ভারতের শেষ শক রাজ তৃতীয় রুদ্রসেন পরাজিত হইয়া নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এইভাবে ভারতের শেষ শকবংশের অবসান ঘটিল। ইহার ফলে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল; গুপ্ত ভারতের সহিত পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহজ হইল এবং পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি বন্দর এবং গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটিল। শক বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

শক-শাসনের অবসান

ফলাফল

দিল্লীর কুতবমিনারের সন্নিকটে অবস্থিত বিখ্যাত লৌহ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্র নামে জনৈক রাজা "বঙ্গের নৃপতিবর্গের এক সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া বহ্লিক দেশ জয় করেন"। ঐতিহাসিক-দের মতে স্তম্ভে উল্লিখিত রাজা চন্দ্র ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি এবং এই যুগে তিনি ছাড়া অপর কোন রাজাই পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া রাজ্য জয় করেন নাই। মেরোলি লৌহ অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বঙ্গের নৃপতিবর্গের এক সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে সেই সময় 'বঙ্গ' বলিতে ভাগিরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বুঝাইত। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতটকে একটি প্রত্যন্ত রাজ্য ও সমুদ্রগুপ্তের প্রতি

বঙ্গজয়

অনুগত রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বাংলার কতিপয় নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিলে গুপ্ত-সম্রাট তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের উপর গুপ্ত-সাম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপিত হইয়াছিল।

বহ্লিক দেশ জয়

তিনি আফগানিস্থানের কুষাণগণের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সত্যই তিনি বহ্লিক দেশ জয় করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কুষাণগণের বিদ্রোহ দমন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সামরিক দিক দিয়া তিনি সাফল্য অর্জন করিলেও তাঁহার এই যুদ্ধাভিযানের ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

ধর্ম : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি অম্রকরদভ ছিলেন বৌদ্ধ।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements) : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৪১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন বীরযোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক। স্মিথের মত "একটি বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করার মত উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁহার ছিল"। তাঁহার রাজত্বকালেই গুপ্তসাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতের শক রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটাইয়া, এবং সমসাময়িক বকাটক, কদম্ব ও নাগ-বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁহার শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ছিল উদার ও জনকল্যাণমূলক। স্মিথের মতে "Probably India has never been governed better after the oriental manner than it was during the reign of Vikramaditya."

সামরিক প্রতিভা ছাড়াও তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী নরপতি। যদি কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি হন তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা ছিল একটি বিরাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য (The Vikramaditya of Legends) : অনেকে এইরূপ মনে করেন যে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন অভিন্ন। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য 'শকারি' ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভা কালিদাস প্রমুখ নবরত্ন কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শকক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে তাঁহার সভায় মহাকবি কালিদাস পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, তবে নবরত্নদের সকলেই যে তাঁহার রাজসভায় ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি অভিন্ন ?

সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে বিক্রমাদিত্য তাঁহার দুইটি রাজধানী পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী হইতে রাজ্য শাসন করিতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র এবং শকক্ষত্রপগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার সময় তিনি উজ্জয়িনীতে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য 'বিক্রম-সম্বৎ' নামে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন সম্বৎ প্রচলন করেন নাই এবং 'বিক্রম-সম্বৎ' যে বিক্রমাদিত্যই প্রবর্তন করিয়াছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ডক্টর মজুমদারের মতে "বিক্রম-সম্বৎ ও রাজা বিক্রমাদিত্যের যথার্থ পরিচয় ভারত ইতিহাসের একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন"।

যাহা হউক উপরোক্ত যুক্তির সমর্থনে অনেকে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণ (Fa-Hien's Accounts) : চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্থলপথে আগমন করিয়া জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিশটি দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি ভারতে অবস্থানকালীন ছয় বৎসর পরিভ্রমণ করেন এবং ছয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করা। ফা-হিয়েনের সহিত চারিজন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। ভারতে ফা-হিয়েন পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, বারাণসী, কপিলাবস্তু, বৈশালী ও পাটলিপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন এবং তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথে সিংহল হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

বিবরণী : ফা-হিয়েন তাঁহার বিবরণীতে চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ না করিলেও সেই সময়কার ভারতের অবস্থা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া

গিয়াছেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে দুইটি বৃহদাকার বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এই শহরে সমবেত হইতেন। পাটলিপুত্র নগরে অশোকের নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজ প্রসাদের কারুকার্য ও গঠন-নৈপুণ্য ফা-হিয়েনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পাটলিপুত্র নগরের নাগরিকদের স্বচ্ছল জীবন-যাপন ও উহাদের দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা তিনি করিয়াছেন। পথিকদের স্থবিধার জন্য রাজপথের স্থানে স্থানে সরাইখানা স্থাপিত ছিল। পাটলিপুত্র নগরে দরিদ্র ও দুঃস্থ রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু অনাথ আশ্রম ছিল।

পাটলিপুত্র

ফা-হিয়েন বলেন গয়া নগরটি সেই সময় ছিল একরূপ জনশূন্য। বুদ্ধ-গয়া ছিল জঙ্গল দ্বারা পরিবৃত। শ্রাবস্তী নগরটিও ছিল জনশূন্য এবং ফা-হিয়েনের মতে মাত্র দুইশত পরিবার এই নগরে বাস করিত। কপিলাবস্তু ও কুশীনগরও ছিল জনশূন্য—মাত্র অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই দুইটি নগরে বাস করিত। দেশের জনাকীর্ণ নগরগুলির মধ্যে উজ্জয়িনী ছিল অন্যতম।

অন্যান্য শহর

মধ্যদেশের জীবনযাত্রা: মথুরার দক্ষিণাঞ্চলকে ফা-হিয়েন মধ্যদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল প্রবল। এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা ছিল স্থনিয়ন্ত্রিত ও জন সাধারণ ছিল স্থখী ও সমৃদ্ধ। একমাত্র চণ্ডাল ব্যতীত এই অঞ্চলের জনসাধারণ ছিল নিরামিশভোজী এবং অহিংসা নীতির অনুরাগী। দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল না এবং জনসাধারণ শান্তিতে জীবনযাপন করিত। চণ্ডালগণ ছিল অস্পৃশ্য।

সর্বত্র ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হইত এবং উহাদের অহারের ও বসবাসের বন্দোবস্ত করা হইত। জনহিতকর কার্য ও মন্দির-মঠ নির্মণের ব্যাপারে বিত্তশালীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত।

ধর্ম: গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী হইলেও অপর ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ-করিতেন। ফা-হিয়েনের বিবরণী অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু মধ্য দেশে হিন্দুধর্মই প্রধান ছিল। কোথাও ধর্ম উৎপীড়ন চলিত না এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

গুপ্ত শাসন প্রণালী: ফা-হিয়েনের বিবরণীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ বর্ণনা না থাকিলেও ইহাতে গুপ্ত-শাসন প্রণালীর বিবরণ রহিয়াছে। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা ছিল স্থনিয়ন্ত্রিত। দায়িত্বশীল রাজকর্মচারীগণ

কর্তৃক দেশ শাসিত হইত। শাসক শ্রেণী কর্তৃক জনসাধারণ নির্যাতিত হইত না। দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ ছিল না। উৎপন্ন শস্যের এক নির্দিষ্ট অংশ রাজকর রূপে ধার্য হইত। দণ্ডবিধির কোনরূপ কঠোরতা ছিল না। সাধারণ অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড করা হইত। কেবল রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। কোন অপরাধেই প্রাণদণ্ড ছিল না বলিলেই চলে। রাজকর্মচারী ও রাজার দেহরক্ষীগণ উপযুক্ত বেতন পাইতেন।

নৌবল ও বাণিজ্য ঃ ফা-হিয়েনের বিবরণীতে গুপ্ত রাজগণের নৌবল ও বাণিজ্যতরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুগে পূর্ব উপকূলে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সোপারক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ও বন্দর ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে ভারতীয় বণিকগণ সিংহল ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিত।

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ
(The Later Guptas)

কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য—৪১৪-৪৫৫ খৃষ্টাব্দ (Kumar Gupta I) ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪১৪ হইতে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুমারগুপ্তের দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিল। অনন্ত দেবীর পুত্র ছিলেন পুরগুপ্ত এবং দেবকীর পুত্র ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও গৌরব তিনি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে পুণ্ড্রবর্ধন ভূক্তি ও পূর্ব-মালবের শাসনভার যথাক্রমে চিরতদত্ত ও যুবরাজ ঘটোৎকচ গুপ্তের হস্তে ন্যস্ত ছিল। বন্ধুবর্মন নামে অপর এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার হস্তে দাসপুরের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে তিনি কোন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন কিনা। তাঁহার রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য উত্তর-বঙ্গ হইতে সৌরাষ্ট্র ও হিমালয় হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার আমলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সর্বত্র ধর্ম-সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং বহু দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

কুমারগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। হূণ ও অন্যান্য আক্রমণকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে গুপ্ত সম্রাটদের সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমার গুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে নর্মদা উপত্যকার অধিবাসী পুষ্যমিত্র নামে এক দুর্ধর্ষ উপজাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাদের নেতা ছিলেন নরেন্দ্র সেন। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত বিপুল বিক্রমে ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সুনিশ্চিত ধ্বংস হইতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। সাম্রাজ্যের শান্তি সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করার পূর্বেই কুমার গুপ্ত পরলোক গমন করেন।

স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য—৪৫৫-৪৬৭ খৃষ্টাব্দ (Skanda Gupta): অনেকে কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত-বংশের উত্তরাধিকার বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারগুপ্তের প্রধানা মহিষীর পুত্র ছিলেন পুরগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত ছিলেন কুমার গুপ্তের দ্বিতীয়া মহিষীর পুত্র। সম্ভবতঃ এই কারণেই সিংহাসনের উপর স্কন্দগুপ্ত অপেক্ষা পুরাগুপ্তের দাবি ছিল অধিক। সুতরাং কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন কিন্তু শীঘ্রই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্কন্দগুপ্ত পুরগুপ্তকে পরাস্ত করিয়া এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আর্যমঞ্জুরী-শ্রী-মূলকল্প' নামক গ্রন্থে স্কন্দগুপ্তকেই কুমারগুপ্তের উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।*

সিংহাসন লাভ

স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত-বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা। সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরেই স্কন্দগুপ্তকে হূণ জাতির আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 'ভিতরী স্তম্ভলিপি'তে হূণগণের সহিত স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে প্রবল হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়াছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সোমদেব কর্তৃক রচিত 'কথা-স্মৃতি-সাগর' নামক গ্রন্থে ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের জয়লাভের উল্লেখ পাওয়া যায়। হূণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের জয়লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে শুধু যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা পাইয়াছিল এমন নহে, সমগ্র ভারত এক ভয়ানক বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ডক্টর (আর, কে,) মুখার্জীর মতে "স্কন্দগুপ্তকে দিগ্বিজয়ী বীর বলা যাইতে পারে। তাঁহার হূণ-যুদ্ধকে 'ধর্ম বিজয়'

হূণদের সহিত যুদ্ধ

যুদ্ধের গুরুত্ব

* কুমারগুপ্তের ভিতরী-সীল (Bhitari Seal)-এ পুরগুপ্তকেই কুমার গুপ্তের উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এ্যালেন, স্মিথ, রায়চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে স্কন্দগুপ্ত নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে যথাক্রমে পুরগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত ও কুমার গুপ্ত (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহন করেন। ডক্টর ভাণ্ডারকরের মতে পুরগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্ত ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। আবার অনেকের মতে কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্তের মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্য বণ্টিত হইয়াছিল।

নামে অভিহিত করা যাইতে পারে কারণ তিনি পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া উহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

পশ্চিমে কাথিয়াবাড় হইতে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর স্কন্দগুপ্ত স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও মালব তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

স্কন্দগুপ্ত ছিলেন 'ভগবৎ' ধর্মের অনুরাগী। কিন্তু তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। তাঁহার কর্মচারী ও মন্ত্রিগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।

ধর্ম

'আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' নামক গ্রন্থের সমর্থনে ডক্টর (কে, পি,) জয়স্বাল স্কন্দগুপ্তকে "শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে গুপ্ত-সম্রাটগণের মধ্যে স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এশিয়া ও ইওরোপে তিনিই ছিলেন একমাত্র যোদ্ধা যিনি দুর্ধর্ষ ও বর্বর হূণগণকে সাফল্যের সহিত পরাজিত করিয়াছিলেন।

জয়স্বালের মন্তব্য

স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীগণ (Successors of Skanda Gupta): স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীগণের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। প্রথম দুইজন দুর্বল রাজার পর (পুরগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত) এই বংশের অপর শক্তিশালী রাজা ছিলেন বধুগুপ্ত। তিনি সম্ভবতঃ ৫০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। বধুগুপ্তের সাম্রাজ্য বাংলাদেশ হইতে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে একাধিক গুপ্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক ইতিহাস বা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে মৌখারীগণের দ্বারা এই বংশের অবসান ঘটে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব ভারতে আদিত্য সেন নামে এক গুপ্তরাজা কর্তৃক গুপ্ত-সাম্রাজ্য ক্ষণকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

(Administration of the Imperial Guptas)

তথ্যাদি (Sources): গুপ্তযুগের শিলালিপি, মুদ্রা ও ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে এই যুগের শাসন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা: রাজতন্ত্র ছিল এই যুগের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভু। গুপ্ত সম্রাটগণ দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা 'মহারাজাধিরাজ', 'অচিন্ত্যপুরুষ', 'পরমরাজাধিরাজ', 'পৃথিপাল', 'পরমেশ্বর', 'সম্রাট'—প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে কুবের, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি

দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী

দেবতাদের সমতুল্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইস্থানে মৌর্যরাজগণের সহিত গুপ্তরাজগণের মর্যাদার পার্থক্য দেখা যায়। মৌর্যরাজগণ দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং দেব উপাধিও ধারণ করিতেন না। তবে মৌর্যবংশের ন্যায় গুপ্তবংশেও রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক।

রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। তিনি ছিলেন সামরিক, বিচার ও শাসন বিভাগের সর্বময় প্রভু। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজার। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, আইন প্রনয়ণ ও যুদ্ধ পরিচালনা করাও ছিল রাজার অন্যতম দায়িত্ব। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত ইঁহারা প্রত্যেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীগণ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহারা সম্রাটের নিকটই দায়ী থাকিতেন।

রাজার দায়িত্ব

সকল ক্ষমতার অধিকারী হইলেও গুপ্ত সম্রাটগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। রাজকার্যের সুবিধার জন্য বহু কর্মচারী ও মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিতেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলির হস্তে বহুবিধ ক্ষমতা অর্পিত থাকিত। রাজা এইগুলির কার্যে সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এতদ্ভিন্ন প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন ও জনপ্রিয়তা অর্জনের নিমিত্ত গুপ্তরাজগণ সর্বদাই সজাগ থাকিতেন।

রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন

কেন্দ্রীয় শাসন : সম্রাট সর্বদা নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন না। শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সম্ভবতঃ রাজপুত্র, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সামন্তগণকে লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ছিল। কালিদাসও মন্ত্রি-পরিষদের উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনা অনুসারে কঞ্চুকী (chamberlain) নামে জনৈক কর্মচারী রাজা ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অমাত্য নামে কর্মচারীর মাধ্যমে রাজার নিকট পেশ করা হইত। অবশ্য চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র রাজারই ছিল। মন্ত্রিপরিষদের কর্তব্য ছিল রাজাকে পরামর্শ দান করা। অবশ্য রাজার আদেশ গ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ বাধ্য থাকিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ নাবালক রাজার অভিভাবক হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিত। মৌর্য-যুগের ন্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই যুগে ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপিতে 'সভ্য' কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহারা কোন মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

মন্ত্রিপরিষদ

মন্ত্রী

গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ ছাড়াও বহু মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস তিন প্রকারের মন্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী, রাজস্ব-মন্ত্রী ও বিচার মন্ত্রী। কাহারো কাহারো মতে এই তিন প্রকারের মন্ত্রী ও যুবরাজকে লইয়া এই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইত। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মন্ত্রিপদ কোন কোন ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ছিল। শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রিগণের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সরকারী দলিল-পত্রের সংরক্ষক মন্ত্রী ছিলেন অন্যতম।

বে-সামরিক কর্মচারীবৃন্দ

শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বহু উচ্চপদস্থ বে-সামরিক (civil-officer) কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে 'রাজপুরুষ' 'রাজনায়ক' 'রাজপুত্র', 'রাজামাত্য', 'মহাসামন্ত', মহাপ্রতিহার', 'মহাধর্মাধ্যক্ষ', 'অজ্ঞসঞ্চারিক',—প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহাপ্রতিহারের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীদের তত্ত্বাবধান করা। রাজামাত্য সম্ভবতঃ রাজার পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত থাকিতেন। অজ্ঞসঞ্চারিকগণ রাজার আদেশ কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা রাজার সভাসদ হিসাবে রাজদরবারেও উপস্থিত থাকিতেন।

রাজস্ব ও পুলিশ-কর্মচারী

গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব ও পুলিশ বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না। এই দুইটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মচারীগণ ছিলেন 'উপরিক', 'দশপরধিক', 'দণ্ডিক', 'গৌলমিক', 'কোট্টপাল', 'অঙ্গরক্ষ', 'রাজুক', ইত্যাদি। উপরিকের যথার্থ দায়িত্ব সম্পর্কে মতভেদ আছে। স্কন্দগুপ্তের বিহার স্তম্ভ-লিপিতে উপরিকের স্থান 'কুমারামাত্যের' উপরে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য শিলালিপিতে কুমারামাত্যের নিম্নে উপরিকের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে উপরিক ছিলেন "নগর-শাসকদের সভাপতি"। আবার কাহারো মতে উপরিক ছিলেন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট।

বিচারালয় ও বিচারকগণ

বিচার ব্যবস্থা: রাজা বা সম্রাট স্বয়ং বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণও বিচরকার্যে অংশ অংশ করিতেন। জেলাবিচারকগণ বিচারকার্যের ব্যাপারে বণিক সম্প্রদায় ও কর্মচারী শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে 'শেঠ' ও কায়স্থ-গণের সাহায্যলাভ করিতেন। গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্যসভার প্রতিনিধিগণের সাহায্যে রাজকর্মচারীগণ বিচার কার্য সম্পাদন করিতেন। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জুরী প্রথার প্রচলন ছিল।

ফা-হিয়েনের মতে গুপ্তযুগে দণ্ডপ্রথা ছিল উদার এবং প্রাণদণ্ড বা দৈহিক

শাস্তির কথা ছিল না বলিলেই চলে। অর্থদণ্ডই ছিল সাধারণ দণ্ডবিধি। কেবলমাত্র রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। কিন্তু ফা-হিয়েনের এই বিবরণ যথার্থ নহে। মৌর্যযুগের ন্যায় গুপ্ত যুগেও দণ্ডপ্রথা কঠোর ছিল। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে চুরির অপরাধে কেহ ধরা পড়িলে অপরাধীকে রক্ষীণ নামক এক শ্রেণীর রক্ষীদের হস্তে সমর্পন করা হইত। ইহারা চুরির ব্যাপারে তদন্ত করিত। 'মুদ্রারাক্ষস' নামক গ্রন্থে প্রাণদণ্ডের ও বধ্যস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর চক্ষু-উৎপাটন করিবার ও কোন কোন ক্ষেত্রে হাতীর পায়ের নীচে পিষিয়া মারিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় প্রস্তর লিপিতে নিষ্ঠুর শাস্তিদানের উল্লেখ আছে। শাস্তিদানের পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে শাস্তি সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করা।

দণ্ড-প্রথা

সামরিক সংগঠন: প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত সকল গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবাদী। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সাম্রাজ্য বিস্তার গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির সাক্ষ্য বহন করে। পূর্ববর্তী নৃপতিগণের ন্যায় গুপ্ত সম্রাটগণের সামরিক বাহিনী পদাতিক ও অশ্ব-বাহিনী, হস্তীবাহিনী ও নৌবাহিনী লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ছাড়া সামন্ত রাজন্যবর্গও যুদ্ধের সময় গুপ্ত সম্রাটগণকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। বে-সামরিক বিভাগের ন্যায় সামরিক বিভাগেও উচ্চ ও নিম্ন এই দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে 'মহাদণ্ড-নায়ক' (প্রধান সমর সেনাপতি), 'মহাসন্ধি-বিগ্রহিক' (যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের মন্ত্রী) 'মহাসেনাপতি' (সমর সেনাপতি) মহাবালাধিকৃত (উচ্চ সেনাপতি) প্রভৃতি ছিলেন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য ছিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থল বাহিনী প্রধাণতঃ তিনটি পৃথক বিভাগ লইয়া গঠিত ছিল যথা,—পদাতিক, অশ্ববাহিনী ও হস্তী-বাহিনী। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীতে বংশানুক্রমিক সৈন্যবাহিনীর (মৌল) ও সামন্ত বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটগণের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, তরবারী, কুঠার ও বর্শা ইত্যাদি।

গুপ্ত-বাহিনীর সংগঠন

সামরিক কর্মচারীবৃন্দ

স্থল বাহিনীর সংগঠন

যুদ্ধাস্ত্র

মৌর্য সম্রাটদের ন্যায় গুপ্ত সম্রাটদেরও একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। পশ্চিম ও পূর্ব উভয় উপকূলেই গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং নৌযুদ্ধেও গুপ্ত সম্রাটগণকে যে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল এমন অনুমান করা যায়। এলাহাবাদ গুপ্ত-লিপি হইতে জানা

নৌ-বাহিনী

যায় যে সিংহল ও অন্যান্য বহু দ্বীপপুঞ্জের উপর সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা যে একমাত্র নৌশক্তির সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অবশ্য গুপ্ত সম্রাটদের নৌবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

প্রাদেশিক শাসন ঃ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গুপ্ত-সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল যথা, 'ভুক্তি' 'দেশ', 'রাষ্ট্র', ও 'মণ্ডল'। উত্তরাঞ্চলে 'ভুক্তি' ছিল সাধারণ বিভাগ। দক্ষিণাঞ্চলে 'মণ্ডল' ছিল সাধারণ বিভাগ। ভুক্তি কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল শাসন বিভাগের সর্ব নিম্ন অঙ্গ। দক্ষিণাঞ্চলের মণ্ডলগুলি কতকগুলি 'নাড়ু' ও কোট্টম'-এ বিভক্ত ছিল।

সাম্রাজ্যের বিভাগে দেশ, ভুক্তি বিষয় মণ্ডল ইত্যাদি

'দেশ' সমূহের মধ্যে সৌরাষ্ট্র, সুকুলিদেশ, এবং 'ভুক্তি' সমূহের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি, তীরভুক্তি ও শ্রাবস্তিভুক্তি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশের ও ভুক্তির শাসনভার যথাক্রমে গোপত্রি ও উপরিক মহারাজ নামক উপাধিধারী শাসকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। কখন কখন দেশের শাসনভার রাজবংশীয় কুমারগণের হস্তেও ন্যস্ত থাকিত। ইহারা 'মহারাজপুত্র-দেবভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করিতেন। জেলা বা বিষয়ের শাসক ছিলেন, বিষয়-পতি অথবা আয়ুক্ত। বিষয়পতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সম্রাটের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতেন। বিষয়পতিগণকে সাহায্য করার জন্য 'নগর শ্রেষ্ঠী', 'কুলিক', 'স্বার্থবাহ', 'প্রধান-কায়স্থ' প্রভৃতি উপাধিধারী কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' উপাধিধারী কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। গ্রাম্য-সভার সহায়তায় রাজ-কর্মচারীগণ গ্রামের বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন।

প্রাদেশিক কর্মচারী-বৃন্দ

রাজস্ব ঃ উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। ইহাকে 'ভাগ' বলা হইত। এতদ্ভিন্ন খেয়া, শুল্ক, খনি, রাজার খাস ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি হইতেও যথেষ্ট আয় হইত। কখনও কখনও সরকারী কার্যের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথাকে বলা হইত 'বিষ্টি'। কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর আদায়ের রীতিও প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ যুদ্ধ বা বৈদেশিক আক্রমণের সময় অতিরিক্ত কর আদায় করা হইত। ইহাকে বলা হইত 'মল্ল-কর'। স্থানীয় কর্তৃপক্ষও অনেক সময় অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন।

'ভাগ' মল্ল-কর

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ঃ গুপ্তযুগে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে জনবহুল নগরসমূহে 'নিগম-সভা' নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠান পৌরশাসনকার্য পরিচালনা করিত। 'নগর-শ্রেষ্ঠী', 'পুস্তপাল', 'সার্থবাহ'-

নগর ঃ নিগম সভা

প্রভৃতি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া 'নিগম-সভা' গঠিত হইত। নগর শাসনব্যবস্থার প্রধানকে 'পুরপাল' বা 'নগর-রক্ষক' বলা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে 'পুরপাল-উপরিক' উপাধিধারী কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি কতকগুলি নগর-পুরপালদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। 'অবস্থিক' নামক কর্মচারী নগরের ধর্মশাসনগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন। গ্রামগুলি ছিল অনেকক্ষেত্রে স্বয়ং-শাসিত। 'গ্রামিক' নামক কর্মচারী গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের পরামর্শ অনুসারে গ্রামের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিতেন।

পুরপাল, পুরপাল-উপরিক

অবস্থিক

গ্রাম

গুপ্তশাসনের প্রকৃতি (Nature of Gupta Rule) ঃ গুপ্ত শাসনে কোনরূপ মৌলিকতার নিদর্শন অস্বীকার করিলেও উহা যে জনকল্যাণমূলক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। *পূর্ববর্তীকালের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও শাসন-নীতির ভিত্তির উপর গুপ্ত শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমসাময়িক যুগের প্রয়োজনানুসারে পূর্ববর্তীকালের শাসন প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। রাজা, মন্ত্রী, পরিষদ, সভা, কেন্দ্র, প্রদেশ ও গ্রামে নিযুক্ত অসংখ্য রাজকর্মচারী, উহাদের বিভিন্ন দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবেচনা করিলে গুপ্ত শাসনের বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়। জন সাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করাই ছিল গুপ্তশাসনের প্রধান লক্ষ্য। রাজা সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও কখনও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না এবং বস্তুতঃ গুপ্তরাজগণের স্বেচ্ছাচারীতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইদিক দিয়া গুপ্তরাজগণ পরবর্তী মৌর্য রাজগণের তুলনায় অধিক উদার ও উন্নত ছিলেন। রাজা অধিকাংশ ব্যাপারেই মন্ত্রী ও উচ্চ-রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেন।

মৌলিকতার অভাব

গুপ্ত শাসনের বিশালতা

জনকল্যাণ মূলক আদর্শ

---

* ঐতিহাসিক আর-ডি-ব্যানার্জি গুপ্ত-শাসনের মৌলিকতা স্বীকার করিয়া বলেন যে "গুপ্ত রাজগণের অনুশাসন লিপিতে কোথাও মৌর্যযুগে ব্যবহৃত সরকারী কর্মচারী ও সরকারী পদবী ও শব্দের কোন উল্লেখ নাই। "কিন্তু এই মত যথার্থ নহে। কৌটিল্যের সময় প্রচলিত 'কুমারামাত্য', 'মহাদণ্ডনায়ক', 'সন্ধি-বিগ্রহিক প্রভৃতি উপাধিধারী কর্মচারীদের উল্লেখ এলাহাবাদ গুপ্ত-লিপিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে প্রচলিত 'গ্রামিক', 'গ্রাম', 'বিষয়', 'নগর', 'অধিকর্ণ' প্রভৃতি কর্মচারী ও শাসনবিভাগের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সুতরাং মৌর্য-শাসনের অনেক নিদর্শন গুপ্তশাসনেও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কুষাণ-আমলে প্রচলিত কর্মচারীদের উপাধিগুলিও গুপ্ত-আমলে প্রচলিত দেখা যায়। সুতরাং পূর্ববর্তী যুগের শাসন-প্রণালীর দ্বারা গুপ্তশাসন প্রণালী যে প্রভাবতি হইয়াছিল—একথা অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সুদক্ষ শাসন

এই যুগেই ভারতের এক বিশাল অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদের ফলে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল এবং ভারতে এক শক্তিশালী ও সুপরিচালিত শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই যুগেই ভারতে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। সামরিক ও বে-সামরিক শাসনের পুনঃ-সংস্কার ঘটিয়াছিল এবং সর্বত্র অরাজকতার অবসান ঘটিয়াছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন

গুপ্ত যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার ঘটিয়াছিল। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পশ্চিমী ক্ষত্রপগণের দমনের পর। পশ্চিম উপকূলে স্বর্ণ মুদ্রার আবিষ্কার ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসার

এই যুগে ভারতের সংস্কৃতিক ও উপনিবেশিক প্রসার ঘটিয়াছিল। চীন, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসার ঘটিয়াছিল এবং ইহার ফলে বৃহত্তর ভারতের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। স্মিথের মতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ফলেই গুপ্ত-যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির চরম বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল।

সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা

গুপ্ত-শাসনের ব্যাপক প্রভাব

শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান

স্বায়ত্ত শাসনের প্রচলন

ধর্মীয় উদারতা সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে গুপ্ত-শাসন প্রণালী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার ছিল সুদক্ষ এবং জেলা ও গ্রাম্য-শাসনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রের প্রতিটি শাসন বিভাগের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ প্রভাব বিস্তার পূর্ববর্তী যুগে দেখা যায় না। গুপ্তশাসনের ইহা হইল একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহুদিন যাবৎ গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ছিল উদার ও মানবধর্মী। শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে জনসাধারণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধিকারী হইত। বস্তুতঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন গুপ্ত শাসনের এক অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে বিচারের জন্য জনসাধারণকে রাজকীয় বিচারালয়ে যাইতে হইত না এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিও রেজেষ্ট্রী করিতে হইত না। জনসাধারণের প্রাণ ও বিষয়-সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্পর্কে রাজকর্মচারীগণ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ধর্মবিষয়ে উদারতা এবং সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা গুপ্ত-শাসনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং ইহা হইল গুপ্ত-শাসনের অপর বৈশিষ্ট্য।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন
(Down fall of the Gupta Empire)

সমুদ্র গুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সামরিক প্রতিভার বলে মগধকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উহার পতন শুরু হইতে থাকে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। নিম্নলিখিত কারণে সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল :—

(১) **পুষ্যমিত্র ও হূণজাতির আক্রমণ:** বৈদেশিক আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্তের রাজত্ব-কালে পুষ্যমিত্র ও হূণগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্রগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি অনতিকাল মধ্যে হূণ-জাতির আক্রমণ সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল। অনেকের মতে হূণ-আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ। কিন্তু ডক্টর (আর, সি,) মজুমদার এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে তোরামন ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণগণ কাশ্মীর ও আফগানিস্থান দখল করিলেও ভারতের অভ্যন্তরে উহারা কোনরূপ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই। ডক্টর মজুমদারের মতে হূণদের আক্রমণ অপেক্ষা যশোধর্মনের ন্যায় শক্তিশালী স্থানীয় নৃপতিগণের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। হূণ-আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল।

(২) **প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা:** বৈদেশিক আক্রমণ হেতু আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা-গণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যেমন মালবের যশোধর্মণ, মালবের মৈত্রকগণ ও কণৌজের মৌখারীগণ। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বাংলা দেশও গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটগণের এমন শক্তি ছিল না যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে দমন করিয়া সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিতে পারেন।

গুপ্তরাজগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা: স্কন্দগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে গুপ্ত-রাজবংশে সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছিল তাহা পরবর্তীকালেও চলিতে থাকে। ফলে স্কন্দগুপ্তের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। একই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্ত-উপাধিধারী রাজন্যগণের শাসনের উল্লেখ

পাওয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের পর পুরগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তই ছিলেন উল্লেখযোগ্য গুপ্ত সম্রাট। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটদের অকর্মণ্যতা ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে দমন করিবার বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার মত উপযোগী শক্তি পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের ছিল না।

(৪) **বৌদ্ধধর্মের প্রতি গুপ্তরাজগণের অনুরাগ ঃ** পূর্ববর্তী গুপ্তরাজগণ ছিলেন হিন্দুধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং সমর নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু পরবর্তী গুপ্তরাজগণের অনেকেই (যেমন বুধগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত, বালাদিত্য প্রভৃতি) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী গুপ্ত রাজগণের ধর্ম পরিবর্তন মৌর্যসাম্রাজ্যের ন্যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে হূণ-নেতা মিহিরকুল গুপ্তরাজ বালাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে গুপ্তরাজ যুদ্ধ করার পরিবর্তে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। * কথিত আছে যে মিহিরকুল পরাজিত হইয়া বন্দী হইলে মন্ত্রীসভার অনুরোধে বালাদিত্য বন্দী শত্রুকে মুক্ত করিয়া দেন। শত্রুর প্রতি এইরূপ উদারতা গুপ্তরাজগণের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় বহন করে।

গুপ্ত-সভ্যতা (Gupta Civilisation)

(ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ)

"The Gupta period is in the annals of classical India almost what the Periclean age is in the history of Greece".

ভারতের ইতিহাসে গুপ্তশাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। দুইশত বৎসর ব্যাপী গুপ্ত শাসনকালে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণের সামরিক প্রতিভাবলে যেমন একদিকে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ও ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে তাঁহাদের সুদক্ষ শাসনগুণে দেশের নিরাপত্তা বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার হেতু ভারতের অর্থনৈতিক মান উন্নত হইয়াছিল। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের উৎকর্ষতা এই যুগকে একটি বৈশিষ্ট্য

গুপ্তযুগের সহিত পেরিক্লিসের যুগের তুলনা

* হূণ আক্রমণ সংক্রান্ত মতবাদ বালাদিত্যের উক্তি ঃ—আমি জানি দুর্বৃত্তগণ (হূণ) আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু মন্ত্রীদের অনুমতি ভিন্ন আমি উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমি জলা জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করি।

দান করিয়াছে। ঐতিহাসিক বার্নেট (Barnett) গুপ্তযুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতকে পেরিক্লিস এথেন্সের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় এথেন্সের সামরিক শক্তি, আর্থিক সম্পদ ও শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সে জন্মলাভ করিয়াছিলেন যথা ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ নাট্যকার, ভাস্কর ফিডিয়াস ও স্থপতি ইক্টিনাস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া পেরিক্লিসের যুগকে যেমন গ্রীক ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলা হয় তেমনি গুপ্তযুগকেও ভারত ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলা হইয়া থাকে।

রাজনৈতিক ঐক্য ও সুদক্ষ শাসন: কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত ভারতে কোন সার্বভৌম রাজশক্তির অভ্যুত্থান ঘটে নাই। পশ্চিম পাঞ্জাবে কুষাণগণ, গুজরাট ও মালবে শকগণ এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সকল রাজ্যগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ রাজনৈতিক অনৈক্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই স্মিথ মন্তব্য করিয়াছেন "India was divided into a large number of independent states whose varying fortunes and mutual struggles; it is not possible to ennumerate in any detail." এইরূপ অবস্থায় গুপ্তরাজগণের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাইয়া গুপ্তরাজগণ এক সর্বভারতীয় সার্বভৌম রাজশক্তি ও উন্নত ধরণের সভ্যতার সৌধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত গুপ্তরাজগণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যদিও উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাঁহারা স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। গুপ্তরাজগণের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একে একে পহ্লব, কুষাণ ও শক-রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপিত হয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

গুপ্তরাজগণের কৃতিত্ব শুধু রাজ্যবিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে গুপ্ত-শাসন প্রণালী ছিল উন্নত, দণ্ডবিধি ও ধর্মনীতি ছিল উদার। গুপ্তরাজগণ সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও ছিলেন প্রজা-হিতৈষী এবং তাঁহাদের প্রজাহিতৈষণা বৈদেশিক পর্যটক ও গ্রন্থকারদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রচলন হেতু দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

অর্থনৈতিক উৎকর্ষ : মুদ্রা, লিপি ও ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুগে ভারতের সর্বত্র বহু নগরীর প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। ফা-হিয়েনের বর্ণনা অনুসারে মগধ ছিল এক সমৃদ্ধ দেশ এবং ইহার নগরগুলি ছিল সুসজ্জিত ও জনসাধারণ ছিল সমৃদ্ধ। এই যুগের অন্যান্য নগরগুলির মধ্যে ইন্দ্রপুর, চন্দ্রপুর, অযোধ্যা ও পাটলিপুত্র ছিল অন্যতম। নগরগুলির পরিকল্পনা ও সেগুলির জনকল্যাণমূলক কার্যাদির বর্ণনা হইতে যথাক্রমে শিল্পকলার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আভাষ পাওয়া যায়।

নগর

গুপ্তযুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূলভিত্তি। কৃষির উন্নয়নের প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি ছিল। এই যুগের গ্রন্থাদিতে ৬৪ রকমের শিল্পের উল্লেখ আছে। এই গুলির মধ্যে ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, লৌহশিল্প প্রভৃতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লী ও ধর-এ অবস্থিত লৌহ স্তম্ভ দুইটি এই যুগেই নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহা লৌহ শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। আভ্যন্তরীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিগম প্রতিষ্ঠানগুলি (guilds) গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। কোথাও নিগমগুলি কতকগুলি বৃত্তিমূলক (Craft-guild) শিল্পীগণকে লইয়া বিশেষ একটি শিল্পোৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকিত। আবার কোথাও বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণকে লইয়া—যথা, শ্রেষ্ঠী (Bankers), 'সার্থবাহ' (Sarthavaha) ও 'বণিক' (Kulika) এগুলি গঠিত হইত। এই মিশ্রিত নিগমগুলি অনেকটা আধুনিক কালের চেম্বার-অফ-কমার্স-এর (Chamber of Commerce) কার্য করিত। দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিগমগুলির পরিচালনাধীন ছিল। প্রত্যেকটি নিগম প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব 'সভাপতি' বা শ্রেষ্ঠী থাকিতেন। সমৃদ্ধশালী বণিক ও ব্যবসায়ীগণ স্থানীয় শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করিতেন। কোটিবর্ষের 'বিষয়াপতি'—বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকগণকে লইয়া গঠিত একটি 'পরামর্শক সভা'-র (Board of Advisers) সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

কৃষি ও শিল্প

সেই যুগে ব্যাংক-এরও (Bank) উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈশালী, কোটিবর্ষ প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ব্যাংকগুলি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। নিগমগুলিই ব্যাংক-এর কার্য করিত, নগদ অর্থ বা সম্পত্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমানত, ('অক্ষয়-নিধি') রাখিত। স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রলিপিতে নিগম প্রতিষ্ঠানের হস্তে মন্দিরের সম্পত্তি জমানত রাখিবার কথা উল্লিখিত আছে।

ব্যাংক

গুপ্ত যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণ-মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

মুদ্রা

গুপ্তযুগে সামুদ্রিক বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নত ছিল। সৌরাষ্ট্র প্রদেশ ও আরব-সাগরের উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই যুগের বন্দরগুলির মধ্যে তাম্রলিপ্ত, কয়াল, ব্রোচ, সোপারা, কল্যাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলপথে ব্রহ্মদেশ, মালয়, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের সহিত এবং স্থলপথে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত। বর্হিবিশ্বের সহিত পণ্য বিনিময়ের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক মান পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপর দিকে এই বাণিজ্যপথ ধরিয়াই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

সামুদ্রিক বাণিজ্য

সামাজিক অবস্থা : গুপ্তযুগে হিন্দু সমাজ চারিটি বর্ণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। 'চতুরাশ্রম' প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল যথা,—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস বা যতি-আশ্রম। রাজা ছিলেন প্রধান সমাজপতি। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সংমিশ্রণ (বর্ণসংকর) প্রতিরোধ করা তাঁহার কর্তব্য ছিল। বর্ণ-সংমিশ্রণ বা ধর্মদ্বেষ প্রতিরোধ করা প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

চারিবর্ণ

চতুরাশ্রম

সমাজে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেন এবং তাঁহাদের কর্তব্য ও আদর্শ সুনির্দিষ্ট ছিল। পূজা-পার্বণ, তপস্যা ও বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ব্যাপারেই তাঁহারা সর্বদা নিয়োজিত থাকিবেন। ব্রাহ্মণগণকে অর্থ ও সম্পত্তি দান করার প্রথা সেই যুগে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। জৈন সামন্ত ও নৃপতিগণও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। রাজপরিবারেও ব্রাহ্মণ আচার্যগণ নিযুক্ত থাকিতেন। এই যুগে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও গ্রন্থকারগণেরও বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ

সমাজে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হইলেও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। গুপ্ত রাজপরিবারে বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে একমাত্র রাজার প্রধানা মহিষী অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারিণী হইতেন।

বিবাহ

সেযুগে স্ত্রী-ধনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং নারীগণ ইচ্ছামত দান করিতে পারিতেন। সমাজে সতী প্রথা প্রচলিত ছিল এবং নারী শিক্ষারও বহুল প্রচলন ছিল। নারী শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত

নারী সমাজ

পরিবারের নারীগণই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করিত। নারী স্বাধীনতা সেই যুগের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিলাস-ব্যসন

বিত্তশালীগণ বিলাস-ব্যসনে দিন যাপন করিত। উহারা সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিত এবং উহাদের মধ্যে মদ্যের বহুল প্রচলন ছিল। মাদক দ্রব্য সেবন মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। 'কথাসরিত-সাগর' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে সেই সময় নারীগণও মদ্য সেবনের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল না।

পেরিক্লিস ও এলিজাবেথের যুগের সহিত গুপ্তযুগের তুলনা

সাহিত্য ঃ গুপ্তযুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিচার করিয়া বার্নেট গুপ্ত যুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্মিথ গুপ্ত যুগকে ইংল্যাণ্ডের এলিজাবেথ ও স্টুয়ার্ট যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্মিথের মতে সেক্সপীয়রের মনীষা যেমন ইংল্যাণ্ডের অপরাপর সাহিত্য সেবীদের প্রতিভা ম্লান করিয়াছিলেন—তেমনি ভারতে কালিদাস অপরাপর সাহিত্য সেবীদের প্রতিভা ম্লান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্মিথের এইরূপ মন্তব্য যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেক্সপীয়রের আবির্ভাব না হইলেও এলিজাবেথ যুগের সাহিত্য গৌরব অর্জন করিত। ভারতেও কালিদাস ছাড়াও বহু প্রতিভা-সম্পন্ন সাহিত্য সেবীদের অবদানে ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুপ্ত রাজগণের বিদ্যোৎসাহিতা

গুপ্ত সম্রাটদের অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত কেবল শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন এমন নহে, তিনি নিজেও একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। যদি কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন হন তাহা হইলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বলা যাইতে পারে। স্মিথের মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের ভাব-আদর্শের বিনিময়ের ফলেই ভারতীয় মনীষার এই অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না যে এই যুগেই সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ গুপ্তপূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষা কখনই বিস্মৃত বা অবহেলিত হয় নাই। মৌর্যযুগে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্র-ভাষা ছিল না বটে কিন্তু তাই বলিয়া এই ভাষার ব্যবহার অপ্রচলিতও ছিল না। অনেকের মতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রশুঙ্গের সময় রচিত পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য',

রুদ্রদামনের বিখ্যাত জুনাগড় শিলালিপি, অশ্বঘোষ ও চরক রচিত গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্তযুগের বহু পূর্ব হইতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল। গুপ্তরাজগণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল মাত্র। এই যুগের অধিকাংশ লিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। হরিষেণ কর্তৃক রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি একখানি স্থললিত কাব্যের ন্যায় শ্রুতিমধুর। এই কাব্যের ভাষা যেন বহুকালের সাধনার ফল। সুতরাং আকস্মিকভাবে এই ভাষার উন্নতি হয় নাই।

সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন

গুপ্তযুগে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিকদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কালিদাস* ছিলেন অন্যতম। কালিদাস রচিত শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার, মালবিকাগ্নিমিত্রম প্রভৃতি নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শকুন্তলা নাটকে কালিদাসের প্রতিভার চরম প্রকাশ পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থের রচয়িতা শূদ্রক সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' ও বিষ্ণুশর্মণ রচিত 'পঞ্চতন্ত্র'—এই যুগের অপর মূল্যবান গ্রন্থ। মুদ্রারাক্ষস হইতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক মগধের সিংহাসন লাভের বিবরণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক, নারদ, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি প্রভৃতি মনীষিগণের রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও এইযুগে রচিত হইয়াছিল। কমন্দকের 'নীতিসার' সম্ভবতঃ গুপ্তরাজগণের জনৈক মন্ত্রী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই যুগেই বৌদ্ধায়ণ,

গুপ্তযুগের মনীষিগণ

***কালিদাস ঃ** কালিদাস কোন্ সময় জীবিত ছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিকদের মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে। (১) যে কালিদাস বিক্রম-সম্বতের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিক্রমের সমসাময়িক ছিলেন। (২) তিনি শুঙ্গ-রাজত্বকালের অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি শুঙ্গ-রাজগণের সমসাময়িক ছিলেন। (৩) অশ্বঘোষ ও কালিদাসের রচনার মধ্যে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অপর ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগেই কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দিক দিয়া তিনি বিক্রম-সম্বতের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিক্রমের সমসাময়িক ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সিলভিন-লেভি, জ্যাকোবি প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টীয় ৪৭০ অব্দের পূর্বেই কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। বাল্যকালে তিনি পিতৃহীন হইলে জনৈক গো-সেবক কতৃক তিনি প্রতিপালিত হন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নিরক্ষর কিন্তু সুদর্শন। কথিত আছে যে জনৈক রাজমন্ত্রীর কৌশলে রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পর তিনি নিজ অধ্যাবসায় বলে খ্যাতনামা কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

উপবর্ষ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি খ্যাতনামা দার্শনিকগণ তাঁহাদের বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। বসুবন্ধু রচিত 'হীনযান' ও 'মহাযান' বৌদ্ধ দর্শন-গ্রন্থ, প্রমর্থ রচিত বসুবন্ধুর জীবনী, চন্দ্রগোমিন রচিত 'চন্দ্রব্যাকরণ' প্রভৃতি এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। এই যুগের অপর খ্যাতনামা গ্রন্থকার ছিলেন এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা ও সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ। হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

বিজ্ঞান—সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ণ প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানেও ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। আর্যভট্ট রচিত 'সূর্য সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণের মনোরম বিবরণ রহিয়াছে। তিনি গ্রহ উপগ্রহগুলির অবস্থিতি সম্পর্কেও মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহির রচিত 'বৃহৎ-সংহিতা ও 'পঞ্চ-সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ দুইটি জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কীয় অমূল্য সম্পদ। পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা নামক গ্রন্থে গ্রীক ও রোমান জ্যোতিষ শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ রোমান ও গ্রীক সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রও এইযুগে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ শল্য চিকিৎসাও এই যুগে প্রচলিত ছিল এবং অনেকের মতে শল্যবিদ্যায় পারদর্শী সুশ্রুত গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আর্যভট্ট, বরাহমিহির সুশ্রুত প্রভৃতি

শিল্পকলা—গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল।*

এই যুগে মথুরা বারাণসী ও পাটলিপুত্র শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল। গুপ্তযুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সহজ ও স্বাভবিক গঠন এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ। মূর্তিগুলির সাবলিল অঙ্গ বিন্যাস, নিখুত সম্পাদন ও বাস্তবের ভিত্তির উপর অতীন্দ্রিয় রসসৃষ্টি গুপ্তযুগের শিল্পকলাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া ভাস্করগণ তাঁহাদের শিল্পনৈপুন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই যুগের শিল্পকলার বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মুসলমান আক্রমনের ফলে বিধ্বস্ত হওয়ায় এইগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। এই যুগের আবিষ্কৃত স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হইল তিগোয়ার বিষ্ণু মন্দির (জব্বলপুর), ভূমারের শিব-মন্দির, কুবীরের

স্থাপত্য শিল্প

* **স্মিথের মন্তব্য ঃ** "The three closely allied arts of architecture, sculpture and painting attained an extraordinary high points of achievements."

পার্বতী-মন্দির (ভূতপূর্ব অজয়গড় রাজ্য), সাঁচী ও বোধগয়ার বৌদ্ধ স্তূপ, দেওগড়ের (ঝাঁসী) প্রস্তর নির্মিত দশাবতার মন্দির, ভিতরগাঁওয়ের (কানুপুর) ইষ্টক নির্মিত মন্দির। ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরটির গঠন হইল পিরামিডের মতো। ইহার দেওয়ালগুলি অলংকার খচিত এবং পৌরাণিক আখ্যান ক্ষোদিত। দেওগড়ের প্রস্তর নির্মিত মন্দিরটি ছাড়া অপরাপর প্রস্তর নির্মিত মন্দিরগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং এইগুলিতে মূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে বটে কিন্তু পূজার জন্য মন্দিরগুলি ব্যবহৃত হইত না। এই মন্দিরগুলির ছাদ সাধারণতঃ প্রশস্থ। বিখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞ পার্শী-ব্রাউন (Percy Brown) দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরটিকে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সারনাথে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির গুপ্তযুগের স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

ভাস্কর্য শিল্প

ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শ, নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া ভাস্কর্য শিল্পীগণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, মথুরায় প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধ, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভারতের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ শিব-মূর্তি গুপ্তযুগেই নির্মিত হইয়াছিল। কুষাণ আমলে শিব-লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু একমুখী ও চতুর্মুখী শিবলিঙ্গের নির্মাণ এই যুগেই প্রথম প্রচলিত হয়। পৌরাণিক আখ্যান ও উপাখ্যান অবলম্বনে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি গঠন এই যুগের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিগুলির সাবলিল অঙ্গবিন্যাস ও রেখার সুস্পষ্টতা অপূর্ব। ডক্টর মজুমদারের মতে "Indeed the Gupta Sculpture may be regarded as typically Indian and classic in every sense of the term"।

চিত্র-শিল্প

গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। পাহাড় কাটিয়া গুহামন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে অঙ্কিত চিত্র সে যুগের চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। অজন্তার গুহাচিত্রের অধিকাংশই এই যুগের সৃষ্টি এবং ইওরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে এই চিত্রগুলি রেনেসাঁস যুগের ইওরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্রগুলির সমতুল্য। গুহাচিত্রগুলি বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর নর-

অজন্তা চিত্র

নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে বহু চিত্তাকর্ষক চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছিল। অজন্তার ষোড়শ ও সপ্তদশ (Cave XVI and XVII) গুহাগুলি অপূর্ব চিত্রে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

মালবের বাঘগুহার প্রাচীর চিত্রগুলিও অজন্তার গুহা-চিত্রের সমকক্ষ। পরিকল্পনায়, বর্ণসুষমায় ও বাস্তবতায় বাঘগুহার চিত্রগুলি অতুলনীয়।

বাঘগুহা চিত্র

এই যুগে ধাতব শিল্পেরও অসামান্য বিকাশ ঘটিয়াছিল। দিল্লীর কুতব-মিনারের নিকটে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ এই যুগের ধাতব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সূর্যতাপ ও বারিপাতেও এই স্তম্ভে এখনও মরিচা পড়ে নাই এবং ইহার মসৃণতাও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই যুগে অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও তাম্র মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি ও সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের অপর একটি মূর্তি এই যুগের ধাতব শিল্পোন্নতির অপর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।*

ধাতু শিল্প

ধর্ম : গুপ্তযুগের ধর্মের ক্ষেত্রেও সর্বাঙ্গীন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে গুপ্তরাজগণ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। ইহার সমর্থনে বহুযুক্তির অবতারণাও করা হইয়াছে। গুপ্তরাজগণ নিজেদের 'পরমভাগবত' বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় গুপ্তরাজগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখা যায়। গুপ্তমুদ্রায় বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতি-চ্ছবিও অঙ্কিত দেখা যায়। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় স্কন্দগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটগণের ব্যক্তিগত ধর্ম

কিন্তু উপরোক্ত মতবাদ যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, বর্তমানকালে 'পরমভাগবত' অর্থে বিষ্ণুর উপসক বুঝাইলেও গুপ্তযুগে সম্ভবতঃ, তাহা বুঝাইত না। ভগবান বলিতে কোন একটি বিশিষ্ট দেবতাকে বোঝায় না। গুপ্ত-মুদ্রায় যেমন বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখা যায় তেমনি কতকগুলি মুদ্রায় শিবের বাহন বৃষের প্রতিচ্ছবিও অঙ্কিত দেখা যায়। সুতরাং গুপ্তরাজগণ শুধু যে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এমন মনে হয় না। তাঁহারা শিবের উপাসনাও করিতেন

বহু দেবদেবীর উপাসনা

---

* **গুপ্ত-শিল্পকলা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য :** (1) "Gupta art is really a renaissance due to the transformation of the ideal of the people of northern India in the 4th and 5th centuries A. D. This transformation was based on an assimilation of what was old, an elimination of what was exotic and foreign and finally a systematic production of something entirely new and essentially Indian." (R. D. Banerjee)

(ii) Gupat art has been praised for its intellectuality. It would be better to treat it as the natural outcome of ancient Indian art with its vivid appreciation of form and pattern and its love of the quick beat and rythm of living things and of their poise and balance in repose''. (Codrington)

এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি মুদ্রায় ও লিপিতে পার্বতী, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিও গুপ্তরাজগণের শ্রদ্ধাঞ্জলির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ হইতে এইরূপ মনে হয় যে তাঁহারা এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এক একটি দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিতেন। এককথায় গুপ্তরাজ ছিলেন হিন্দুধর্মী এবং বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উপাসক

বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রচলন

গুপ্ত-শাসনকালে বৈদিক যুগের দেবদেবীর স্থলে পৌরাণিক বিষ্ণু, শিব, দুর্গা সূর্য প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। এই যুগে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের পরিবর্তে ভক্তিমূলক ধর্ম প্রাধাণ্যলাভ করিয়াছিল। হিন্দু সমাজে শৈব ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম উভয়ই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। পাশাপাশি শিব ও বিষ্ণু মন্দির নির্মানের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। শিব পূজার সঙ্গে সঙ্গে শিবের মহিষী পার্বতীর পূজাও প্রচলিত ছিল। সেই যুগে শক্তি-পূজাও প্রচলিত ছিল। মহিষাশূর-মর্দিনীর বহু মূর্তি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যুদ্ধ-যাত্রাকালে গুপ্ত-রাজগণ শক্তিপূজা করিতেন এইরূপ বহু উল্লেখ আছে।

হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচলন

গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্মের সহিত বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মও প্রচলিত ছিল। হিন্দু ধর্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্যলাভ করিতেছিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিল বৌদ্ধধর্মী। জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। গুপ্ত-সম্রাটগণ ছিলেন হিন্দুধর্মানুরাগী ও ইহার পৃষ্ঠপোষক। গুপ্তসম্রাটগণের অনেকেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। বৌদ্ধধর্মও এই যুগে জনপ্রিয় ছিল, ফা-হিয়েনের বিবরণীতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে বৌদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধগ্রন্থকারদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। এই যুগেই বহু খ্যাতনামা বৌদ্ধমণীষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় বহু বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাগার্জুন, বসুবন্ধু, পরমার্থ-প্রভৃতি বৌদ্ধমণীষিগণের আবির্ভাব এই যুগেই হইয়াছিল। বৌদ্ধমঠগুলি ছিল এই যুগের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নালন্দার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য মধ্য-দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

মধ্যদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব হ্রাস

ধর্মক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা

ধর্মীয় উদারতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা এই যুগের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইয়াও তাঁহারা পরধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন এবং শাসনকার্যে পরধর্মে বিশ্বাসী লোককেও নিযুক্ত করিতেন। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে

জানা যায় যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বিরাজ করিত। এই যুগে ধর্ম-বিরোধের কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জনপ্রিয়তা, বহু বৌদ্ধ মণীষীগণের আবির্ভাব, বহু বৌদ্ধগ্রন্থাদির রচনা—ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে শান্তির ইঙ্গিত বহন করে।

গুপ্তযুগ কি হিন্দুধর্মের নব জাগরণের যুগ? (Hindu Renaissance): এক দল ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির 'নব জাগরণের' যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইওরোপের ইতিহাসে 'Renaissance' বা নব জাগরণ কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইওরোপের ইতিহাসে Renaissance বলিত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা এবং ইওরোপীয় মণীষার পুনর্জন্ম বোঝায়। মধ্যযুগের প্রারম্ভে বর্বর জাতির আক্রমণে ও আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটে। ইহার পর হইতে ত্রয়োদশ-শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপে যে যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা তামস-যুগ (Dark-Age) নামে অভিহিত হইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পুনরায় ইওরোপে প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থাদি ও পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধারের কার্য এবং গ্রীক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোচনা শুরু হয়। ইওরোপের ইতিহাসে ইহা রেনেসাঁস (Renaissance) বা 'নব জাগরণ' নামে প্রসিদ্ধ। ভারতের একদল ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নব-জাগরণের যুগ। এইরূপ মন্তব্যের সমর্থনে ইহাদের যুক্তি হইল—প্রথমতঃ, বৈদিক যুগ হইতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকাল পর্যন্ত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অভাবনীয় বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু অশোকের রাজত্বকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে থাকিলে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হইলে এবং ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ইহার ব্যাপক প্রসার ঘটিতে থাকিলে ভারতে হিন্দুগণ একটি নগণ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, অশোকের সময় হইতে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক প্রচলন শুরু হইলে বৈদিক ধর্মের প্রধান অঙ্গ সংস্কৃত ভাষা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে এবং ইহা ব্রাহ্মণদের পূজা-পার্বণের মধ্যেই কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মগধে গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটে।

রেনেসাঁস বলিতে কি বোঝায়

গুপ্তযুগ নব-জাগরণের যুগ বলিয়া অভিহিত ইহার সমর্থনে যুক্তি

কিন্তু উপরোক্ত মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রথমতঃ, অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় তথা বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং হিন্দু ধর্ম জনপ্রিয়তা

হারাইয়াছিল সত্য কিন্তু তাই বলিয়া ইহা স্বীকার করা যায় না যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে হিন্দুধর্ম মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুপ্ত যুগেই ইহার পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। অশোক ও কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য হিন্দু অথবা জৈনধর্মের বিলুপ্তির ইঙ্গিত করে না। দ্বিতীয়তঃ, অশোক ও কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহাদের আমলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত কখনও রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কখনও বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা দেয় নাই। অশোক ও কণিষ্ক উভয়েই পর ধর্মসহিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং উভয়ের শাসনকালে বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি অশোকের দানশীলতার বহু নিদর্শন আছে। তৃতীয়তঃ, শুঙ্গরাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে শুঙ্গরাজগণের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সাতবাহণ রাজগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহারা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, শকক্ষত্রপ ও কুষাণ রাজগণের অনেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে কিন্তু হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিও তাঁহারা সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কণিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী বাসুদেব শিবের উপাষক ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপগণ বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মে অধিক অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। রুদ্রদামণের গার্ণার-লিপি (Girnar inscription) সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পঞ্চমতঃ, 'মহাযান' বৌদ্ধ ধর্মমতের উদ্ভব হইলে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য বহুলাংশে দূরীভূত হয়। 'মহাযান' ধর্মাবলম্বীগণ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র রচনা করিতেন। 'মহাযান' ধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণদের জয়লাভের ইঙ্গিত করে। বস্তুতঃ মৌর্যোত্তর যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচলন হিন্দু ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

উপরোক্ত মতবাদের অযৌক্তিকতা

সুতরাং গুপ্তযুগ শুরু হইবার বহু পূর্বেই হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। একথা নিঃসন্দেহ যে গুপ্তরাজগণ ছিলেন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং হিন্দু মণীষার চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল।

উপসংহার

বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক ঃ গুপ্তযুগে ভারতের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও

ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকগণ চীনে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অপর দিকে চীন হইতেও বৌদ্ধ প্রচারক ও পর্যটকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারতীয় বণিক ও ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি জাভা (যবদ্বীপ), সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দেশগুলিতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অজন্তার গুহা চিত্র হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারত ও পারস্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণ শাসনকালে রোমের সহিত ভারতের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা গুপ্ত যুগেও বজায় ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হইয়াছিল। গুপ্তযুগের মুদ্রায় রোমান প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রীক প্রভাবও সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক
চীন ও ভারত

সুমাত্রা, জাভা মালয় রোম, পারস্য, গ্রীস ও ভারত

ভারতীয় মুদ্রা ও জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রীক ও রোমান প্রভাব

প্রশ্নমালা

1. Trace the growth of the Gupta Empire from Chandra Gupta I to Chandra Gupta II.
2. Review the career and personal accomplishment of Samudra Gupta.
3. "Samudra Gupta was one of the most remarkable and accomplished kings recorded in Indian History." Elucidate.
4. Attempt an estimate of the achievements of Chandra Gupta II.
5. Give an account of the administrative system of the Guptas.
6. "The Gupta period is in the annals of the classical India almost what the Pariclean Age is in the history of Greece." Discuss.
7. Give an account of the civilisation and culture of the Gupta period. Was it an age of Hindu Renaissance ?
8. What were the causes of the down fall of the Gupta Empire ?
9. Give an account of the social and economic condition of India under the Guptas.

পঞ্চম অধ্যায়

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত

(Northern India in the Post-Gupta Period)

ভূমিকা : স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে। পুষ্যমিত্র নামক উপজাতি ও হূণগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। এতদ্ভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া গুপ্তরাজবংশে আত্মকলহ ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তরাজগণের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন প্রভৃতি কারণে সাম্রাজ্যের সংহতি ও ঐক্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ লইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে—যেমন গান্ধার ও পাঞ্জাব হইতে মালব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হূণরাজ্য, ইহার দক্ষিণে বলভীর মৈত্রক বংশ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ, কনৌজের মৌখারী বংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের রাজ্যদ্বয়। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে হর্ষবর্ধনের রাজত্বের এক শত বৎসর পূর্বে ভারতে এক ঘোর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ চলিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নহে। পানিকরের কথায় "The old view that the sixth century was a period of anarchy and disruption and the age of Harsha that followed was a last glow has to be definitely abandoned"। প্রকৃত পক্ষে হর্ষবর্ধনের এক শত বৎসর পূর্বে সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য লইয়া কয়েকটি সুশাসিত ও শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। বিন্ধ্য পার্বত্য অঞ্চলে বকাটকগণ দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মগধে পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ ক্ষীয়মান গুপ্ত সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও অরাজকতার স্থলে এই যুগে সমগ্রভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই যুগে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অভাবনীয় উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। ভারবী, কুমারদাস, দণ্ডি প্রভৃতি কবি এবং বিশাখ দত্ত ও কৌমুদী-মহোৎসব নাটকের রচয়িতা-প্রভৃতি নাট্যকার এই যুগেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে এই যুগেই ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রের উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল।

প্রগতি মূলক যুগ

(১) **হূণ রাজ্য (The Hunas) :** হিয়ং-নু বা হূণগণ ছিল মধ্য এশিয়ার এক বর্বর ও যাযাবর জাতি। খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইহারা উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে ইয়ো-চি নামক অপর এক বর্বর জাতিকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ইহার কিছুদিন পরে হূণগণ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে

পরিচয়

থাকে। ইহাদের একটি শাখা ইওরোপে প্রবেশ করিয়া রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিল। ইহারা কৃষ্ণ-হূণ (Black Hunas) নামে পরিচিত হইল এবং ইহাদের নেতা ছিলেন আতিলা (Attila)। অপর একটি শাখা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে পারস্য আক্রমণ করিয়া সাসানীয় বংশের সম্রাটকে (ফিরোজ) পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। ইহারা শ্বেত-হূণ (White Hunas) নামে পরিচিত হইল। সাসানীয় বংশের বিরুদ্ধে এই জয়লাভ হূণগণের শক্তি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি করিল এবং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই উহারা বল্‌খকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল। পারস্যের পর শুরু হইল হূণদের ভারত আক্রমণ।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে হূণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। কিন্তু গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সাময়িকভাবে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

হূণদের ভারত আক্রমণ

তোরমান: স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর কিছুকাল হূণগণ ভারত আক্রমণে সাহসী হয় নাই। ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে হূণ নায়ক তোরমান-এর (Toramana) নেতৃত্বে হূণগণ পাঞ্জাব হইতে বাহির হইয়া গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করিল এবং উহার পশ্চিমাংশের কতকস্থান অধিকার করিল। মুদ্রা ও লিপি হইতে তোরমান ও মিহিরকুল নামে দুইজন হূণ নায়কের নাম পাওয়া যায়। তোরমান যথার্থই হূণ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে মুদ্রা হইতে অনুমান হয় যে তোরমান ছিলেন বহিরাগত। গান্ধারের জনৈক হূণ রাজার (৫২০ খৃষ্টাব্দ) নিকট আগত সোং-ইয়ুং (Song-Yun) নামে জনৈক চৈনিক দূতের বিবরণ হইতে জানা যায় যে তাঁহার আগমনের কিছুকাল পূর্বেই হূণগণ কর্তৃক গান্ধার বিজিত হইয়াছিল। তোরমানের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ গান্ধারের হূণ পরিবারের সহিত তোরমানের সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'কুবলয়মালা' নামক জৈন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তোরমান চেনাব নদীর উপকূলে বাস করিতেন এবং তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫১০ খৃষ্টাব্দে তোরমান ভানুগুপ্ত নামক জনৈক গুপ্ত সম্রাটের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

মিহিরকুল: তোরমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মিহিরকুল হূণ সিংহাসনে আরোহণ করেন (৫১৫ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহার রাজধানী ছিল শাকল বা শিয়ালকোট। মিহিরকুল ছিলেন শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। হিউয়েন-সাং, চৈনিক দূত সোং-ইয়ুং, ও কল্‌হণের বিবরণী হইতে মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতা ও রাজ্য বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাং-এর মতে

মিহিরকুল শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ঘোর বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং বৌদ্ধগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। কল্‌হণ রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে জানা যায় যে মিহিরকুল ছিলেন শক্তিশালী রাজা এবং গান্ধার, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত ও সিংহল তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার নেতৃত্বে হূণ প্রাধান্য গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি মধ্য ভারতে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলে মান্দাশোরের অধিপতি যশোধর্মের নিকট পরাজিত হন (৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে মগধ রাজ বালাদিত্য এক যুদ্ধে মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। পরে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কাশ্মীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মিহিরকুল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজ্যবিস্তার

মিহিরকুলের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। গোয়ালিয়র লিপিতে উল্লিখিত আছে যে মিহিরকুল সূর্য্যের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর বৌদ্ধ-ধর্ম বিদ্বেষী।

মিহিরকুলের ধর্ম

হূণ-শাসনের অবসানঃ মিহিরকুলের মৃত্যুর পর যোগ্য নেতার অভাবে হূণ শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলেও ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত উহাদের উপদ্রব চলিতে থাকে। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি ও কনৌজের মৌখারী রাজবংশের সহিত সংঘর্ষের ফলে হূণ শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। অবশেষে উহারা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাজপুত জাতির সহিত মিশিয়া যায়।

হূণ-শাসনের ফলাফল (Effects of Huna Rule)ঃ স্মিথ হূণ আক্রমণের ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন "পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্বরগণের আক্রমণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটাইয়াছিল।"*

(১) **রাজনৈতিক**ঃ ইওরোপে যেমন হূণ আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল—ভারতেও সেইরূপ উহাদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং বৈদেশিক জাতি মৈত্রকগণ সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত

* "The barbarian invasions of the fifth and sixth centuries constitute a turning point in the history of Northern and Western India, both Political and Social"—Smith.

বলভীতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ব্রোচ অঞ্চলে অপর এক বৈদেশিক জাতি গুর্জরগণ এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

(২) **সাংস্কৃতিক:** সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হূণ আক্রমণ ছিল এক বিরাট অভিশাপ। উহাদের আক্রমণে বহু মন্দির, মঠ ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হইয়াছিল। উহাদের আক্রমণে শুধু যে গুপ্ত শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হইয়াছিল এমন নহে অসংখ্য ঐতিহাসিক দলিলপত্রও বিনষ্ট হইয়াছিল।

(৩) **সামাজিক:** সামাজিক ক্ষেত্রেও হূণ আক্রমণের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। (ক) উহাদের রাজনৈতিক শক্তি বিনষ্ট হইলে উহারা ভারতে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ভারতীয় নারীকে বিবাহ করিয়া এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া উহারা কালক্রমে ভারতীয় সমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতীয়দের মহান নৈতিক ঐতিহ্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পরবর্তী কালে গুর্জর এবং অন্যান্য হূণ-জাতিগুলির সংমিশ্রণ হইতেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। (খ) হূণ ও অন্যান্য বিদেশীগণের ভারতীয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল।

(৪) **বলভীর মৈত্রক বংশ (Maitrakas of Valabhi):** খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভটার্ক-এর নেতৃত্বে মৈত্রকগণ সৌরাষ্ট্রে বলভী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বলভী ছিল এই বংশের রাজধানী। ভটার্ক-এর অধীনে এই রাজ্যের আয়তন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

মৈত্রক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্ক

এই বংশের প্রথম কয়েকজন রাজা হূণদের অধীনে সামন্ত ছিলেন। ভটার্ক-এর পর তাঁহার পুত্র প্রথম ধরসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভটার্ক ও ধরসেন সেনাপতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধরসেনের পরবর্তী পাঁচজন রাজা যথাক্রমে দ্রোণ সিংহ, প্রথম ধ্রুবসেন, ধরপত্ত, গুহসেন ও দ্বিতীয় ধরসেন 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইহারা গুপ্ত অথবা অন্য রাজবংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন। অনেকের মতে উপরোক্ত পাঁচজন রাজা হূণদের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। হূণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে মৈত্রকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

ধরসেন ও অন্যান্য পাঁচজন রাজা

দ্বিতীয় ধরসেনের পুত্র শিলাদিত্য ছিলেন এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। সম্ভবতঃ তিনি ৬০৬ হইতে ৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বলভী শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। হিউয়েন-সাং শিলাদিত্যকে সুদক্ষ শাসক ও দয়ালু বলিয়া

শিলাদিত্য

অভিহিত করিয়াছেন। তিনি রাজপুতানার দক্ষিণাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

শিলাদিত্যের পর তৃতীয় ধরসেন, দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ও চতুর্থ ধরসেন যথাক্রমে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারা ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। ইহাদের আমলে গুজরাট ও মালবের কতকাংশ বলভী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ধ্রুবসেন থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্ধনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং হর্ষবর্ধন কর্তৃক আহূত প্রয়াগের ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ধরসেন, দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ও চতুর্থ ধরসেন

চতুর্থ ধরসেনের রাজত্বকালে বলভী-রাজ্য শক্তি ও মর্যাদার চরম শিখরে উঠিয়াছিল। তিনি গুর্জর রাজ্যের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রোচ পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্থ ধরসেন

চতুর্থ ধরসেনের পর তৃতীয় শিলাদিত্য, চতুর্থ শিলাদিত্য, পঞ্চম শিলাদিত্য, ষষ্ঠ শিলাদিত্য ও সপ্তম শিলাদিত্য যথাক্রমে রাজত্ব করেন। পঞ্চম শিলাদিত্যের আমলে সিন্ধুদেশের আরবগণ বলভী আক্রমণ করিয়া রাজপুতানা, গুজরাট ও কাথিয়াবাড় বিধ্বস্ত করিয়াছিল। আরবগণ প্রথম দিকে সাফল্যলাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত চালুক্য ও প্রতিহার রাজগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ৭২৫ হইতে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বলভীর বিরুদ্ধে আরবগণ আক্রমণ চালাইয়াছিল।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শিলাদিত্য

আরব আক্রমণের পর হইতে বলভী-রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। চালুক্য, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণের অভ্যুত্থানের ফলে বলভী রাজ্যের পতন ঘটে। অল-বেরুণীর বিবরণী অনুসারে আরবগণের আক্রমণের ফলেই বলভী বংশের অবসান ঘটে।

বলভী রাজ্যের পতন

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বলভী খ্যাতি আর্জন করিয়াছিল। ইহা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। বলভী নগরী ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র। বলভী রাজগণ শিবের উপাসক এবং পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং বলভীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। নালন্দার ন্যায় সেই যুগে বলভীও ছিল একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। বলভীর বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে গুণমতি ও স্থিরমতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে বলভীর শিক্ষায়তন হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা হইত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষাব্রতী বলভীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের নিমিত্ত আসিতেন।

(৩) **মৌখারী বংশ** (The Maukharis): 'মৌখারী'কথাটি অতি প্রাচীন। পানিনির 'অষ্টাধ্যোয়ী' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। মৌর্য-যুগেও মৌখারী বংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রাজস্থানে বহু মৌখারী পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মৌখারীগণ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতেন। মৌখারিগণ ছিলেন ক্ষত্রিয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহারা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরিচয়

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখারীগণ গয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। লিপি ও সাহিত্যে মৌখারীগণের দুইটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম শাখাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যজ্ঞবর্মন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন শার্দুল বর্মন ও অনন্ত বর্মন। দ্বিতীয় শাখাটির নৃপতিগণ ছিলেন হরি বর্মন, আদিত্য বর্মন, ঈশ্বর বর্মন, ঈশান বর্মন, সর্ব বর্মন, অবন্তি বর্মন ও গ্রহ বর্মন।

দুইটি শাখা

মৌখারী লিপিতে যজ্ঞ বর্মন, শার্দুল বর্মন ও অনন্ত বর্মনকে রাজা বা মহারাজা বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। তাঁহারা 'সামন্ত' বা 'সমান্ত চূড়ামণি' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ছিলেন গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনস্থ সামন্ত। মৌখারীগণের নূতন রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন হরি বর্মন। তাঁহার উপাধি ছিল 'মহারাজা'। ইহা হইতে মনে হয় তিনি ছিলেন স্বাধীন নরপতি। লিপি হইতে তাঁহার রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

হরিবর্মন

হরি বর্মনের পর আদিত্য বর্মন সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'হর্যচরিত' নামক গ্রন্থে মৌখারী ও গুপ্ত রাজগণের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়।

আদিত্য বর্মন

আদিত্য বর্মনের পর তাঁহার পুত্র ঈশ্বর বর্মন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। তিনি মালবের রাজা যশোধর্মনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জৌনপুর প্রস্তর লিপি হইতে জানা যায় যে ঈশ্বর বর্মন উত্তর ভারতে অন্ধ্রগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। অসিরগড় লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি মগধের গুপ্ত-রাজকন্যা দেবী-উপগুপ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর বর্মন

ঈশ্বর বর্মনের পর তাঁহার পুত্র ঈশান বর্মন সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৌখারী রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই মৌখারী রাজবংশ শক্তি ও মর্যাদার চরম শিখরে উঠিয়াছিল। তিনি অন্ধ্র, শুলিক ও গৌড়বাসীদের পরাজিত করিয়া রাজত্ব সূচক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই মালবের গুপ্তবংশীয় রাজাদের সহিত মৌখারীগণের সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল। ঈশান বর্মনের শাসনাধীনে মৌখারী রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। মুদ্রা ও অনুশাসন লিপির প্রাপ্তিস্থান হইতে ইহাই মনে হয় যে সমগ্র উত্তর প্রদেশ, মগধের কতকাংশ ও দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

ঈশান বর্মন

ঈশান বর্মন এবং তাঁহার পরবর্তী দুইজন রাজা, সর্ব বর্মন ও অবন্তি বর্মন যথাক্রমে ৫৫৮ হইতে ৫৭৬, ৫৭৬ হইতে ৫৮০ এবং ৫৮০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সর্ববর্মন ও অবন্তিবর্মন

অবন্তিবর্মনের পর গ্রহবর্মন (৬০০-৬০৬ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধন প্রথমে মালবের গুপ্তরাজগণের মিত্র ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি মৌখারী-রাজ গ্রহবর্মনের সহিত নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়া মৌখারীগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। মৌখারী ও থানেশ্বরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইলে মালবের গুপ্ত-রাজ দেবগুপ্ত গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক সম্মিলিত ভাবে মৌখারী রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংস করেন এবং গ্রহবর্মনকে নিহত করেন। রাজ্যশ্রী ধৃতা হইয়া বন্দিনী হন।

গ্রহবর্মন

মৌখারী রাজ্যের বিলুপ্তি

মৌখারীগণের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল যে উহারা হূণদের আক্রমণ কিছুদিন পর্যন্ত সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিয়া উত্তর ভারতে রাজনৈতিক শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মৌখারীগণের কৃতিত্ব

(৪) মন্দাশোর-বংশ যশোধর্মন (Yasodharman) : বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দিলে যশোধর্মন নামে এক ব্যক্তি মালবে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দাশোর ছিল তাঁহার রজধানী। হূণ-রাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া তিনি পরাক্রান্ত নরপতিরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিন মালবের কোন সামন্ত বংশসম্ভুত ছিলেন। মন্দাশোরে প্রাপ্ত একটি অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে যশোধর্মনের রাজ্য ব্রহ্মপুত্র হইতে আরব সাগর ও হিমালয়

হইতে পূর্বঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকের মতে যশোধর্মন ও 'শকারি-বিক্রমাদিত্য' ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এইরূপ অনুমান গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ তিনি কখনও শকদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই এবং উজ্জয়িনী কোনও দিন তাঁহার রাজধানী ছিল না। যশোধর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মন্দাশোর বংশের বিলুপ্তি ঘটে। সম্ভবতঃ ৫৩০ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যশোধর্মন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(৫) **মালবের গুপ্তবংশ (Guptas of Malwa)**ঃ পরবর্তী কালের গুপ্তরাজ আদিত্যসেনের শিলালিপি হইতে মালবের গুপ্ত বংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। মগধের গুপ্ত বংশের সহিত ইহাদের কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহাদের ইতিহাস হইল অযোধ্যা ও গয়ার মৌখারীগণের সহিত অবিরত সংঘর্ষের ইতিহাস।

মালবের গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণগুপ্ত। সম্ভবতঃ তিনি ৫১০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরবর্তী দুইজন রাজা হর্ষগুপ্ত ও জীবগুপ্তের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তৃতীয় কুমারগুপ্ত ছিলেন এই বংশের চতুর্থ রাজা এবং মৌখারীরাজ ঈশান বর্মনের সমসাময়িক। কুমারগুপ্তকে অন্ধ্র, শুলিক ও গৌড়বাসীদের সহিত একাধিকবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্যতম শত্রু ছিলেন ঈশান বর্মন। প্রথম দিকে মালবের গুপ্তবংশ ও মৌখারীগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কিন্তু ঈশান বর্মন রাজত্ব সূচক উপাধি ধারণ করিলে এই দুই বংশের মধ্যে সংঘর্ষ সুরু হয়। এই সংঘর্ষ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। অবশেষে গুপ্তরাজ দেবগুপ্ত গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সহযোগিতায় মৌখারী রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার রাজা গ্রহবর্মনকে নিহত করেন।

কৃষ্ণগুপ্ত

তৃতীয় কুমার গুপ্ত

আদিত্যসেন ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে অরাজকতার সুযোগ লইয়া তিনি নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি গৌড় ও মৌখারী রাজ্যের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং জনৈক মৌখারী রাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সাহাপুর শিলালিপি হইনে জানা যায় যে তিনি ৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জীবগুপ্ত। তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে গৌড় রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে মালবের গুপ্তবংশের অবসান ঘটে।

আদিত্য সেন

(৬) **বকাটক বংশ (The Vakatakas)**ঃ মধ্য ভারত ও দক্ষিণ

ভারতের কিয়দংশ লইয়া গঠিত বকাটক বংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়ি কালে স্থাপিত হইয়াছিল। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে যে সকল রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল তন্মধ্যে বকাটক বংশ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তি ঃ এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ডক্টর জয়স্বাল উত্তর ভারতে প্রাপ্ত বকাটক-রাজ প্রথম প্রবরসেনের নামাঙ্কিত মুদ্রার উপর ভিত্তি করিয়া বলেন যে বকাটকগণ ছিলেন উত্তর ভারতীয়। কিন্তু জয়স্বালের এই অনুমান যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কারণ বকাটক রাজগণ তাঁহাদের নিজস্ব মুদ্রার কখনও প্রচলন করেন নাই এবং তাঁহাদের রাজ্যের সর্বত্র গুপ্ত-রাজগণের মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। সুতরাং বকাটকগণ ছিলেন উত্তর ভারতীয় একথা স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের পল্লব বংশের অনুশাসনলিপি ও বকাটক বংশের অনুশাসন লিপির মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের চালুক্য ও কদম্বগণের ন্যায় বকাটকগণও 'হরিতি পুত্রের' বংশ-সম্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বংশের ন্যায় বকাটকগণও 'ধর্ম মহারাজা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরং এই সকল সাক্ষ্য এবং প্রমাণ হইতে ইহাই মনে হয় যে বকাটকগণ ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্য-শক্তি। এই বংশের অনুশাসনলিপিতে তাঁহাকে 'বকাটক-বংশকেতু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তি

বিন্ধ্যশক্তির পর তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বকাটক বংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নর্মদা পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়া সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরীক। সম্ভবতঃ তিনি পুরীকের নাগ-রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্য বকাটক রাজ্যভুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় তিনি বিভিন্ন দিকে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রবরসেন

প্রথম প্রবরসেনের পর প্রথম রুদ্রসেন, পৃথিবী সেন, দ্বিতীয় রুদ্রসেন ও দিবাকর যথাক্রমে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় কন্যা:প্রভাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বকাটক-গুপ্ত মৈত্রী পশ্চিম ভারতে শকক্ষত্রপগণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে কলচুরি নামে এক দক্ষিণ ভারতীয় বংশের হস্তে বকাটক বংশের অবসান ঘটে।

বকাটক বংশের গুরুত্ব (Importance) ঃ দক্ষিণ ভারতের ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বকাটকগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে। বকাটক-

রাজগণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। ইহাদের অনেকেই ছিলেন শিবের উপাসক। একমাত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বহু যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবরসেন সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের প্রতি বকাটক রাজগণের ভূমিদানের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা বহু শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম

বকাটক রাজগণ সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহাদের অনেকেই গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বকাটক-রাজ সর্বসেন ছিলেন 'হরিবিজয়' নামে একখানি প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা। তাঁহার রাজধানী ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র। দ্বিতীয় প্রবরসেনও প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে 'সেতুবন্ধ' নামক কাব্যটি সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল। অনেকের মতে কালিদাস দ্বিতীয় প্রবরসেনের রাজসভায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য

বকাটক রাজগণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিগোয়ার মন্দিরটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মন্দিরে রক্ষিত গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অজন্তার ষষ্ঠ ও সপ্তম বিহার-গুহা ও ঊনবিংশ চৈত্য-গুহা এই যুগেই নির্মিত হইয়াছিল। উপরোক্ত বিহার-গুহা দুইটিকে ফারগুসন (Fergusson) ভারতের অন্যতম বৌদ্ধ-শিল্প নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শিল্প-কলা

(৭) **বাংলার গৌড় রাজ্য** :—["বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস"—অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

(৮) থানেশ্বর—হর্ষবর্ধন

(Thaneswar : Harshavardhana)

পুষ্যভূতি-বংশ

(The Pushyabhuti Dynasty)

তথ্যাদি (Sources) : নিম্নলিখিত উপাদানগুলি হইতে হর্ষবর্ধন তথা সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—যথা—(১) হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী, (২) বাণভট্ট কর্তৃক রচিত 'হর্ষচরিত' এবং (৩) সমসাময়িক মুদ্রা ও লিপি (লিপিগুলির মধ্যে মধুবনলিপি, সোনপত্ লিপি ও বাণক্ষের লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎপত্তি (Origin) : পুষ্যভূতি বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরে হর্ষবর্ধনের পূর্ব পুরুষগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাণভট্টের বিবরণ অনুসারে পুষ্যভূতি ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বাণভট্ট পুষ্যভূতির উত্তরাধিকারীগণের কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি প্রভাকর বর্ধনকে লইয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা শুরু করিয়াছেন। পুষ্যভূতি বংশের নৃপতিগণের ব্যক্তিগত সীল ও অনুশাসন লিপিতে প্রভাকর বর্ধনের তিনজন পূর্ব-পুরুষের নাম পাওয়া যায়—যথা মহারাজা নরবর্ধন, মহারাজা রাজ্যবর্ধন ও মহারাজা আদিত্যবর্ধন। রাজ্যবর্ধনের মহিষী ছিলেন যশোমতি দেবী। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং হূন আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়-তার উদ্ভব হইয়াছিল সম্ভবতঃ উহার সুযোগ লইয়া থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজগণ এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রভাকরবর্ধন (৫৮০-৬০৫ খৃঃ)—প্রভাকরবর্ধন ছিলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে থানেশ্বর রাজ্য শক্তিশালী হইয়া সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকরবর্ধন হূণ, গুর্জর ও মালবদিগকে পরাজিত করিয়া মালব ও গুজরাট পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মৌখারী রাজ গ্রহবর্মনের সহিত তিনি স্বীয় কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে হূণগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালীন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্যবর্ধন (৬০৫-৬০৬ খৃঃ) : প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের অনতিকাল মধ্যেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে মালবের গুপ্তরাজ দেবগুপ্ত ও

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের আক্রমণের ফলে কনৌজের মৌখারীরাজ গ্রহবর্মন নিহত এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হইয়াছেন। অবিলম্বে রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। দেবগুপ্তকে তিনি পরাজিত করিলেন বটে কিন্তু শশাঙ্কের হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

হর্ষবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ খৃঃ (Harshavardhana)

সিংহাসনারোহণ ও রাজ্যশ্রীর উদ্ধারঃ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যের অমাত্যগণের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মৌখারীরাজ গ্রহবর্মনের মৃত্যুতে কনৌজের অমাত্যগণের অনুরোধে তিনি মৌখারী রাজ্যের শাসনভারও গ্রহণ করিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সম্বৎ প্রচলিত করেন। ইহা হর্ষ-সম্বৎ নামে পরিচিত। চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে রাজশ্রী কারামুক্ত হইলে হর্ষবর্ধনের সহযোগিতায় তিনি স্বীয় স্বামীর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ৬১২ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন 'রাজপুত্র' উপাধি গ্রহণ করেন। থানেশ্বর ও কনৌজের রাজ্য দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া হর্ষবর্ধন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করিয়া তিনি কনৌজকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন।

সিংহাসনে আরোহণ

কনৌজের শাসনভার গ্রহণ

হর্ষ-সম্বৎ

কনৌজে রাজধানী স্থানান্তর

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হর্ষবর্ধন প্রথমেই রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তৃতিতে কামরূপরাজ ইতি পূর্বেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং শশাঙ্কের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ভাস্করবর্মন হর্ষবর্ধনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। মিত্রবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শশাঙ্ক কনৌজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বহু অনুসন্ধানের পর হর্ষবর্ধন বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী অরণ্যে রাজ্যশ্রীর সন্ধান পাইলেন। কথিত আছে যে অরণ্যে যখন রাজ্যশ্রী গভীর হতাশায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত সেই সময় হর্ষবর্ধন তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং ভগ্নীসহ কনৌজে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

কামরূপ রাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন

শশাঙ্কের কনৌজ পরিত্যাগ

হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় (Harsha's Conquests): রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়া হর্ষবর্ধন রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। হিউয়েন-সাং তাঁহার বিবরণীতে হর্ষবর্ধনের বহু রাজ্য জয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপ বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। ইহা সত্য যে শশাঙ্ক ছিলেন হর্ষবর্ধনের প্রথম শত্রু। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের সামরিক অভিযান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' হইতে জানা যায় যে গৌড়াধিপতির বিরুদ্ধেই হর্ষবর্ধনের প্রথম সামরিক অভিযান শুরু হইয়াছিল। কিন্তু বাণভট্ট যুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে শশাঙ্ক তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধের উপর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খৃঃ) হর্ষবর্ধন মগধ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গ বিজয়

সম্ভবতঃ ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পরেই হর্ষবর্ধন পশ্চিম বঙ্গে অভিযান চালাইয়া এই অঞ্চল স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের রাজ্যের অপরাপর অংশ (পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ) কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে মিত্রশক্তির মধ্যে শশাঙ্কের রাজ্য বণ্টিত হইল।

উড়িষ্যা অভিযান

হর্ষবর্ধন উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া গঞ্জাম পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। গঞ্জাম স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া হর্ষবর্ধন তথায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। নালন্দা হইতে বৌদ্ধ আচার্যগণকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কথিত আছে সম্মেলনের পর হর্ষবর্ধন জয়সেন নামক জনৈক বৌদ্ধ আচার্যকে "উড়িষ্যার আশিটি নগরের রাজস্ব প্রদান করিলেন"।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হর্ষের পরাজয়

দক্ষিণ ভারতের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সুদক্ষ সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন (৬৩৪ খৃঃ)। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে দক্ষিণ ভারত বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ নর্মদা নদীর উপকূলেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় পুলকেশী 'পরমেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম ভারতে হর্ষবর্ধন সৌরাষ্ট্রের বলভী রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বলভীর রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেন পরাজিত হন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী অনুসারে হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন।

হর্ষবর্ধন সিন্ধুদেশ ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধেও একাধিক সামরিক অভিযান

চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ ও ফলাফল সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধনের সিন্ধুদেশ অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা (Extent of Harsha's Kingdom): অতিরঞ্জিত ভাষায় হর্ষবর্ধনকে 'উত্তরাপথের সর্বাধিনায়ক' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই যুগের শিলালিপি ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে তাঁহার সাম্রাজ্য অধিক-দূর বিস্তৃত ছিল না। যদিও তাঁহাকে উত্তর ভারতের সার্বভৌম রাজা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছিল এবং বলভী ও কামরূপের নৃপতিগণ সময় সময় তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সমগ্র উত্তর ভারতে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। ডক্টর মজুমদারের মতে থানেশ্বর ও কনৌজ ব্যতীত পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, নেপাল ও কামরূপ প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল। পানিকরের মতে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরস্থ সকল দেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু পানিকরের মতামত সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। দক্ষিণ ভারতে হর্ষের রাজ্যসীমা নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উত্তর ভারত

দক্ষিণ ভারত

হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা (Administration of Harsha): হর্ষবর্ধন ছিলেন প্রজাহিতৈষী রাজা। তিনি শাসনকার্যে রাজার ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি ছিলেন শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্র। হিউয়েন-সাং-এর বিবৃতি অনুযায়ী হর্ষবর্ধন দিবসের অধিকাংশ সময়ই রাজকার্য পরিচালনায় অতিবাহিত করিতেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া শাসনকার্য সম্পর্কে অবহিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তায় তিনি বিশ্বাস করিতেন। জনসাধারণের সুখ-সুবিধা ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্য পালন সম্পর্কে নিজেকে সর্বদাই অবহিত রাখিতে তিনি যত্নবান থাকিতেন। রাজ্য পরিভ্রমণকালে তিনি জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করিতেন।

প্রজাহিতৈষী রাজা

রাজকর্তব্য সম্বন্ধে হর্ষের ধারণা

রাজা একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজা-নির্বাচন ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত। রাজ্যবর্ধনের অকাল মৃত্যু হইলে মন্ত্রিপরিষদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন।

মন্ত্রিপরিষদ


হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য
(৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)
পামীর মালভূমি
কাপিশ
হিন্দুকুশ পর্ব্বত
কাশ্মীর
শ্রীনগর
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
চন্দ্রভাগা নদী
ইরাবতী নদী
জলন্ধর
শতদ্রু নদী
সিন্ধুনদী
থানেশ্বর
তিব্বত
গুর্জ্জর
ইন্দ্রপ্রস্থ
মথুরা
শ্রাবস্তী
কনৌজ
হিমালয় পর্ব্বত মালা
নেপাল
সিন্ধু
বৈশালী
পুন্ড্রবর্দ্ধন
পাটলিপুত্র
কামরূপ
চম্বল নদী
প্রয়াগ
কাশী
নালন্দা
মালব
কচ্ছ
উজ্জয়িনী
সাঁচী
শোন নদী
বুদ্ধগয়া
কর্ণসুবর্ণ
বঙ্গ
সমতট
সুরাষ্ট্র
বলভী
নর্ম্মদা নদী
বিন্ধ্য পর্ব্বত
তাপ্তী নদী
তাম্রলিপ্ত
চালুক্য
দ্বিতীয় পুলকেশী
মহানদী
কলঙ্গোদা
গঞ্জাম
কলিঙ্গ
পূর্ব্ব চালুক্য
বাতাপী
কৃষ্ণানদী
নেলোর
কাবেরীনদী
কাঞ্চি
চোলরাজ্য
পাণ্ড্যরাজ্য
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে 'অবন্তি', (পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী), 'সিংহনাদ' (প্রধান সেনাপতি), 'কুন্তল' (অশ্ববাহিনীর প্রধান কর্মচারী), 'মহাসামন্ত', 'মহারাজা', 'রাজস্থানীয়' 'কুমারামাত্য', 'উপরিক', 'বিষয়পতি' ইত্যাদি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। 'কুমারামাত্য'গণ ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইহাদের মধ্য হইতে মন্ত্রী, সচিব ও জেলার কর্মচারীগণ নিযুক্ত হইতেন। রাজকর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেন।

রাজকর্মচারী বৃন্দ

মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় না। প্রদেশ বা 'ভুক্তি'গুলি একাধিক 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন শাসন বিভাগ। গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' নামক কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। তিনি 'করনিক' নামক কর্মচারীর সাহায্যে গ্রাম্যশাসন পরিচালনা করিতেন।

'ভুক্তি,' 'বিষয়' ও গ্রাম

হর্ষবর্ধন সামরিক বিভাগে বিবিধ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সামরিক বিভাগ পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী, রণহস্তী এই চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অশ্ব সিন্ধু, পারস্য ও কম্বোজ হইতে সংগ্রহ করিতেন। সাধারণ সৈনিকগণ 'চত্' ও 'ভট্' নামে পরিচিত ছিল। অশ্ববাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ 'বৃহদশ্বর' নামে অভিহিত হইতেন। পদাতিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ 'বলাধিকৃত' ও 'মহাবলাধিকৃত' নামে অভিহিত হইতেন।

সামরিক বিভাগ

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিন প্রকারের কর প্রচলিত ছিল। যথা—'ভাগ', 'হিরণ্য' ও 'বলি'। ভূমি-রাজস্বকে 'ভাগ' বলা হইত এবং ইহা শস্য দ্বারা প্রদত্ত হইত। কৃষক ও বণিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর—'হিরণ্য নামে পরিচিত ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে ধার্য করা হইত। হিউয়েন-সাং-এর মতে করপ্রথা ছিল উদার। রাজার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগের আয় রাজ্য-শাসন ব্যাপারে ব্যয়িত হইত। দ্বিতীয় ভাগের আয় রাজকর্মচারীদের ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইত। তৃতীয় ভাগের আয় গুণী ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইত এবং চতুর্থ ভাগের আয় ধর্মকর্মে ব্যয়িত হইত।

রাজস্ব

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। সাধারণ অপরাধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড এবং গুরুতর অপরাধে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় অপরাধ নির্ণয়ের জন্য অগ্নি, জল, তুলাদণ্ড প্রভৃতি দৈব পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত

ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও হর্ষবর্ধনের আমলে অপরাধের সংখ্যা গুপ্তযুগ অপেক্ষা অধিক ছিল। দস্যু তস্করের উপদ্রব লাগিয়াই থাকিত। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি একাধিকবার দস্যু কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

দণ্ডবিধি

হর্ষবর্ধনের ধর্ম (Religion of Harsha) ঃ সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষগণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। প্রভাকরবর্ধন যে সূর্যের উপাসক ছিলেন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধন নিজে রাজত্বের প্রথম পঁচিশ বৎসর শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু রাজত্বের শেষের দিকে তিনি মহাযান বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, তাঁহার এই ধর্ম পরিবর্তনের জন্য রাজশ্রী ও হিউয়েন-সাং কতক পরিমাণে দায়ী ছিলেন। অশোকের ন্যায় হর্ষবর্ধন রাজ্যমধ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বহু বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

রাজত্বের প্রথম ২৫ বৎসর শৈব

রাজত্বের শেষার্দ্ধে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি আসক্ত হইলেও বস্তুতঃ হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন না এবং আজীবন শিব ও সূর্যের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্ধনের আমলে বৌদ্ধধর্ম মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। জৈনধর্মও উত্তর-বিহার এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোথাও জনপ্রিয় ছিল না। সেই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মই অধিক প্রবল ছিল এবং বিষ্ণু, সূর্য ও শিবের উপাসনা বহুল প্রচলিত ছিল। হর্ষবর্ধন সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অশোকের ন্যায় তিনিও বহু সরাইখানা, বিশ্রামাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য

সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

হর্ষবর্ধনের বিদ্যোৎসাহীতা (Harsha's Literary Activities) ঃ হর্ষবর্ধন স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের পরম পৃষ্টপোষক ছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি রাজস্বের এক চতুর্থাংশ সাহিত্য সেবীদের জন্য ব্যয় করিতেন। তাঁহার রাজসভায় বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত অবস্থান করিতেন। ইহাদের মধ্যে বাণভট্টের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কবি মৌর ও কবি ভর্ত্রিহরিও তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ষের প্রচুর দান ছিল এবং তাঁহার সময় নালন্দা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

হর্ষবর্ধন যে শুধু বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাহা নহে, তিনি নিজেও একজন খ্যাতনামা নাট্যকার ও কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'নাগনন্দা', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' সুধী সমাজে আদৃত হইয়াছিল।

হর্ষের রচনা

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব (**Harsha's Achievements**) : হর্ষবর্ধন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ এবং প্রজাহিতৈষী রাজা। তিনি রণকুশল সমরনায়ক ছিলেন সত্য কিন্তু সকল সময় তিনি সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, দক্ষিণ ভারত ছাড়িয়া দিলেও, তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উহা দীর্ঘস্থায়ী করিবার কোন সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, তিনি শাসনকার্যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন এমন কথাও বলা যায় না। কারন তাঁহার সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব্য ও শান্তিপূর্ণ ছিল না। দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রবের ফলে জনসাধারণের ধন ও প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন তাঁহার শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

হর্ষবর্ধন দিগ্বিজয়ী বীর ও সুশাসক ছিলেন না

অনেকে হর্ষবর্ধনকে প্রাচীন যুগের শেষ সাম্রাজ্য-স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অনুমান সত্য নহে। কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতে একাধিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং শক্তি ও গৌরবের দিক দিয়া এই সাম্রাজ্যগুলি হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের তুলনায় কোন অংশেই হীন ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ প্রতিহার সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যদিও হর্ষবর্ধনকে প্রাচীন যুগের শেষ সাম্রাজ্য-স্রষ্টা ও দিগ্বিজয়ী বীর বলা যায় না তথাপি বহু দিক দিয়া তাঁর রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে প্রথম এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক অনৈক্য, অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল হর্ষবর্ধন সেই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া উত্তর ভারতের অখণ্ডতা বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শত্রু ও বিজেতা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে 'সকলোওরা পথনাথ (উত্তরাপথের প্রভু) নামে অভিহিত করিয়া ছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্ধন কর্তৃক আহূত কনৌজ ধর্ম সম্মেলনে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন ও বলভী-রাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন সহ প্রায় কুড়িজন অনুগত নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং উত্তর ভারতের নৃপতিগণের উপর তিনি যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(১) উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরুদ্ধার

চালুক্যরাজ কর্তৃক সকলোওরা পথনাথ উপাধিতে ভূষিত

কনিষ্কের সময় ভারত ও চীনের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল—তাহা হর্ষবর্ধনের আমলেও অক্ষুণ্ণ ছিল। হর্ষবর্ধনের সহিত চীন সম্রাটের দুইবার রাষ্ট্রদূত বিনিময় হইয়াছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্ধনের সহিত পারস্য সম্রাটের রাষ্ট্রদূত বিনিময় হইয়াছিল।

(২) চীনের সহিত সম্পর্ক

(৩) পারস্যের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময়

শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল স্মরণীয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এই যুগের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল। হর্ষবর্ধন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য সেবীদের পরম পৃষ্ঠপোষক। সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি তাঁহার রাজত্বকালের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(৪) শিক্ষা ও সাহিত্য

সম্রাট অশোকের পর হর্ষবর্ধনের ন্যায় প্রজাহিতৈষী রাজা প্রাচীন ভারতে আর আবির্ভূত হন নাই। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী অনুসারে হর্ষবর্ধন দিবারাত্র প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি সজাগ থাকিতেন। তাঁহার দানশীলতা চৈনিক পরিব্রাজককে মুগ্ধ করিয়াছিল। কথিত আছে প্রয়াগের ধর্ম-সম্মেলনে হর্ষবর্ধন মুক্ত হস্তে দান করিয়া কপর্দক শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। দানশীলতার এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অশোকের ন্যায় তিনিও প্রজাদের সুবিধার জন্য সরাইখানা, বিশ্রামাগার, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহুবিধ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন ছিলেন অশেষ গুণাবলীর অধিকারী। পিতৃভক্তি, ভগ্নিপ্রীতি, ধর্মপ্রাণতা, গুণগ্রাহিতা ও দানশীলতা তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে। সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার উদারতা ছিল অপরিসীম। "অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের চারিত্রিক গুণাবলীর এক অপূর্ব সমাবেশ হর্ষবর্ধনের চরিত্রে দেখা যায়" (আর-কে-মুখার্জী)। বিজেতা, প্রজাহিতৈষী শাসক, সাহিত্যিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে হর্ষবর্ধনকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যাইতে পারে।

(৫) প্রজাহিতৈষী রাজা

অশেষ গুণাবলীর অধিকারী

অশোক ও আকবরের সহিত হর্ষবর্ধনের তুলনা ঃ হর্ষবর্ধনকে অশোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নিতান্তই সামান্য। অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। বৌদ্ধধর্মের উন্নয়ন ও উহার বিস্তার কল্পে অশোক সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন মাত্র। তিনি স্বীয় ধর্মের উন্নয়ন ও উহার বিস্তারকল্পে কখনই অশোকের ন্যায় আত্মনিয়োগ করেন নাই।

অশোক অপেক্ষা আকবরের সহিত হর্ষবর্ধনের তুলনা করা যাইতে পারে। মোগল সম্রাটের ন্যায় হর্ষবর্ধনও ছিলেন উদার ও ধর্ম সহিষ্ণু। আকবরের ন্যায় হর্ষবর্ধনও ধর্মীয় আলোচনায় আনন্দ পাইতেন বটে কিন্তু ধর্মান্ধতা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। 'ইবাদৎখানা'-র ধর্মীর আলোচনা হইতে 'দীন ইলাহি' ধর্মমতের উৎপত্তি হইয়াছিল কিন্তু হর্ষবর্ধনের ধর্মীয় আলোচনা হইতে সেইরূপ কোন ধর্মমতের উৎপত্তি হয় নাই। আকবরের ন্যায় হর্ষবর্ধনও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনিও যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (Nalanda University): হিউয়েন-সাং ও ইৎ-সিং-এর বিবরণী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা বর্তমান পাটনা জেলায় আবস্থিত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতের ইহা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। আধুনিক-কালের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই যুগে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান লাভ করিয়াছিল।* খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তসম্রাটগণ কর্তৃক বৌদ্ধ-সংঘ হিসাবে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিগণ ও বিত্তশালীদের চেষ্টায় ও অর্থে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রতিষ্ঠা

আটটি বিভিন্ন কলেজ বা শিক্ষায়তন লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত ছিল। এইগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা-দের মধ্যে শ্রীবিজয় (সুমাত্রা) রাজ্যের রাজা বালপুত্রদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজগুলি ছিল সারিবদ্ধ। যশোধর্মদেবের অনুশাসন লিপিতে শিক্ষায়তনগুলির গঠন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

নালন্দার বিভিন্ন শিক্ষায়তন

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু সুরম্য অট্টালিকার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল না। তথায় ছাত্রদের পঠন-পাঠনেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি

* বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন কেরল রাজ্যে বৈদিক ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীতেও দুইটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা-দানের জন্য তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়টিও এক সময় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। নালন্দার সন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময় শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে হূনগণ কর্তৃক তক্ষশীলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

লাইব্রেরী বা পাঠাগার ছিল। এইগুছিল নাম ছিল (১) 'রত্ন সাগর', (২) 'রত্ন দধি' ও (৩) 'রত্নরঞ্জক'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিল বহিরাগত—যেমন মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, সিংহল জাপান প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ইৎ-সিং-এর বিবরণীতে 'হুইনিয়ে' ও 'আর্যবর্মন' নামে দুইজন কোরিয় পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদেশিক ছাত্র

শুধু যে বৈদেশিক ছাত্র ও পণ্ডিতগণই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিতেন এমন নহে, এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও বহু ছাত্র ও পণ্ডিতগণ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিব্বতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত পণ্ডিতগণের মধ্যে সংরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, বুদ্ধকীর্তি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সহায়ক

বস্তুতঃ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধগণের নিকট ইহা ছিল এক পরম পবিত্র ভূমি। অবশ্য কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছাড়াও বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। হিউয়েন-সাং-এর সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র। অধ্যক্ষ হিসাবে ধর্মপাল, জিনমিত্র, বসুবন্ধু, প্রভামিত্র, আর্যদেব প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবারাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। তথায় শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণ একত্রে অধ্যয়ন ও আলোচনার সুযোগ লাভ করিত। বিভিন্ন বিষয়ের বিতর্ক আলোচনা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। হিউয়েন-সাং বহুবার এইরূপ বিতর্ক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

পঠন-পাঠন

শিক্ষা-স্বাধীনতা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণই ভর্তি হইবার সুযোগ পাইত। পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র গ্রহণ করা হইত এবং এইরূপ পরীক্ষার মান ছিল উচ্চ। হিউয়েন-সাং-এর কথায় "বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই দেশ-দেশান্তর হইতে পণ্ডিতগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিতেন"। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে খুবই উচ্চ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় নির্বাহের জন্য উহার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। প্রায় ১৮০টি গ্রামের আয় হইতে নালন্দার ব্যয় নির্বাহ হইত।

শিক্ষার উচ্চ মান

নালন্দার আয়

ইৎ-সিং-এর ভারত ভ্রমণের পরও প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় ছিল। ইহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৌদ্ধধর্মেরও বিলুপ্তি ঘটে।

নালন্দার বিলুপ্তি

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ (Accounts of Hiuen Tsang): চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন। চীনের হুনান প্রদেশে এক অভিজাত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে সাং-লুইয়াং-এর বৌদ্ধ মঠে যোগদান করেন এবং কুড়ি বৎসর বয়সে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার 'সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর' সুশ্রী অবয়ব, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা তাঁহার প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চীনা ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মের নানা ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হইয়া তিনি মূল বৌদ্ধ শাস্ত্রের সন্ধানে ভারতে আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা

ভারত আগমনের উদ্দেশ্য

বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া তুরফান, কুচা, সমরখন্দ, কপিশা ও পেশোয়ারের ভিতর দিয়া তিনি কাশ্মীরে উপস্থিত হন (৬৩০ খৃঃ)। হিউয়েন-সাং-এর পাণ্ডিত্যের কথা ইতিমধ্যেই বৌদ্ধ-দেশগুলিতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। কাশ্মীরের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ও কাশ্মীরের রাজা দুর্লভবর্মণ চৈনিক পরিব্রাজককে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইলেন। হিউয়েন-সাং কাশ্মীরে অবস্থানকালীন সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে উহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশ্মীর হইতে তিনি শিয়ালকোটে আগমন করেন। তথায় পণ্ডিত বিনীতপ্রভর নিকট হীনযান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধদের নিকট মথুরাও সেই সময় পরম পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হইত। মথুরার পর হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজে আগমন করেন (৬৩৬ খৃঃ)। তথায় কিছুদিন তিনি ত্রিপিটক নামক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি নৌকাযোগে প্রয়াগ, বারাণসী ও বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি শ্রাবস্তীপুর ও কপিলাবস্তুতে আগমন করেন। তিনি শ্রাবস্তীপুরে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য শ্রেষ্ঠী অনাদপিণ্ডের ধ্বংসস্তূপে পরিণত প্রাসাদটি ও কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর আবাস-গৃহ ও অশোক-স্তম্ভ দর্শন করেন। ইহার পর তিনি বৈশালী হইয়া পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি দুইবার নালন্দায় অবস্থান করিয়া বাংলাদেশ ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। ইহার পর তিনি উড়িষ্যার ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যের পল্লব ও চালুক্য-রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া হিউয়েন-সাং মধ্য-এশিয়ার পথে

ভারত অভিমুখে যাত্রা

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে উধিত নামে জনৈক রাজা তাঁহাকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন-সাং চীনে ফিরিয়া আসেন। পথে বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও তিনি বহু বৌদ্ধ মূর্তি ও ৬৫৭টি পাণ্ডুলিপি স্বদেশে লইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ভারতীয় পাণ্ডুলিপিগুলির অনুবাদ করেন। হিউয়েন-সাং-এর জীবনী তাঁহার বন্ধু হুই-লি কর্তৃক রচিত হয়।

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণীর ঐতিহাসিক মূল্য

স্মিথের মন্তব্য

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী অত্যন্ত মূল্যবান। ইহা হইতে সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণীর মূল্য প্রসঙ্গে স্মিথ যথার্থ ই মন্তব্য করিয়াছেন, "It is impossible to over estimate the debt which the history of India owes to Hiuen-Tsang"।

হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের মূল বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) **হর্ষের শাসনব্যবস্থা**: প্রায় আট বৎসর (৬৩৫-৬৪৩ খৃঃ) হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহ ও সখ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্ধন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনে তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং রাজ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। শাসনকার্য ছিল রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মৌর্য সম্রাটদের ন্যায় হর্ষবর্ধনের শাসনপ্রণালী আমলাতান্ত্রিক ছিল না। গুপ্তসম্রাটদের ন্যায় হর্ষবর্ধনেরও একটী মন্ত্রিপরিষদ ছিল। প্রদেশগুলি সাধারণতঃ অনুগত সামন্তগণ কর্তৃক শাসিত হইত। হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধনের রাজকর্তব্যবোধের ভূয়সী প্রসংসা করিয়াছেন।

রাজার ব্যক্তিগত পরিদর্শন

(২) **হর্ষের সৈন্যবাহিনী**: হর্ষবর্ধন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতেন। হিউয়েন-সাং-এর বর্ণনা অনুসারে হর্ষবর্ধনের পদাতিক, অশ্ববাহিনী ও হস্তীবাহিনীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০ হাজার, একলক্ষ ও ৬০ হাজার। সৈন্যবাহিনী ছিল সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত। সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল সুরক্ষিত।

(৩) **রাজস্ব**: ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য করের পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও বেগার খাটান হইত না। রাজার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ভাগের আয় নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা হইত। ব্যবসায়ী ও বণিকগণের নিকট হইতে নির্দিষ্ট শুল্ক আদায় করা হইত। বণিকগণ

যাহাতে রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক অনর্থক উৎপীড়িত না হয় সেদিকে রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত।

(৪) **শিক্ষা** ঃ হর্ষবর্ধন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেই যুগের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র এবং হর্ষবর্ধন এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। সেইযুগে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল অধিক। বৌদ্ধ মঠগুলি ছিল প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। সাধারণ লোকের ভাষা ছিল ব্রাহ্মী। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচলন ছিল। নয় বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যার্জনের রীতি প্রচলিত ছিল। ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যার্থীগণ কর্মজীবনে প্রবেশ করিত।

(৫) **দণ্ডবিধি** ঃ গুপ্তযুগের তুলনায় হর্ষবর্ধনের আমলে দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব লাগিয়াই থাকিত। হিউয়েন-সাং নিজেই একাধিকবার দস্যু কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া সর্বস্ব হারাইয়াছিলেন।

(৬) **ধর্ম** ঃ হিউয়েন-সাং-এর সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল এবং হিন্দু ধর্ম ধীরে ধীরে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। হর্ষবর্ধন সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। জৈন ধর্ম একমাত্র উত্তর বিহার এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গেই জনপ্রিয় ছিল।

(৭) **ধর্মসভা** ঃ হিউয়েন-সাং হর্ষবর্ধন কর্তৃক কনৌজে আহূত ধর্মসভা ও প্রয়াগের ধর্মসভার মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন কনৌজে একটি ধর্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু সহস্র বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু সহস্র দর্শক ও ৮০ জন সামন্ত নরপতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে একটি স্বর্ণ নির্মিত বুদ্ধমূর্তিসহ পঞ্চশত সুসজ্জিত হস্তীর একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইত। হর্ষবর্ধন চামর হস্তে বুদ্ধমূর্তির পশ্চাতে উপবিষ্ট থাকিতেন। শোভাযাত্রাটি নগরের বাহিরে একটি নবনির্মিত মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া সমাপ্ত হইত এবং বুদ্ধের উদ্দেশ্যে অর্ঘ নিবেদিত হইত। প্রতিদিন হর্ষবর্ধন ধনরত্ন বিতরণ করিতেন। অষ্টাদশ দিন ব্যাপী ধর্মসভার অধিবেশনে চলিয়াছিল। কথিত আছে বৌদ্ধধর্মের প্রতি হর্ষবর্ধনের অনুরাগে ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণকে বন্দী করা হইলে তাঁহারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেন। ইহাদের মধ্যে কতক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং কতক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কনৌজের ধর্মসভা

(৮) **প্রয়াগের মেলা**ঃ কনৌজের ধর্ম সভার পর হর্ষবর্ধন হিউয়েন-সাংকে লইয়া প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলায় গমন করেন। প্রয়াগের মেলা 'মহামোক্ষ ক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল। তিনমাস ধরিয়া প্রয়াগের ধর্মমেলায় উৎসবানুষ্ঠান চলিত। ইহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত। ইহা ছাড়া কুড়িটি রাজ্যের নৃপতিগণও ইহাতে যোগদান করিতেন। উৎসবের প্রথম দিনে একটি অস্থায়ী মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হইত এবং বহু মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ দর্শকগণের মধ্যে বিতরণ করা হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে সূর্য ও মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করিয়া উহাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করা হইত এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ধনরত্ন ও বস্ত্রাদি দান করা হইত। চতুর্থ দিনে দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করা হইত। প্রতিটি ভিক্ষুকে একশত স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রাদি দান করা হইত। ইহার পর কুড়ি দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এবং পরবর্তী দশ দিন ধরিয়া জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনরত্ন ও বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইত। ইহার পর দেড়মাস ধরিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত দরিদ্র ও অনাথগণের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ দান করা হইত। হিউয়েন-সাং-এর কথায় "এইভাবে তিনমাসের মধ্যে একমাত্র অশ্ব, হস্তী, ও সামরিক উপকরণ ছাড়া রাজ্যের রাজকোষ ও রাজার পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত অর্থাদি নিঃশেষ হইয়া যায়।" কথিত আছে যে সর্বস্ব দানের পর হর্ষবর্ধন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখণ্ড বস্ত্র লইয়া ধর্মমেলা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ বিরাট দানের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

(৯) **ভারতীয়দের সরলতা ও সাধুতা**ঃ হিউয়েন-সাং ভারতীয়দের সাধুতা, সরলতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে বেশভূষার বিশেষ বাহুল্য ছিল না এবং উহারা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত। একমাত্র বিত্তশালীদের মধ্যেই বেশভূষা ও অলঙ্কারের বহুল প্রচলন ছিল।

হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-কর্ম লইয়াই জীবনযাপন করিত। ক্ষত্রিয়গণ ছিলেন শাসক শ্রেণী। সেই যুগের নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ক্ষত্রিয়। বৈশ্যগণের উপজীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। শূদ্রগণ কৃষিকার্যে ও গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিত। সমাজে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় ছিল। হিন্দু সমাজ বিভিন্ন বর্ণে বা জাতিতে বিভক্ত থাকিলেও উহাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কে ছিল। হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে পর্দা-প্রথার প্রচলন ছিল না। সতীদাহ-প্রথা সেই যুগেও প্রচলিত ছিল।

(১০) **নগর ঃ** হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে সেই সময়কার ভারতের প্রধান শহরগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। হূনরাজ মিহিরকুলের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ভারতের দুইটি প্রাচীন শহর তক্ষশীলা ও পেশোয়ার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। প্রভরপুর (আধুনিক শ্রীনগর) একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। জলন্ধর ও মথুরা শহর দুইটির পূর্ব গৌরব বিনষ্ট হইয়াছিল। হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ সেই সময় সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল। শহরটি দৈর্ঘ্যে ছিল পাঁচ মাইল। ইহা চতুর্দিকে সু-উচ্চ প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। হিউয়েন সাং কনৌজ নগরীকে তদানীন্তন উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিককালের ন্যায় সেই যুগেও প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হিন্দুধর্মের প্রধান পীঠস্থান ছিল। এই শহরে ধর্মযাত্রী ও সন্ন্যাসীদের বিপুল সমাবেশে দেখিয়া হিউয়েন-সাং বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। আধুনিক কালের ন্যায় সেযুগের বারাণসী শহরটি হিন্দুদের নিকট পরম পবিত্র ছিল। এই শহরের অগণিত মন্দির ও ইহার সমৃদ্ধি চৈনিক পরিব্রাজককে বিস্মিত করিয়াছিল। বারাণসীর হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যও তাঁহকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হিউয়েন-সাং এর সময় পাটলিপুত্রের পূর্ব গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ইৎ-সিং-এর ভারত বৃত্তান্ত (Itsing's Account of India) ঃ হিউয়েন-সাং-এর পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭২ হইতে ৬৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন ভারতের সমাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের এক মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার ধর্ম প্রচারেরও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইৎ-সিং বলেন যে বুদ্ধ সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই অতি সহজবোধ্য ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

ইৎ-সিং ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্য সামগ্রীর পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে আহারের সময় উহারা একত্রে বসিলেও পৃথক পৃথক পাত্রে আহার করিত এবং আহার সমাপ্তির পর পরিষ্কার করিয়া হাত মুখ ধুইত।

ইৎ-সিং গ্রাম্য-সংঘ কর্তৃক কৃষিকার্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শস্য সংগ্রহের পর তাহা ছয় ভাগে ভাগ করা হইত এবং সংঘ এক-ষষ্ঠাংশ ভাগ পাইত।

ইৎ-সিং নালন্দার বৌদ্ধ মঠের ব্যবহারিক রীতি-নীতির কঠোরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নালন্দার মঠে প্রায় ৩০০০ ভিক্ষু বসবাস করিতেন। এই মঠের ব্যয় দুইশত গ্রামের রাজস্ব হইতে নির্বাহ হইত।

ইৎ-সিং বলেন যে তাঁহার সময় ভারত আর্যদেশ নামে পরিচিত ছিল।

তাঁহার সময় ভারত মধ্যদেশ নামেও অভিহিত হইত কারণ ইহা ছিল বহু শত দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর্যদেশ ও মধ্যদেশ এই দুইটি নামই ভারতীয়দের নিকট সুপরিচিত ছিল।

ইৎ-সিং-এর বর্ণনা হইতে সেই সময়কার শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহার মতে সেই যুগে শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা ছিল কষ্টসাধ্য। ছাত্রগণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। সূত্রশাস্ত্র, কাব্য ও তর্কশাস্ত্র ছিল প্রধান পাঠ্যসূচী। সূত্রশাস্ত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত।

কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস
(Early History of Kamrupa)

প্রাচীনকালে বর্তমান আসাম ও কুচবিহার কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারত, পুরাণ ও তান্ত্রিক সাহিত্যে কামরূপ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এই রাজ্যের সঠিক সীমারেখা কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। মহাভারতে কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে পরিচিত। মহাভারত অনুসারে এই রাজ্য দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালিকা পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে কামরূপ রাজ্যের আয়তন ও সীমারেখা ভিন্নরূপে বর্ণিত আছে। গুপ্তযুগে কামরূপ গুপ্তসাম্রাজ্যের করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সংবাদ হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে কামরূপে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে হিন্দু-রাজা ভাস্করবর্মণের শাসনাধীনে কামরূপ রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ভাস্করবর্মণের অধীনে কামরূপ রাজ্য সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কুচবিহার ও ভূটান লইয়া গঠিত ছিল। ভাস্করবর্মণ ছিলেন হর্ষবর্ধনের করদ-মিত্র রাজ। বাংলা দেশে শশাঙ্কের অভ্যুত্থানে আশঙ্কিত হইয়া ভাস্করবর্মণ হর্ষবর্ধণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ভাস্করবর্মণের নিধনপুর তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্মণের হস্তগত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ভাস্করবর্মন

ভাস্করবর্মণের মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার রাজবংশের পতন ঘটে। ইহার পর শলস্তম্ভ নামে জনৈক ম্লেচ্ছ রাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগন কিছুদিন কামরূপে রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীতে পাল বংশীয়

নৃপতিগণ কামরূপের কর্তৃত্বলাভ করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন রত্নপাল। ইহার প্রায় দুই শতাব্দী পর কামরূপ বাংলার পালরাজগণের করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়।

প্রশ্নমালা

1. Give an account of the Hunas during the Post-Gupta period.
2. Sketch the career of Harsavardhana.
3. Give an estimate of Harsavardhana's achievements.
4. Describe Harsavardhana as a conqueror and an administrator.
5. What light is thrown on the condition of India by Hiuen-Tsang ?
6. Give an estimate of Hiuen-Tsang's Account of India.

ষষ্ঠ অধ্যায়

হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারত

(Northern India in the Post-Harsha Period)

এই যুগের বৈশিষ্ট্য : পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণ ও অন্যান্য বৈদেশিকগণের একাধিক আক্রমণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও হিন্দু সমাজে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল হর্ষবর্ধন তাহা প্রতিহত করিয়া কিছু দিনের জন্য উত্তর ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়া উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে নূতন করিয়া রাষ্ট্রবিন্যাস দেখা দেয়। সপ্তম শতাব্দীতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা হইল। ভারতে প্রাচীন যুগের অবসান হইয়া মধ্য যুগের সূত্রপাত হইল। এই যুগসন্ধিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ভারতীয় সমাজে রাজপুত জাতির উদ্ভব। হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজপুতগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগে ভারতের অধিকাংশ রাজপরিবারই ছিল রাজপুত বংশ সম্ভূত। এই কারণে অনেকে হর্ষবর্ধনের পর

(১) প্রাচীন যুগের অবসান : মধ্যযুগের আরম্ভ

(২) রাজপুত জাতির উদ্ভব

হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত এই সময়টিকে রাজপুত যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল এই যে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল এবং ভারত বহু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন সার্বভৌম রাজশক্তির অস্তিত্ব না থাকায় বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।

(৩) ভারত বিভক্ত

রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত ছিল। ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনার দ্বারা এই যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

(৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত

ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রেও এই যুগ নিষ্ক্রীয় ছিল না। বৌদ্ধধর্মের ক্রম বিলুপ্তি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রমুখ ধর্মগুরুর আবির্ভাব এই যুগের ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়াছিল।

(৫) ধর্মজীবনে যুগান্তর

কনৌজ ঃ ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন পরলোক গমন করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় তাঁহার সাম্রাজ্য সুশাসিত ছিল না। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না এবং রাজ্যের শাসনযন্ত্রও শক্তিশালী ছিল না। ফলে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং অনতিকাল মধ্যেই উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এই অবস্থায় অর্জুন নামে হর্ষবর্ধনের এক মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন দখল করিলেন। এই সময় হর্ষবর্ধনের নিকট প্রেরিত চীনের রাজদূত (ওয়াং-হিউয়েন-সি) কনৌজে আগমন করিলে অর্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে হত্যা করিলেন। রাজদূত কোনক্রমে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইলেন। সেই সময় নেপাল তিব্বতের অধীন ছিল। তিব্বতের রাজা ছিলেন চীন সম্রাটের জামাতা। চীন রাজদূতের নির্যাতনের সংবাদে তিব্বতের রাজা অর্জুনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অর্জুন পরাজিত হইয়া বন্দীরূপে চীনে প্রেরিত হইলেন। ত্রিহুত অঞ্চলে তিব্বতের শাসন স্থাপিত হইল এবং ৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিহুত তিব্বত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরায় বিনষ্ট হইল। *

* "The disappearance of Harsha from the scean blurred the picture of North India from the point of view of imperial unity."—Panikkar

অর্জুনের মৃত্যুর পর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কনৌজের ইতিহাস ছিল তমসাবৃত। ইহার পর কনৌজের ইতিহাসে যশোবর্মন নামে এক শক্তিশালী রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। শশাঙ্ক ও যশোধর্মনের ন্যায় যশোবর্মনও ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী সমর নায়ক।

যশোবর্মন (৭২৫-৭৪০)

যশোবর্মনের বংশ পরিচয় জানা যায় না। তাঁহাকে মধ্য-ভারতের রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাক্‌পতি কর্তৃক রচিত 'গৌড়-বহ' নামক কাব্য হইতে জানা যায় যে যশোবর্মন গৌড় রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় জীবিত-গুপ্তকে পরাজিত করিয়া মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। বাংলার সামন্তগণের চাপে পড়িয়া জীবিত-গুপ্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া যশোবর্মনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশের রাজা পরাজিত হন এবং সমগ্র বাংলা দেশ যশোবর্মনের অধিকারভুক্ত হয়।

যশোবর্মনের রাজ্য বিস্তার

বাংলাদেশ জয়

বঙ্গ বিজয় সম্পন্ন করিয়া যশোবর্মন দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। নর্মদা নদীর উপকূল ধরিয়া তিনি পশ্চিম-ঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ইহার পর তিনি উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়া মরুদেশ (রাজপুতানা), ও শ্রীকণ্ঠ (থানেশ্বর) স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার

উপরোক্ত রাজ্য বিস্তারের কাহিনীর সত্যতা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে সেই যুগে যশোবর্মন যে একজন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীন সম্রাটের সহিত তাঁহার কূটনৈতিক সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্মন চীন সম্রাটের নিকট রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রদূত প্রেরণের উদ্দেশ্য জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিব্বত রাজ্যের আক্রমণ হইতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি চীন সম্রাটের সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সম্ভবতঃ আরব জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবেও যশোবর্মন চীন সম্রাটের সহযোগিতালাভে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

চীনের সহিত সম্পর্ক

যশোবর্মন যে শুধু পরাক্রান্ত নরপতি ও খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন এমন নহে। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যেরও পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বাক্‌পতি, ভবভূতি প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন।

যশোবর্মণের বিদ্যোৎসাহিতা

৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে যশোবর্মন রাজত্ব করেন। তাঁহার যশ ও

প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য সামান্য কারণে কনৌজ রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে যশোবর্মন পরাজিত হইয়া নিহত হন এবং তাঁহার রাজ্য ললিতাদিত্যের রাজ্যভুক্ত হয়।

কাশ্মীর রাজের সহিত যুদ্ধ ও মৃত্যু

কাশ্মীর রাজ্যঃ কাশ্মীর রাজ্যের পূর্ব-ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। কাশ্মীর মৌর্য ও কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু গুপ্ত শাসনকালে সম্ভবতঃ কাশ্মীর স্বাধীন হইয়া যায়। কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাসের প্রধান উপাদান কল্‌হন্-রচিত রাজতরঙ্গিনী অনুযায়ী জানা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে দুর্লভবর্ধন নামে জনৈক সামন্ত কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করিয়া কার্কট-বংশ নামে এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। কাশ্মীরের রাজপরিবারের সহিত দুর্লভবর্ধনের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। দুর্লভবর্ধনের রাজত্বকালেই হিউয়েন-সাং কাশ্মীর পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বৃত্তান্ত অনুসারে পশ্চিম পাঞ্জাব পর্যন্ত দুর্লভবর্ধনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দুর্লভবর্ধনের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ছিলেন সুশাসক ও প্রতাপ পুর নামক নগরের প্রতিষ্ঠাতা।

দুর্লভবর্ধন কর্তৃক কার্কট বংশের প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র চন্দ্রাপীড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় মহম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে আরবগণ কাশ্মীর-সীমান্তে আক্রমণ শুরু করিলে চন্দ্রাপীড় চীন-সম্রাটের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ চীন সম্রাটের বিনা সাহায্যেই চন্দ্রাপীড় আরবগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন। আট বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি তাঁহার ভ্রাতা তারাপীড় কর্তৃক নিহত হন।

চন্দ্রাপীড় (৭১৩-৭২১)

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন চন্দ্রাপীড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতাদিত্য 'মুক্তাপীড়'। ৭২৪ হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন যুদ্ধপ্রিয় এবং সমগ্র জীবন যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তারে নিয়োগ করেন। কনৌজের রাজা যশোবর্মনের ন্যায় তিনিও তিব্বতের বিরুদ্ধে চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। কনৌজের ন্যায় কাশ্মীর রাজ্যের পক্ষেও তিব্বত রাজ্যের আক্রমণাত্মক মনোভাব আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ললিতাদিত্য কনৌজ-রাজ যশোবর্মনের

লহিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭২৪-৭৬০)

তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান

সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পর তিনি তিব্বতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তিব্বতের রাজাকে পরাজিত করিলেন। সম্ভবতঃ চীন সম্রাটের বিনা সাহায্যেই তিনি তিব্বত-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কতকগুলি পার্বত্য উপজাতিগণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধাভিযান

ললিতাদিত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাভিযান হইল যশোধর্মণের বিরুদ্ধে। তিনি যশোবর্মনের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও যশোধর্মনের উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া ললিতাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। উভয় পক্ষে কিছুদিন যুদ্ধ চলিবার পর যশোবর্মন পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজ্য ললিতাদিত্যের হস্তগত হয়।

যশোবর্মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান

কনৌজের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিয়া ললিতাদিত্য পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যে মগধ, গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিলেন। ইহার পর তিনি দক্ষিণ ভারতের চালুক্যগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। দক্ষিণ ভারত হইতে তিনি পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়া মালব ও গুজরাট জয় করিলেন এবং আরব-গণকেও পরাজিত করিলেন। এই সকল সামরিক অভিযানের সাফল্যের ফলে কাশ্মীররাজ্য সাময়িকভাবে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অভিযান

ললিতাদিত্য যে শুধু একজন পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন এমন নহে, তিনি স্থাপত্য শিল্পেরও একজন পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু সুসজ্জিত নগর এবং বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে মার্তণ্ড-মন্দিরটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ললিতাদিত্যের শিল্পানুরাগ

ললিতাদিত্যের পরবর্তী দুর্বল রাজগণ কাশ্মীরের প্রতিপত্তি ও গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য (৭৭৯-৮১০ খৃঃ) কার্কট বংশের বিনষ্ট গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ বা তাঁহার পরবর্তী কোন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কল্হনের বিবৃতি অনুসারে বিনয়াদিত্য নেপাল ও উত্তর বঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন।

জয়াপীড় বিনয়াদিত্য

বিনয়াদিত্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভায় বহু

সাহিত্যিক ও কবি বিরাজ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কার্কট বংশের গৌরব লুপ্ত হয়।

কাশ্মীরের পরবর্তী রাজবংশ, উৎপল বংশঃ কর্কট বংশের পর উৎপল বংশ (Utpala dynasty) ও লহোর বংশ (Lohara dynasty) যথাক্রমে কাশ্মীরে রাজত্ব করে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অবন্তীবর্মন উৎপল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজশক্তি শক্তিশালী করিয়া তোলেন। তিনি অবন্তীপুর নামে এক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু মন্দির নির্মান করেন। তাঁহার সাফল্যমণ্ডিত শাসনের মূলে ছিল তাঁহার মন্ত্রী স্থর্যের অবদান। স্থর্য ছিলেন রাজ্যের যথার্থ শাসক। তাঁহার নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার ফলে কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিপত্তি ও গৌরব অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্থর্য ছিলেন শিক্ষা ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং সমকালীন বহু পণ্ডিত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। স্থর্যের অক্লান্ত চেষ্টায় কাশ্মীর উপত্যকায় জলসেচ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। ইহার ফলে কাশ্মীর রাজ্যে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাজা অনন্তবর্মন ছিলেন বৈষ্ণব।

অবন্তীবর্মণ
(৮৫৫-৮৮৩)

অনন্তবর্মনের মৃত্যুর পর কাশ্মীর রাজ-পরিবারে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের উৎপত্তি হয়। অবশেষে শংকরবর্মন সিংহাসন দখল করিতে সমর্থ হন। তিনি ৮৮৫ হইতে ৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শংকরবর্মন ছিলেন স্থদক্ষ যোদ্ধা। তিনি কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। তিনি গুর্জর প্রতিহার রাজ ভোজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। শংকরবর্মন রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করিলেও তিনি ছিলেন অত্যাচারী শাসক। কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার তাঁহার রাজত্বকালের অন্যতম কলঙ্ক।

শংকর বর্মণ
(৮৮৫-৯০২)

শংকরবর্মনের মৃত্যুর পর গোপালবর্মন (৯০২-৯০৪ খৃঃ) ও পার্থ (৯০৬-৯২১ খৃঃ) যথাক্রমে রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্ব কালে রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এবং তন্ত্রী নামে প্রাসাদ রক্ষীগণ সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা একরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ৯২১ খৃষ্টাব্দে 'তন্ত্রীগণ' পার্থকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া উচ্চ মূল্যে চক্রবর্মনকে কাশ্মীরের সিংহাসন বিক্রয় করিল। কিন্তু চক্রবর্মন তন্ত্রীগণের অর্থের চাহিদা মিটাইতে না পারায় তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন। চক্রবর্মন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এবং কাশ্মীরের সামন্তগণের সহযোগিতা লাভ

গোপালবর্মন
চক্রবর্মন

করিয়া তন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তন্ত্রীগণকে পরাজিত করিয়া চক্রবর্মন পুনরায় সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু শাসক হিসাবে চক্রবর্মন কোনরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন ব্যাভিচারী ও অত্যাচারী। ৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চক্রবর্মন আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

চক্রবর্মনের পর অবন্তী (ইনি উন্মাদ অবন্তি নামে পরিচিত ছিলেন) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন জঘন্য প্রকৃতির এবং স্বৈরাচারী। তিনি যেরূপ নৃশংসভাবে স্বীয় ভ্রাতাগণকে ও পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা অত্যন্ত বিরল। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অবশেষে কমলবর্মন নামে কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি বিদ্রোহী হন। তিনি অবন্তীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যশস্কর নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন (৯৩৯ খৃঃ)।

যশস্কর

যশস্কর ছিলেন সুশাসক। তিনি কাশ্মীর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কল্‌হন্ যশস্করের চরিত্র ও তাঁহার শাসন দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার আমলে কাশ্মীর রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

প্রভোগুপ্ত ঃ ক্ষেমগুপ্ত (৯৪৯-৯৫৮)

যশস্করের পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৪৮ খৃঃ)। কিন্তু পর বৎসর তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী প্রভোগুপ্ত সিংহাসন দখল করেন (৯৪৯ খৃঃ) প্রভোগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর হইলে তাঁহার পুত্র অভিমন্যু সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতা অভিমন্যুর মাতা দিদ্দার হস্তগত হয়।

দিদ্দা

দিদ্দা ছিলেন ব্যাভিচারিণী ও হিংস্র প্রকৃতির। ১০০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিদ্দার অত্যাচারমূলক শাসন চলিতে থাকে। অবশেষে সংগ্রামরাজ নামে দিদ্দার জনৈক আত্মীয় দিদ্দাকে নিহত করিয়া সিংহাসন দখল করেন এবং লহোর-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সংগ্রাম রাজ

কাশ্মীরের লহোর বংশ ঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সংগ্রামরাজ সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের শাহীবংশীয় রাজা ত্রিলোচন পালের সাহায্যার্থে একদল কাশ্মীরী-সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে।

সংগ্রামরাজের পর হরিরাজা ও অনন্ত যথাক্রমে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন হর্ষ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক। তিনি কঠোর হস্তে আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া রাজশক্তি সুদৃঢ় করেন।

এই বংশের শেষ নরপতি ছিলেন জয়সিংহ। তিন ১১২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১১৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। জয়সিংহের রাজত্বের পরিসমাপ্তির সহিত কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। জয়সিংহের পরেও প্রায় দুইশত বৎসর কাশ্মীরে হিন্দুশাসন চলিতে থাকে। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহমীর নামে জনৈক মুসলমান হিন্দু বংশের অবসান ঘটাইয়া কাশ্মীরে মুসলমান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়সিংহ

হিন্দুবংশের অবসান —(১৩৩৯)

গুর্জর-প্রতিহার (The Gurjara-Pratiharas)

উৎপত্তি (Origin) : গুর্জরগণের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। ইহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রতিহার বংশীয় নরপতিগণ কর্তৃক উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁহারা নিজেদের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের বংশ সম্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন। কিন্তু আধুনিক ইওরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এই দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন। ইহাদের মতে (১) গুর্জরগণ বৈদেশিক হূণ জাতির একটি শাখা এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে উহারা হূণগণের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই মতের সমর্থনে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রতিহার বংশীয় জনৈক নরপতির একটি শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিহারগণকে গুর্জর জাতির একটি শাখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উৎপত্তি সম্পর্কে দুইটি মতবাদ

(২) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলালিপিতে গুর্জরদের উল্লেখ আছে। (৩) ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন ভারতীয় গ্রন্থে গুর্জরদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ গুর্জরগণকে ভারতে বহিরাগত একটি জাতি বলিয়া মনে করেন এবং কালক্রমে ইহারা ভারতীয় জনসমাজে মিশিয়া ক্ষত্রিয় নামে পরিচিতি লাভ করে। গুর্জরগণ পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুরে প্রথম বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে ইহারা রাজপুতানা হইতে পূর্ব ও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে ব্রোচ ও মালবে রাজ্য স্থাপন করে।

হরিচন্দ্র ছিলেন গুর্জর বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রাজধানী ছিল ভিনমাল। ৭২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম নাগভট্ট মালবে এক নূতন গুর্জর-প্রতিহার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উজ্জয়িনী ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি সিন্ধুর আরবগণকে পরাজিত

হরিচন্দ্র ঃ প্রথম নাগভট্ট (৭২৫-৭৪০)

করিয়া উত্তর ভারতে আরবগণের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কতক অঞ্চল স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০)

গুর্জর-প্রতিহার বংশের পরবর্তী পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন বৎসরাজ। তিনি গুর্জরদের বিভিন্ন শাখার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজপুতানায় বিতাড়িত করেন। এই সময় হইতেই উত্তর ভারতের প্রাধান্য লইয়া প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

উত্তর ভারতের প্রাধান্য লইয়া প্রতিহার পাল রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি প্রতিহার বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া এই রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করিতে সমর্থ হন। সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ কর্তৃক তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি কনৌজ আক্রমণ করিয়া বঙ্গাধিপতি ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া তথায় নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহার পর তিনি মুঙ্গেরের নিকটে এক যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁহার বিজয় গৌরব অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রতিহার বংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তার প্রতিহত করেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের সাম্রাজ্য পশ্চিমে পূর্ব-পাঞ্জাব হইতে পূর্বে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮০০-৮২৫)

তাঁহার কৃতিত্ব প্রতিহার বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ; সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রতিহার বংশের পরবর্তী রাজা ছিলেন দ্বিতীয় নাগভট্টের পুত্র রামভদ্র। ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। রামভদ্রের পর দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র মিহির ভোজ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি প্রতিহার বংশের বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে যত্নবান হন। পালরাজগণের দুর্বলতা এবং বহিরাক্রমণের ফলে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া মিহির ভোজ উত্তর ভারতে প্রতিহার বংশের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্নবান হন। তিনি বুন্দেলখণ্ড স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি মগধের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পালবংশীয় রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু অবশেষে রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁহার রাজ্য পূর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মিহির ভোজ (৮৩৬-৮৮৫)

প্রতিহার বংশের পুনরুত্থান ঃ সাম্রাজ্য বিস্তার

আরব পর্যটক স্থলেমান মিহির ভোজের সামরিক শক্তি, প্রতিপত্তি ও সুদক্ষ শাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রচলিত মুদ্রা হইতে জানা যায় যে মিহির ভোজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

আরবপর্যটকের প্রশংসা

মিহির ভোজের পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রতিহার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলে প্রতিহার সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালকে পরাজিত করিয়া মগধ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং কিছুদিনের জন্য উত্তর বঙ্গে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। মহেন্দ্রপাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'কর্পূর মঞ্জরী' নামক নাটকের রচয়িতা কবি রাজশেখর তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

প্রথম মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০)

সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা ; সাম্রাজ্য-বিস্তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষক

মহেন্দ্রপালের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বীয় ভ্রাতা মহীপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। মহীপাল কিছুদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্র তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কনৌজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এই পরাজয়ের পর হইতেই প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং মহীপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের আমলে উহা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। মহীপালের পর যথাক্রমে দেবপাল, বিজয়পাল ও রাজ্যপাল রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্বকালে উত্তর ভারতে একাধিক রাজপুত বংশের উত্থান ঘটে। এইগুলির মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেলগণ ; চেদীর (মধ্য প্রদেশ) কলচুরীগণ, মালবের পরমারগণ, গুজরাটের চালুক্যগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইভাবে প্রতিহার রাজবংশের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় ভোজ (৯১০-৯১২)
মহীপাল (৯১২-৯৪৪)

প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন

গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের গুরুত্ব (Importance of the Gurjara Pratihara Empire) : হর্ষোত্তর যুগে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য ছিল উত্তর ভারতের এক অন্যতম সাম্রাজ্য। (১) প্রতিহার রাজগণ আরব-গণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া কয়েক শতাব্দীর জন্য বিদেশীদের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আরব-পর্যটক স্থলেমান লিখিয়াছেন যে "ভারতে প্রতিহার রাজগণের ন্যায় ইসলামের প্রবল শত্রু আর কেহ ছিল না।" প্রতিহার রাজগণ আরবগণের আক্রমণ প্রতিহত না করিলে সিন্ধু-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ভারতে ইসলামীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইত। (২) গুপ্ত-সম্রাটগণের ন্যায় প্রতিহার রাজগণও ভারতে অখণ্ড সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য

রক্ষা করিয়াছিলেন। সভাকবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালকে আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ ও উত্তর ভারতের সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা এবং হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন প্রতিহার রাজগণের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

(৪) প্রতিহার রাজগণ সুদক্ষ শাসক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছিল।

(৫) প্রতিহার বংশের আমলেই রাজপুত বংশের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এই অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইল বহু শতাব্দী ধরিয়া রাজপুত ও মুসলমানগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ।

রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান

(The Rise of the Rajputs)

রাজপুত যুগ ও ইহার গুরুত্ব (The Age of the Rajput and its Importance): হর্ষোত্তর যুগে ভরতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান। স্মিথের মতে অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে রাজপুতগণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত বিজিত হইবার কাল পর্যন্ত এই যুগকে ভারতের ইতিহাসে 'রজপুত যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সময়ে উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই রাজপুতগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। সেই যুগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষার ব্যাপারে রাজপুতগণকেই অধিকতর দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাজপুতগণের পরাজয়ের ফলেই উত্তর ভারতে মুসলমান কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজপুতদের অবদান

রাজপুত নৃপতিগণের রাজত্বকালের গুরুত্ব শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলমান আক্রমণের যুগে তাঁহারাই ছিলেন হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষক। ইওরোপীও ঐতিহাসিকগণও রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।*

* Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind, of a people withstanding every outrage barbarity can inflict on human nature sustain and bent to the earth, yet rising buyant from the pressure and making calamity a whetstone courage"—Tod.

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ (Origin of the Rajputs) ঃ রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজপুতানার কতক অঞ্চলে 'রাজপুত' কথাটির অর্থে ক্ষত্রিয় সামন্ত বা জায়গীরদারদের অবৈধ সন্তানগণকে বুঝায়। প্রচলিত 'রাজপুত' কথাটি সংস্কৃত কথা 'রাজপুত'-এর অপভ্রংশ। পুরাণে ও বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' 'রাজপুত' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোঁড়া মত ঃ কাহিনী ও কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুতগণকে সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা ('রাজপুতানার-ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা) ও সি, ভি, বৈদ্য ('মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা) এই মতের সমর্থক। এই মতের সমর্থনে উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—যথা—

(১) কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুতগণ সূর্য কিংবা চন্দ্র বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই কিংবদন্তী রাজপুতানায় প্রাপ্ত অনুশাসনলিপি ও সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মেবার কিংবদন্তী অনুসারে মেবারের রাজগণ রামের বংশধর ছিলেন। কিন্তু গুহিলটগণের অনুশাসনলিপি অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ।

(২) রাজপুতগণ বৈদিক আর্যগণের বংশধর না হইলে তাঁহারা সর্বস্ব পণ করিয়া হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা রক্ষার্থে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতেন না। কিন্তু এই উক্তির উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে ধর্মান্তরিতগণ নূতন ধর্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হয়। সুতরাং হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত রাজপুতগণ নিজেদের নূতন ধর্ম রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সর্বস্বপণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। (৩) নৃতত্ত্ব মূলক পরীক্ষার দ্বারা রাজপুতগণকে আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সমন্বয়ে ভারতীয় জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার মধ্যে বহু জাতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নৃতত্ত্বমূলক পরীক্ষার দ্বারা রাজপুতগণকে যথার্থ আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা সহজ সাধ্য নহে। স্মিথ যথার্থই বলিয়াছেন, "I do not believe that anything worth knowing is to be learnt by measuring the skills or noting the physical characters of individuals in a population of such mixed origin"।

আধুনিক মত ঃ আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অনেকেই পণ্ডিত, ওঝা ও বৈদ্যের মত অগ্রাহ্য করেন। ইহাদের মতে রাজপুতগণ হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলির সংমিশ্রনে উদ্ভূত। টড ও ক্রুক এই মতের সমর্থক।

এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যথা—(১) হিন্দু জনসমাজের সহিত বহিরাগত জাতিগুলির সংমিশ্রন, ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শকদের সহিত হিন্দুদের বৈবাহিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলি গ্রীক, কুষাণ ও শকদের ন্যায়ই ভারতের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া কালক্রমে ভারতীয় জনস্রোতে মিশিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় সমাজে বৃত্তি অনুসারে এই বহিরাগত জাতিগুলির স্থান নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজ্য স্থাপন করিয়া শাসন কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত নামে পরিচয় লাভ করেন। টডের মতে রাজপুতগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা হূণ নামে পরিচিত ছিল। অনেক সময় বৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে বর্ণেরও পরিবর্তন হইয়াছিল। যেমন মেবারের গুহিলটগণ মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশাসন ক্ষমতা লাভ করিলে তাঁহারা রাজপুত নামে পরিচিত হন।

(২) অনুশাসনলিপির সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা সমর্থিত হইয়াছে যে রাজপুতগণ বহিরাগত জাতি।

(৩) আকৃতিগত সাদৃশ্য হইতেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে জাঠ ও গুর্জরদের ন্যায় রাজপুত নামে পরিচিত জাতি বহিরাগত এবং একই জাতি-গোষ্ঠী হইতে উদ্ভুত।

এই স্থানে স্মরণ রাখা দরকার যে রাজপুতদের সব কয়টি শাখাই বহিরাগত জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভুত নহে। অন্ততঃ ইহাদের কয়েকটি শাখা ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল—যেমন চন্দেলগণ, গহড়বালগণ।*

ভারতের রাজপুত বংশগুলির মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার, চন্দেল, চৌহান, পরমার ও কলচুরিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত শাসনের প্রকৃতি (Nature of Rajput Rule): মূলতঃ রাজপুত শাসন ছিল সামন্ততান্ত্রিক। উত্তর ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিটি রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা জায়গীরে বিভক্ত ছিল। জায়গীরদার-গণ ছিলেন জায়গীরের অধিপতি। এই জায়গীরদারগণও ছিলেন রাজপুত। রাজ্যের শক্তি ও নিরাপত্তা জায়গীরদারগণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিত। জায়গীরদারগণ রাজাকে সামরিক সাহায্য দিতে বাধ্য থাকিতেন, এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিকট অনুগত থাকিতেন। সামরিক সাহায্য ছাড়াও

***স্মিথের মত:** স্মিথের মতে রাজপুতগণ ছিলেন একটি মিশ্রিত জাতি। ইহাদের কতকগুলি শাখা শক, হূণ ও কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলি হইতে উদ্ভুত এবং কতকগুলি প্রাচীনকালের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। প্রথম দিকে এই দুইটি দল পরস্পর-বিরোধী ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই দুইটি দলের মধ্যে সংমিশ্রন ঘটে।

জায়গীরদারগণ রাজাকে নির্দিষ্ট কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিতেন। এইরূপ রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রাজার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। রাজার দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে জায়গীরদারগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেন এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইত।

আমলাতন্ত্র ছিল রাজপুত রাষ্ট্রের অপর বৈশিষ্ট্য। কর্মচারীগণ 'কায়স্থ' নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতেই সাধারণত কর্মচারী নিয়োগ করা হইত।

রাজপুত রাষ্ট্রের প্রধান আয় ছিল ভূমি রাজস্ব। এতদ্ভিন্ন জায়গীরদারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর ও শুল্ক-করও রাষ্ট্রের অপর প্রধান আয় ছিল।

রাজপুত রাষ্ট্রে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য-পরিষদগুলি গ্রাম্য-জীবনের সকল বিষয় পরিচালনা করিত। গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি কর আদায় করিত এবং বিচার কার্য সম্পাদন করিত।

রাজপুতদের সমাজ জীবন (Social life) ঃ বর্ণভেদ প্রথা রাজপুত-সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছাড়াও রাজপুত সমাজে আরও কতকগুলি নিম্নবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজপুত সমাজে ব্রাহ্মণগণ সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহারা নৃপতিগণের মন্ত্রী ও পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত হইতেন। অবশ্য ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই শিক্ষা, যাগযজ্ঞ ও ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা দার্শনিক ও পুরোহিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেন। প্রাণদণ্ড হইতে ব্রাহ্মণগণ সর্বদাই অব্যাহতি লাভ করিতেন। শাসক ও সৈনিক শ্রেণীতে ছিল ক্ষত্রিয়গণ। বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করিত এবং শূদ্রগণ কৃষি ও শিল্পকার্যে নিযুক্ত থাকিত। অস্পৃশ্যগণ গ্রাম ও শহরের বাহিরে বাস করিত।

বর্ণপ্রথা

রাজপুত যুগের প্রথম দিকে বর্ণ প্রথা কঠোর ছিল না কিন্তু পরবর্তী কালে তাহা কঠোর হইয়া উঠে। সমাজে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী রাজপুত যুগে রাজপুত সমাজে জন্ম, বৃত্তি ও স্থান অনুসারে বহু নূতন বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যেই এই সকল নূতন বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল—যথা 'কনৌজ-ব্রাহ্মণ', 'গৌড়-ব্রাহ্মণ', 'তেলেগু-ব্রাহ্মণ', 'কোংকন-ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যেও নূতন বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। 'কায়স্থ' নামে অপর এক বর্ণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কায়স্থগণ ছিলেন অধিকাংশই কেরাণীজীবি।

রাজপুত সমাজে 'ভাট' বা 'চারণগণ' ছিলেন বিশেষ সম্মানের পাত্র। ইহারা রাজপুত বীরদের কৃতিত্ব সঙ্গীতের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করিয়া

ভাট বা চারণ

বেড়াইতেন। ইহারা জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব রাখিতেন। পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিবাহ-সংক্রান্ত বিরোধ প্রভৃতি ব্যাপারেও চারণগণ মধ্যস্থতা করিতেন এবং এই সকল ব্যাপারে ইহাদের মতামত সকলেই গ্রহণ করিত। যুদ্ধক্ষেত্রেও চারণগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

নারী

রাজপুত সমাজে নারী সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। নারীদের মধ্যে পর্দার প্রথা প্রচলিত ছিল না। সমাজে নারীগণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন এবং বিবাহ ব্যাপারে ইহাদের মত অগ্রাহ্য করা হইত না। স্বয়ম্বর প্রথা রাজপুত সমাজে প্রচলিত ছিল। মুসলমান পর্যটক অল্-বিরুণীর বিবৃতি অনুসারে রাজপুত রমণীগণ ছিলেন শিক্ষিতা এবং তাঁহারা রাষ্ট্র জীবনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রাঙ্কন রাজপুত রমণীদের প্রিয় ছিল। অশ্বচালনায় ও অসিচালনায় রাজপুত রমণীদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। রাজপুত রমণীগণের দেশাত্মবোধ ছিল সর্বজনবিদিত। স্বদেশ রক্ষার্থে ইহারা পুরুষদের সহিত সমানভাবে যুদ্ধ করিতে কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না। সতীদাহ প্রথাও রাজপুত সমাজে প্রচলিত ছিল।

সামাজিক প্রথা

রাজপুত সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যার জন্ম মোটেই কাম্য ছিল না এবং এই কারণে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে হত্যা করা হইত।

উচ্চ শ্রেণীর বিলাস ব্যসন

উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন সমৃদ্ধ ও বিলাসপ্রিয়। তাঁহারা বহু ক্রীতদাস পোষণ করিতেন। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই মূল্যবান অলংকার ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। বিত্তশালীদের মধ্যে মদ্যপান ও অহিফেন সেবনের বহুল প্রচলন ছিল। সঙ্গীত, নৃত্য ও শিকার তাঁহাদের সাধারণ আমোদ-প্রমোদ হিসাবে গণ্য হইত।

সাহিত্য

সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Art) : রাজপুত নৃপতিগণ শিল্প ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই খ্যাতনামা গ্রন্থকার ছিলেন। ধর রাজ্যের রাজা মুঞ্জ খ্যাতনামা কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রাজা ভোজ ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'আয়ুর্বেদ-সর্বস্ব' ও 'রাজমৃগাবক' নামক গ্রন্থ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদ্মগুপ্ত, ধনিক, হলায়ুধ, ধনঞ্জয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ রাজা ভোজের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

'কর্পূর মঞ্জরী' নামক নাটকের রচয়িতা রাজশেখর কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপালের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। এই যুগের অপরাপর খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে 'রাবণবধ' কাব্যের রচয়িতা ভত্তি, 'নবশশাঙ্কচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা পদ্মগুপ্ত, 'কুলতানিমাতা' গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর গুপ্ত 'উত্তর-রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা ভবভূতি 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রাজপুত যুগেই আঞ্চলিক সাহিত্য উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির ভিত্তি এই যুগেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শিল্প

শিল্পের ক্ষেত্রেও এই যুগ গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুত নৃতিগণ কর্তৃক নির্মিত দুর্গ, প্রাসাদ, স্নানাগার, কৃত্রিম হ্রদ প্রভৃতি রাজপুত শিল্পিগণের উন্নত শিল্প-জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। এতদ্ভিন্ন রাজপুত নৃপতিগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরগুলিও এক বিশিষ্ট ধরণের শিল্প-রীতির সাক্ষ্য বহন করে। রাজপুত শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে চিতোরগড়, রণথম্ভর, কুম্ভলগড় অমীরগড় প্রভৃতি দুর্গাদি এবং গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের প্রাসাদ, জয়পুরের অম্বর-প্রসাদ, উদয়পুর-প্রাসাদ, প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজপুত নৃপতিগণের দুর্গাদি ও তাঁহাদের নির্মিত মন্দিরগুলি শিল্পবিশেষজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। রাজপুত নৃপতিগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে চিতোরের 'কলিকামাত মন্দির', উদয়পুরের 'একলিঙ্গমন্দির' আবু-পর্বতে অবস্থিত জৈন-মন্দিরসমূহ, স্থনকের নীলকণ্ঠ মন্দির—প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার পাল-বংশঃ—['**বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস** অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্নমালা

1. Narrate the history of the Gurjara Pratiharas.
2. Review the career of Yasovarmana of Kanauj.
3. Write a short note on the origin of the Rajputs.
4. Discuss the problems relating to the origin of the Rajputs.
5. Form an estimate of the nature of Rajput administration.
6. Give a brief account of the social life of the Rajputs.

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষিণ ভারত ঃ উড়িষ্যা ঃ

(South India : Orissa)

মৌর্য-যুগের পূর্বে দক্ষিণ ভারত (South India in the Pre-Maurya days) ঃ

উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু বৈদেশিক জাতি সুপ্রাচীন কালেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তেই উহাদের প্রতিষ্ঠা ও পতন ঘটিয়াছিল। মৌর্য যুগের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস অনুমান সাপেক্ষ। সুপ্রাচীনকালে সমগ্র আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবেই দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে থাকে। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবেই দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে থাকে। অনেক ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় অধিবাসীগণ বাহিরাগত এবং বিদেশ হইতেই উহারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড় সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা স্বতন্ত্র ভাবেই এবং দ্রাবিড়গণের স্বকীয় প্রতিভাবলেই দক্ষিণ ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের সম্পর্ক না থাকিলেও মিশর, মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির সহিত সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই যোগাযোগ দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের ১২০০ শত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ ভারত ও মধ্য প্রাচ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সিলভিন্-লেভী যথার্থই বলিয়াছেন যে খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলির সহিত প্রাচ্য দেশের সামুদ্রিক যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ ভারতের একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বকীয়-সংস্কৃতি থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের জাতিসমূহ আর্য-সভ্যতা হইতে বিমুক্ত ছিল না। অনেকের মতে দক্ষিণ ভারত ছিল ভারতের আদিম অধিবাসীদের বাসভূমি। আবার অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়গণ এই অঞ্চল হইতেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিল। তামিলদের মধ্যে এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে যে গুজরাট ও কাথিয়াবাড় হইতে দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতের স্বতন্ত্র সত্তা

দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন মত

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণাঞ্চল সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারত নামে পরিচিত ছিল। মৌর্য যুগের পূর্বেই আর্যাবর্তের সহিত দক্ষিণ ভারতের যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যগণ বিন্ধ্য-পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। কিংবদন্তি অনুসারে আর্য-ঋষি অগস্ত্য, তাঁহার স্ত্রী, শিষ্যবর্গ ও বহু কৃষক লইয়া সর্বপ্রথম বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। রামায়ণে দক্ষিণ ভারতের সহিত যবদ্বীপ (জাভা) ও সুমাত্রারও উল্লেখ আছে। মহাভারতে সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালেই পাণ্ড্য দেশের সহিত আর্যাবর্তের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

আর্যাবর্তের সহিত দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত (South India in the Maurya and Post-Maurya Period):

মৌর্যযুগের বহু পূর্বেই দক্ষিণ ভারতে তিনটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা চোল, পাণ্ড্য ও চের।

ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব হেতু এই রাজ্যগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না। তামিল সাহিত্যে ইহাদের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্ন লইয়া অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে প্রথম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাণ্ড্য ও চেরগণের উপর চোলগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহার পর পাণ্ড্য ও চেরগণ যথাক্রমে দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

মৌর্য যুগ হইতে উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে এবং দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের তিনেভেলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের সাম্রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অশোকের শিলালিপিতে মৌর্য সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য ও চের রাজ্য তিনটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল রাজ্যগুলির সহিত অশোক মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

চোল রাজ্যটি পেনার ও ভেলার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল (বর্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী)। 'পেরিপ্লাস-অফ-দি-ইরিথ্রিয়ান-সী'-নামক গ্রন্থে ও টলেমীর বিবরণীতে চোলদের সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। চোল রাজগণের মধ্যে করিকাল ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রান্ত। তিনি পাণ্ড্য ও চেরগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র তামিল দেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি

চোল

সিংহল দেশও সাময়িকভাবে দখল করিয়াছিলেন। তিনি সিংহলীয় যুদ্ধ-বন্দীদের সাহায্যে নিজ রাজ্যে বহু খাল খনন করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী রাজা এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে পল্লব, পাণ্ড্য ও চেরগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে চোল রাজ্যের পতন শুরু হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চোল রাজ্য "একটি পরিত্যক্ত অরণ্যময়" অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীতে চোলগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

আধুনিক কালের ত্রিবাঙ্কুর, মাদুরা ও তিনেভেলী অঞ্চল লইয়া পাণ্ড্য রাজ্য গঠিত ছিল। মাদুরা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। কয়াল ছিল এই রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্য বন্দর। খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত তামিল সাহিত্যে পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিস বলেন যে মৌর্যযুগে এই রাজ্য নারীশাসিত ছিল। অশোকের শিললিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ড্যরাজ্য স্বাধীন ছিল। নেড়ুঞ্জেলিয়ন ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক অন্যতম পরাক্রান্ত রাজা। তিনি চোল ও চেরগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। পাণ্ড্য রাজ্য বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইহা দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। কথিত আছে খৃষ্ট পূর্ব ২০ অব্দে জনৈক পাণ্ড্য রাজা রোম সম্রাট অগস্টাসের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পর ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাণ্ড্যরাজ্যের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কড়ুঙ্গন নামে এক শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে পাণ্ড্য-রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। এই বংশের সর্বাধিক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন শ্রীমার-শ্রীবল্লভ। তিনি পল্লবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া নিহত হন। কিছুকাল পাণ্ড্যরাজ্য পল্লব রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। পল্লবগণের পর চোলগণ পাণ্ড্য রাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জটাবর্মনের নেতৃত্বে পাণ্ড্যগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে উহার অবসান ঘটে।

পাণ্ড্য

ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশ, মালাবার ও কোচিন লইয়া চের রাজ্য গঠিত ছিল। অশোকের শিলালিপিতে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন চের-রাজ্যের উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস-অফ-দি-ইরিথ্রিয়ান-সী' নামক গ্রন্থে ও টলেমীর বিবরণীতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে। চের-রাজ নেড়ুঞ্জেরল-আদম ছিলেন সেই যুগের এক পরাক্রান্ত রাজা। তিনি কদম্ব নামক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং 'যবনদের' বিরুদ্ধে নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই যবনগণ ছিল গ্রীক কিংবা রোমান বণিকগণ।

চের

নেডুঞ্জেরল-আদমের পুত্র সেরান-সিঙ্গভুবানও একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। চের-রাজ্যের নৃপতিগণের অনেকে রোমের সহিত কূটনৈতিক দূত বিনিময় করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে চেরগণ যথাক্রমে পাণ্ড্য ও চোলগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

উত্তর ভারতে দক্ষিণী রাজন্যবর্গের সাফল্যের দাবি

তামিল সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আছে যে পাণ্ড্য ও চের-রাজ্যের নৃপতিগণ বহুবার উত্তর ভারতে হিমালয় পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান চালাইয়াছেন। অবশ্য উত্তর ভারতে যুদ্ধ চালাইবার মত উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ দক্ষিণ ভারতীয় রাজন্যবর্গের ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও একথা সত্য যে উত্তর ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহারা একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারত

মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারতে দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। একটি কলিঙ্গের (বর্তমান উড়িষ্যা) চেতরাজ্য ও অপরটি সাতবাহন রাজ্য (মহারাষ্ট্র অঞ্চল)। কলিঙ্গের খারবেল ছিলেন পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি সাতবাহন রাজ্যের সাতকর্ণীকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পাণ্ড্য রাজ্যের রাজাকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সাতবাহন-বংশ দক্ষিন-ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সাতবাহনগণের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। অপর দিকে সাতবাহনগণ উত্তর ভারতের আর্য-সভ্যতা ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার করার ব্যাপারে সাতবাহনগণ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন বংশের আধিপত্য প্রায় তিনশত বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শেষ সাতবাহন রাজ যজ্ঞশ্রী-সাতকর্ণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সাতবাহন সাম্রাজ্যের ধ্বংস-স্তুপের উপর বহু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল। মধ্যপ্রদেশের বেরার অঞ্চলে বকাটকগণ প্রাধান্য অর্জন করিল। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করিয়া পল্লব শক্তির অভ্যুত্থান ঘটিল এবং ইক্ষ্বাকুগণ কর্তৃক সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ অধিকৃত হইল। ফলে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত (South India in the Gupta and Post-Gupta Period) :—সমুদ্রগুপ্তের আমলে দক্ষিণ ভারতে

উত্তর ভারতীয়দের যুদ্ধাভিযান ব্যাপক হয়। আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধাভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন।

গুপ্তযুগে দক্ষিণ ভারত

'এলাহাবাদ-প্রশস্তি' হইতে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে যে সকল নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্র রাজা, কৌরলের মন্তরাজ, এরণ্ডের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অভমুক্তার নীলরাজা, কুন্তলপুরের ধনঞ্জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের এই অভিযানগুলি সামরিক দিক হইতে সাফল্য মণ্ডিত হইলেও সমুদ্রগুপ্ত বিজিত রাজ্যগুলিকে স্বরাজ্যভুক্ত না করিয়া বিজিত রাজন্যবর্গের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ আদায় করিয়া উহাদের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সুদূর পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণ ভারতের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখা অসম্ভব উপলব্ধি করিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতে দুইটি রাজবংশ সর্বাধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল—যথা কাঞ্চীর পল্লব ও বাতাপীর চালুক্য-বংশ।

পল্লব-বংশ (The Pallavas) ঃ

উৎপত্তি (Origin) ঃ "The pallavas constitute one of the mystries of Indian history"। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করিয়া পল্লব বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

মতভেদ

পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। (১) কেহ কেহ (যেমন আর. এল. রীজ ; ভি—ভেনকায়া) পল্লবগণকে পারস্যের 'পহ্লব' জাতির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 'পল্লব' ও 'পহ্লব' এই দুইটি নামের মধ্যে প্রায় সাদৃশ্য থাকায় কাঞ্চীর পল্লবগণকে পারস্যের 'পহ্লব' বংশ সম্ভূত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে শকদের সহিত সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপনের পর পহ্লব বা পার্থিয়ানগণ সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দাক্ষিণাত্যের টোণ্ডামণ্ডলম নামক অঞ্চলটি অধিকার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে পহ্লবগণ দক্ষিণ ভারতে পল্লব নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এই অনুমানের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে পল্লবদের দলিলপত্রে 'পহ্লব' নামের কোন উল্লেখ নাই।

(২) ডক্টর জয়স্বালের মতে পল্লবগণ ছিলেন উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মী বকাটক বংশের শাখা। ইহারা ছিলেন যুদ্ধজীবি এবং কালক্রমে দক্ষিণ ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 'তালাগুণ্ডা' লিপিতে পল্লবগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(৩) ডক্টর কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মতে পল্লবগণ ছিলেন সাতবাহনগণের সামন্ত এবং সাতবাহনগণের পতনের পর উহারা এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(৪) রোলিনসন-এর (Rawlinson) মতে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পল্লবগণের অভ্যুত্থান ঘটে। তাহারা কুরুম্ব, কল্ল, মরভ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলিকে সম্মিলিত করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। ৩৫০ খৃষ্টাব্দে তাহারা কাঞ্চী নগরটি দখল করে।

(৫) স্মিথের মতে পল্লবগণ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় অধিবাসী এবং কুরুম্ব জাতির সমগোত্রীয়।

(৬) আবার কাহারো মতে পল্লবগণ ছিলেন চোল-নাগ বংশ সম্ভূত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে চোল ও পল্লবগণের মধ্যে বংশগত শত্রুতা ছিল।

উপসংহার

সম্ভবতঃ পল্লবগণ উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ বংশ হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলে। এই মতের স্বপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে পল্লবগণের প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং উত্তর ভারতীয় নৃপতিগণের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতেন।

শিবস্কন্দবর্মন

বিষ্ণুগোপ

পল্লব বংশের প্রথম নৃপতি ছিলেন শিবস্কন্দবর্মন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কাঞ্চী ও অন্ধ্র প্রদেশ লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লব রাজ বিষ্ণু গোপের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ৩৫০ হইতে ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সিংহবর্মণ নামে অপর এক পল্লব রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ৪৩৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সিংহবিষ্ণু

৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সিংহবিষ্ণু কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে পল্লব বংশের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তিনি কাবেরী নদী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি চোল, চের, পাণ্ড্য ও সিংহলের রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 'কিরতার্জুনীয়' গ্রন্থের রচয়িতা ভারবি ছিলেন সিংহবিষ্ণুর সভাকবি।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ

সিংহবিষ্ণুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৬০০ হইতে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়া বেঙ্গি প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের প্রভুত্ব

লইয়া চালুক্য ও পল্লবগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মহেন্দ্রবর্মণ প্রথম জীবনে জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি শৈবধর্মের অনুরাগী হন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার আমলে ত্রিচিন-পল্লী ও আর্কট জেলায় বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

চালুক্য-পল্লব সংঘর্ষের সূত্রপাত

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মণ এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চালুক্য-রাজধানী বাতাপি দখল করেন। এই জয়লাভের ফলে দক্ষিণ ভারতে পল্লব বংশের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া তিনি 'মহামল্ল' উপাধি ধারণ করেন। তিনি সিংহলে দুইটি নৌ-অভিযান প্রেরণ করিয়া স্বীয় বন্ধু মণিবর্মণকে তথাকার সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশে' এই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথম নরসিংহ বর্মণ

চালুক্যরাজের পরাজয়

সিংহল অভিযান

নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাং দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে পল্লবরাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।* মহেন্দ্রবর্মণের ন্যায় প্রথম নরসিংহবর্মণও সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে 'মহাবলিপুরম'-এর বিখ্যাত রথ-মন্দির ও অন্যান্য বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ

মহাবলিপুরম-এর রথ-মন্দির নির্মাণ

নরসিংহবর্মণের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন (৬৬৮-৬৭০ খৃঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম পরমেশ্বরবর্মণ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ৬৭০ হইতে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার আমলে চালুক্য-গণের সহিত পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যের নেতৃত্বে চালুক্যগণ পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজধানী কাঞ্চী দখল করিয়াছিল।

দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ
প্রথম পরমেশ্বরবর্মণ

পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি

---

* **পল্লবরাজ্য সম্পর্কে হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ ঃ** হিউয়েন-সাং পল্লব-রাজ্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে কাঞ্চী নগরটি ছিল দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল। তথায় প্রায় একশত বৌদ্ধমঠ ছিল এবং এই মঠগুলিতে দশ হাজারেরও অধিক বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন কাঞ্চী নগরে আশিটি জৈনমন্দির ও কিছু সংখ্যক হিন্দুমন্দির ছিল। কাঞ্চী নগর দক্ষিণ ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। পল্লবরাজ্যের আয়তন ছিল এক হাজার মাইল। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল। হিউয়েন-সাং-এর মতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধর্মপাল ছিলেন কাঞ্চীর অধিবাসী।

পরমেশ্বরবর্মণ ছিলেন শিবের উপাসক। তিনি শিবের উদ্দেশ্যে কাঞ্চী নগরে একটি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ
দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মণ

পরমেশ্বরবর্মণের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৬৯৫ হইতে ৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি 'রাজসিংহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিত দণ্ডি তাঁহার সভাকবি ছিলেন। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মণ ৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ

পল্লব-পাণ্ড্য ও পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষ

পল্লব-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ

গঙ্গাবংশের বিরুদ্ধে সাফল্য

পল্লব বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ। তিনি ৭৩০ হইতে ৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি 'পল্লবমল্ল' নামেও পরিচিত ছিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁহাকে পাণ্ড্যগণের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। সংঘর্ষের ফলাফল সঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের আমলে পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য নন্দীবর্মণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী দখল করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান। নন্দীবর্মণের রাজত্বের শেষের দিকে চালুক্যরাজ পুনরায় পল্লবরাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া যান। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট বংশের সহিত পল্লব বংশের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সেই বৎসর রাষ্ট্রকূট রাজ দণ্ডিদুর্গ চালুক্যগণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল পরাজয় সত্ত্বেও নন্দীবর্মণ তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। নন্দীবর্মণ গঙ্গাবংশের রাজা শ্রীপুরুষকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা-রাজ্যের কতকাংশ দখল করিয়াছিলেন।

দন্তিবর্মণ ঃ তৃতীয় নন্দীবর্মণ

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের পর দন্তিবর্মন ৭৯৬ হইতে ৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটগণের নিকট পল্লবগণ পরাজিত হয়। কিন্তু পল্লব বংশের পরবর্তী রাজা তৃতীয় নন্দীবর্মণ পাণ্ড্যগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যের হস্তচ্যুত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু রাজত্বের শেষের দিকে পাণ্ড্যগণের নিকট নন্দীবর্মণ পরাজিত হন এবং ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শেষ রাজা অপরাজিত

পল্লব বংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত। তিনি চোলগণের সাহায্যে পাণ্ড্যগণকে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে পল্লব রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার

সাফল্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। চোলরাজ আদিত্য ৮৯১ খৃষ্টাব্দে অপরাজিতকে পরাজিত করিয়া টোণ্ডামণ্ডলম্ দখল করেন। এইভাবে পল্লব বংশের অবসান হয় এবং দাক্ষিণাত্যে চোলবংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

পল্লব বংশের অবসান

পল্লব বংশের গুরুত্ব (Importance of the Pallava Dynasty) :

রাজনৈতিক : ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পল্লবরাজগণ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল রাজবংশই তাঁহাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহাদের সার্বভৌম শক্তি উত্তরে নর্মদা ও উড়িষ্যার সীমান্ত হইতে দক্ষিণে পেনার নদী এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে বেরার পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ভারতের বাহিরে সিংহল দেশেও তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুকালের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাতবাহনদের পর দক্ষিণ ভারতে অপর কোন রাজবংশ এইরূপ প্রতিপত্তি অর্জন করিতে পারে নাই।

সাহিত্য ও শিল্প : সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে পল্লবরাজগণের অবদান কম ছিল না। তাঁহারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির ও মহাবলিপুরমের রথ-মন্দিরগুলি পল্লবশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঞ্চীর অপরাপর মন্দিরগুলির মধ্যে ঐরাবতেশ্বর মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লব স্থাপত্য শিল্পে এক বিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং ফলে ইহাতে বিভিন্ন ধরণের শিল্প কৌশল পরিদৃষ্ট হয়। ৬০০ হইতে ৬২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'মহেন্দ্র' শিল্প-কৌশলের বিকাশ ঘটিয়াছিল। প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের গুহা-মন্দির অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গুহা শিল্প-কৌশলের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ৬২৫ হইতে ৬৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ গুহা-মন্দিরগুলি এবং মহাবলিপুরমের পঞ্চরথ মন্দিরগুলি এই সময়ের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। অপরাপর গুহা-মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 'ত্রিমূর্তি', 'বরাহ' ও 'দুর্গা'। বরাহ মন্দিরে স্তম্ভযুক্ত একটি বারান্দা আছে এবং প্রস্তর নির্মিত একটি সিংহের উপর সমগ্র মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। এই গুহা-মন্দিরে বরাহ অবতার, দুর্গা, সূর্য, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবি সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবলিপুরমের পঞ্চরথ মন্দিরগুলিকে পঞ্চ-পাণ্ডবের নামে নামকরণ করা হইয়াছে। এগুলিকে শৈব মন্দির বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দেব-দেবী, জীবজন্তু প্রভৃতি লইয়া পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ—পল্লব স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পল্লব শিল্প-কৌশল রাজসিংহ-কৌশল

পল্লব শিল্পের বিবর্তন

নামে পরিচিত। কাঞ্চীর মন্দিরগুলি এবং মহাবলিপুরমের সমুদ্রের নিকটবর্তী মন্দিরগুলি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দিরে পল্লবরাজগণের ও তাঁহাদের রাণীদের প্রতিচ্ছবি খোদিত রহিয়াছে। ৯০০ খৃষ্টাব্দে পল্লব সাম্রাজ্যে অপরাজিতা-কৌশল নামে অপর এক শিল্প-কৌশলের বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইহার পর পল্লব শিল্পের যে বিবর্তন ঘটিয়াছিল উহার সহিত চোল শিল্প-কৌশলের সাদৃশ্য দেখা যায়। পাহাড় কাটিয়া এই সকল নির্মাণকৌশল ও উহাদের গঠন সৌন্দর্য আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে। স্মিথের ভাষায় "The Pallava school of architecture and sculpture is one of the most important and interesting of the Indian schools."

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পল্লবরাজগণ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে কাঞ্চী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভারবি ও দণ্ডি এই যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ স্বয়ং সুসাহিত্যিক ছিলেন। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন হইয়াছিল এবং কাঞ্চী ছিল সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্র। খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত বাৎসায়ন' কাঞ্চীর নাগরিক ছিলেন।

ধর্ম ঃ অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখা দিয়াছিল তাহা পল্লব রাজসভায় প্রথম উৎপত্তিলাভ করিয়াছিল। তামিলগণের বৈষ্ণব ও শৈব সাহিত্যের উৎপত্তি এই যুগেই হইয়াছিল এবং পল্লব রাজত্বকালেই বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম প্রবর্তকদের আবির্ভাব হইয়াছিল। পল্লব রাজগণের অধিকাংশই ব্রহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা শিব ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে পল্লবরাজ্যে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইহা হইতে মনে হয় পল্লব রাজগণ পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। হিউয়েন-সাং কাঞ্চীতে হিন্দু মন্দিরের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরও দেখিয়াছিলেন। পল্লবরাজগণের রাজত্বকালেই দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা ব্যাপক প্রসারলাভ করিয়াছিল। পল্লবরাজগণের দানপত্রসমূহ হইতে মনে হয় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই দক্ষিণ ভারতে আর্য সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিস্তারের ব্যাপারে কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পানিকরের ভাষায় "The Aryanisation of South India was completed during the period of the Pallavas".

নৌশক্তি ঃ নৌশক্তির দিক দিয়াও পল্লবগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত পল্লবগণের সামুদ্রিক যোগাযোগের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাতাপির চলুক্যবংশ (The Chalukyas of Vatapi)

চালুক্যদের বিভিন্ন শাখা ঃ প্রথমে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী এবং পরে দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালুক্যগণ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে চালুক্যগণের চারিটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা (১) বাতাপির চালুক্যগণ। ইহারা পশ্চিমী চালুক্য (Western Chalukyas) নামে পরিচিত ছিলেন। ইহারা কুন্তল দেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। (২) বেঙ্গীর চালুক্যগণ। ইহারা বাতাপির চালুক্যগণের একটি শাখা। ইহারা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অন্ধ্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত পূর্ব-দাক্ষিণাত্যে ইহারা নিজেদের সার্বভৌম শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (৩) কল্যাণের চালুক্যগণ। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাষ্ট্রকূট-বংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া ইহারা নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে কল্যাণের চালুক্যগণ ছিলেন বাতাপির চালুক্যগণের বংশধর। (৪) গুজরাটের চালুক্যগণ। সম্ভবতঃ ইহারা বাতাপির চালুক্যগণের বংশসম্ভূত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে ইহারা কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন নাই।

উৎপত্তি (Origin) ঃ চালুক্যগণের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন কানাড়ী বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। স্মিথের মতে ইহারা গুর্জর বংশসম্ভূত ছিলেন এবং কোন এক সময় রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াছিলেন। বাতাপির চালুক্যগণ নিজেদেরকে 'হরিতিপুত্র' বলিয়া দাবি করিতেন। ইহারা নিজেদেরকে 'মানব্য-গোত্র'-ভুক্ত বলিয়াও দাবি করিতেন।

ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ইহা বলা যায় যে প্রথম চালুক্য-রাজা বিজয়াদিত্যের পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করিতেন এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত হিরণ্যরাষ্ট্র নামক জেলাটি বিজয়াদিত্যের বাসভূমি ছিল। বিজয়াদিত্যের পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ ভারতে আগমন করিয়া হিরণ্যরাষ্ট্র নামক অঞ্চল দখল করেন। তাঁহারা প্রথমে অন্ধ্রগণের শাসনাধীন ছিলেন এবং অন্ধ্রগণের পতনের পর তাঁহারা ইক্ষ্বাকুগণের শাসনাধীন হন এবং 'মহা-সেনাপতি', 'মহাতলোয়ার' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। সুতরাং চালুক্যগণকে দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় অধিবাসী বলা যায় এবং উহাদের আদি বাসভূমি ছিল অন্ধ্রদেশ। বিজয়াদিত্যের বংশধরগণ যথা, বিষ্ণুবর্ধন, জয়সিংহ ও রনরাগ প্রভৃতি অন্ধ্রদেশের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া বাতাপিকে কেন্দ্র করিয়া একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম পুলকেশী (**Pulakesin I**): প্রথম পুলকেশী ৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপিপুরায় স্বাধীনভাবে সর্বপ্রথম রাজত্ব শুরু করেন। তিনি ৫৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তিনি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের স্মৃতিরক্ষার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বাতাপি নগর (আধুনিক বাদামি) ছিল তাঁহার রাজধানী।

স্বাধীন রাজ্য স্থাপন

প্রথম কীর্তিবর্মণ, ৫৬৬-৫৯৭ খৃঃ (**Kirtivarman I**): প্রথম পুলকেশীর পর তাঁহার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী নরপতি। তিনি কাদম্ব ও মৌর্যগণকে পরাজিত করিয়া কঙ্কন, বেলারি ও কুর্ণল প্রভৃতি জেলাগুলি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরদিকে তিনি বিহার ও বাংলাদেশে পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে তিনি চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলি জয় করিয়াছিলেন।

রাজ্য জয়

মঙ্গলেশ, ৫৯৭-৬১০ খৃঃ (**Manglesa**): কীর্তিবর্মণের পর তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলেশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'রণ বিক্রান্ত', 'পৃথিবী-বল্লভ', প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন। তিনি কলচুরিগণকে পরাজিত করিয়া মধ্য ও উত্তর-মহারাষ্ট্র দেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মঙ্গলেশ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তিনি নিজ পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করার চেষ্টা করিলে কীর্তিবর্মণের পুত্র পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়া নিহত হন।

রাজ্য জয়

দ্বিতীয় পুলকেশী, ৬১০-৬৪২ খৃঃ (**Pulakesin II**): দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি 'বল্লভ', 'পৃথিবী-বল্লভ', 'পরমেশ্বর পরম ভগবত' প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হইয়াছিল। মঙ্গলেশ ও পুলকেশীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে চালুক্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

রবিকীর্তি নামে জনৈক জৈন কবি কর্তৃক রচিত 'অইহোল' লিপিতে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণে তিনি কাদম্ব ও মহীশূরের গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণকে পরাস্ত করিলেন। উত্তরে কঙ্কনের মৌর্যগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি উহাদের রাজধানী পুরী দখল করিলেন। আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া তিনি মালব ও গুজরাটের রাজন্যবর্গকে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য

রাজ্য জয়

করিলেন। তিনি পল্লব রাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করিলেন। তিনি কাবেরী নদী অতিক্রম করিলে চোল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজ্যের রাজন্যবর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই ভাবে পুলকেশী দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া স্বীয় শাসনাধীনে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল হর্ষবর্ধনের সহিত যুদ্ধ। তিনি হর্ষবর্ধনকে পরাস্ত করিয়া হর্ষবর্ধনের দক্ষিণ ভারত অভিযান প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রভাব প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তিনি পল্লবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উহাদের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পল্লবগণ পুলকেশীর রাজধানী বাদামি আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিলেন। পুলকেশী ক্রমাগত পরাজয় স্বীকার করিয়া অবশেষে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাতাপির চালুক্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইল।

পল্লবগণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং পুলকেশীর রাজ্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাঁহার রাজ্য সুদূর প্রসারিত ছিল। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী রাজা। হিউয়েন-সাং পুলকেশীর রাজনৈতিক প্রতিভা, সামরিক শক্তি ও তাঁহার রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রসংশা করিয়াছেন।

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ

পুলকেশীর খ্যাতি ভারত সীমান্তও অতিক্রম করিয়াছিল। মুসলিম-ইতিহাসে পুলকেশীর সহিত পারস্য-রাজ দ্বিতীয় খসরুর দূত ও পত্র বিনিময়ের উল্লেখ আছে।

পারস্যের সহিত সম্পর্ক

বাতাপির পরবর্তী চালুক্য রাজগণ

(Later Chalukyas of Vatapi)

প্রথম বিক্রমাদিত্য, ৬৫৫-৬৮১ খৃঃঃ দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্যন্ত বাতাপি ও উহার সংলগ্ন অঞ্চলগুলি পল্লবগণের অধিকারভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্রগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বহেতু পল্লবগণকে চালুক্যরাজ্য হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নাই। ৬৪২ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চালুক্য সিংহাসন শূন্য ছিল। অবশেষে চালুক্য সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারগণকে

পরাস্ত করিয়া দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে চালুক্য বংশের লুপ্তশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

বিনয়াদিত্য, ৬৮১-৬৯৬ খৃঃ ঃ বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র বিনয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পল্লব, কেরল, মালব, চোল ও পাণ্ড্যগণের সহিত অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কথিত আছে তিনি পারসিক ও সিংহলের নৃপতিগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, ৬৯৬-৭৩৩ খৃঃ ঃ বিনয়াদিত্যের পর বিজয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পল্লব রাজ পরমেশ্বরবর্মণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী দখল করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য, ৭৩৪-৭৪৫ খৃঃ ঃ বিজয়াদিত্যের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলেও পল্লবগণের সহিত সংঘর্ষ চলিতে থাকে। তিনি পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী সাময়িকভাবে দখল করেন। তাঁহার সামরিক শক্তিতে ভীত হইয়া বিনা যুদ্ধেই চোল ও পাণ্ড্যরাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে আরবগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক।

দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ, ৭৪৬-৭৫৭ খৃঃ ঃ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রকূট-রাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হইলে বাতাপির চালুক্য-বংশের অবসান ঘটে।

চালুক্য বংশের কৃতিত্ব (Achievements of the Chalukyas) ঃ—প্রথমতঃ, ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালুক্য বংশ দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সার্বভৌম রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন

দ্বিতীয়তঃ, চালুক্য রাজগণের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে আরবগণ দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আরবগণের বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষার দায়িত্ব চালুক্যগণকেই অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইয়াছিল।

আরব আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা

তৃতীয়তঃ, চালুক্যরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও অপর ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম জনপ্রিয় ছিল এবং চালুক্যরাজগণ এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। জৈনগ্রন্থকার রবিকীর্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হইতে অনুগ্রহ ও উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম সহিষ্ণু

চতুর্থতঃ, চালুক্যরাজগণের আমলে দক্ষিণ ভারতে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। অজন্তার বহু গুহা-চিত্র চালুক্য রাজত্বকালেই অঙ্কিত হইয়াছিল।

শিল্পকলার উৎকর্ষ

হর্ষোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত (South India in the Post-Harsha Period) : হর্ষোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, (১) মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট বংশ, কল্যাণে চালুক্য বংশ ও তাঞ্জোরে চোল বংশের উত্থান, (২) চোল ও চালুক্যগণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং (৩) বাংলার পাল, গুর্জর, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটবংশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রাষ্ট্রকূট বংশ, (The Rastrakutas)

উৎপত্তি (Origin) : অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া রাষ্ট্রকূটগণ দক্ষিণ ভারতে প্রধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। (১) নবম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট অনুশাসন লিপিতে রাষ্ট্রকূটগণকে মহাভারতের যদুবংশীয় সাত্যকিরের বংশধর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৮০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট রাজগণের সভাকবিগণ রাষ্ট্রকূটগণকে যদুবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দকে ভগবান কৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২) কেহ কেহ রাষ্ট্রকূটগণকে অশোকের লিপিতে উল্লিখিত রথিক বা 'রাষ্ট্রীক'দের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। (৩) আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মূলতঃ রাষ্ট্রকূটগণ ছিলেন দ্রাবিড় দেশের কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইহাদের আদি নিবাস ছিল কর্ণাটক দেশ। অনুশাসন লিপি ও মুদ্রা হইতেও জানা যায় যে রথিক ও মহারাষ্ট্রীয়গণ মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক অঞ্চলের সামন্ত ছিলেন। (৪) সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটগণ প্রথমে চালুক্যরাজগণের অধীনে সামন্তরূপে স্থানীয় শাসকের পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন এবং উহাদের ভাষা ছিল কানাড়ী। রাষ্ট্রকূট-বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তিদুর্গ। তিনি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রদেশ দখল করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, মালব, দক্ষিণ গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ডক্টর আলতেকর-এর (Altekar) মতে দন্তিদূর্গ রাষ্ট্রকূট বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার রাজ্যজয়ের সঠিক কাল নির্ণয় করা সহজ নহে। তাঁহার মতে চালুক্য রাজগণের সামন্তরূপেই তিনি কিছু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। আরবগণের বিরুদ্ধে তিনি চালুক্য রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ও পুলকেশীর সহিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা

দন্তিদুর্গ

রাজ্যজয়

আলতেকর-এর মন্তব্য

করিয়াছিলেন। কথিত আছে, আরবদের বিরুদ্ধে দন্তিদুর্গের সাহসিকতায় ও সাফল্যে সন্তুষ্ট হইয়া চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য দন্তিদুর্গকে 'পৃথিবী-বল্লভ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। চালুক্যরাজগণের রাজত্বকালেই দন্তিদুর্গ মালব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ দন্তিদুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। চালুক্যরাজ পরাজিত হইলে দন্তিদুর্গ সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন (৭৫৩ খৃঃ)। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রথম কৃষ্ণ, ৭৫৮-৭৭৩ খৃঃ ঃ দন্তিদুর্গের পর তাঁহার পুত্র প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কৃষ্ণ চালুক্য রাজকে পরাজিত করিলে চালুক্য সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। তিনি মহীশূরের গঙ্গ-বংশীয় রাজা ও বেঙ্গীর চালুক্য রাজকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ ও মধ্য প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গোবিন্দ, ৭৭৩-৭৮০ খৃঃ ঃ প্রথম কৃষ্ণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহণে করেন। তিনি ছিলেন আরামপ্রিয় এবং শাসনকার্যের ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুবের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি আমোদ-প্রমোদে দিন অতিবাহিত করিতেন। অবশেষে তিনি ধ্রুবকে শাসনকার্য হইতে অপসারিত করিলে ধ্রুব বিদ্রোহী হন এবং গোবিন্দকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন দখল করেন।

ধ্রুব, ৭৮০-৭৯৩ খৃঃ ঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ধ্রুব রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। মহীশূরের গঙ্গ-বংশীয় রাজা, বেঙ্গীর চালুক্য রাজ ও পল্লব রাজকে পরাজিত করিয়া তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। ইহার ফলে প্রতিহার ও পাল-বংশের সহিত রাষ্ট্রকূটগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইল। তিনি প্রতিহার রাজ বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে রাজপুতানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। বাংলার পাল-বংশীয় রাজা ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। এইভাবে ধ্রুব গাঙ্গেয়-দোয়াব অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। বস্তুতঃ ধ্রুবের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজ্যবিস্তার

তৃতীয় গোবিন্দ, ৭৯৩-৮১৪ খৃঃ ঃ ধ্রুবের পর তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁহাকে আভ্যন্তরীণ

বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হইতে হয়। গঙ্গাবেদীর শাসনকর্তা স্তম্ভ (Stambha) বিদ্রোহী হইয়া রাষ্ট্রকূটবংশের শত্রু পক্ষের সহিত যোগদান করিলে তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। স্তম্ভ পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রাষ্ট্রকূটগণের হস্তে বন্দী শিবমার নামে জনৈক গঙ্গ-বংশীয় যুবরাজ স্তম্ভের সহিত গোপনে সহযোগিতা করায় রাষ্ট্রকূট রাজকর্তৃক তিনি নিহত হইলেন।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া তৃতীয় গোবিন্দ রাজ্য জয়ে উদ্যোগী হইলেন। পল্লব-রাজ দন্তিবর্মণ, বেঙ্গী-রাজ চতুর্থ বিষ্ণুবর্মণ বিনা যুদ্ধেই তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ফলে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোবিন্দ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন।

পল্লব ও বেঙ্গীনৃপতিগণের আত্মসমর্পণ

ইহার পর তিনি উত্তর ভারতে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তিনি ভূপাল ও ঝাঁন্সির ভিতর দিয়া কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট তৃতীয় গোবিন্দকে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া রাজপুতানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। বাংলার পাল-বংশীয় রাজা ধর্মপালের সমর্থনপুষ্ট কনৌজের রাজা চক্রায়ুধ বিনা যুদ্ধেই পলায়ন করিলেন। ইহার পর তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ধর্মপাল বিনা যুদ্ধেই রাষ্ট্রকূট-রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। বস্তুতঃ গোবিন্দ পাল-বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিহার বংশের শক্তি খর্ব করায় ধর্মপাল কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রাষ্ট্রকূট রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

উত্তর ভারত অভিযান

প্রতিহার ও পাল নৃপতিগণ ছাড়াও উত্তর ভারতের অপরাপর নৃপতিগণ তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সকল নৃপতিগণের আনুগত্যের বিনিময়ে তৃতীয় গোবিন্দ উহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দেন। উত্তর ভারত হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি মালব, কোশল, কলিঙ্গ ও বেঙ্গী প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

উত্তর ভারতের অন্যান্য নৃপতিগণের বশ্যতা স্বীকার

তিনি উত্তর ভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকাকালীন দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরল, পল্লব প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ রাষ্ট্রকূট রাজের বিরুদ্ধে এক শক্তিচক্র গঠন করেন। গোবিন্দ এই সংবাদ পাওয়া মাত্র দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একে একে সকল দক্ষিণী নৃপতিগণকে পরাজিত করিলেন। এই বিজয়ের ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূটবংশের প্রভূত্ব স্থাপিত হইল। কথিত আছে তাঁহার সামরিক

দক্ষিণ ভারত অভিযান

শক্তিতে ভীত হইয়া সিংহলের রাজাও রাষ্ট্রকূট-রাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্রথম অমোঘবর্ষ, ৮১৪-৮৭৮ খৃঃ : তৃতীয় গোবিন্দের পর তাঁহার পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনারোহনের সময় অমোঘবর্ষ ছিলেন নাবালক। তাঁহার নাবালকত্বের সুযোগ লইয়া রাষ্ট্রের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। এতদ্ভিন্ন রাজপরিবারেও অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। ইহার ফলে রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল এবং রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। গঙ্গাবেদীর শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং বেঙ্গীর রাজা দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই অবস্থায় অমোঘবর্ষ স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন করিলেন। সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি বেঙ্গীর রাজা বিজয়াদিত্যকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রকূট রাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করিলেন।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

বেঙ্গীর রাজার সহিত যুদ্ধ

অমোঘবর্ষের রাজত্বের শেষ কুড়ি বৎসর গঙ্গ-বংশের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া অমোঘবর্ষ গঙ্গ-বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

গঙ্গ বংশের সহিত যুদ্ধ

অমোঘবর্ষ রাজ্য জয় করা অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সামরিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রতিহার ও পাল-বংশীয় নৃপতিগণ উত্তর ভারতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সামরিক দুর্বলতা হেতু প্রতিহার ও পাল বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি

অমোঘবর্ষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইয়াও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। জৈন ধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং হর্ষবর্ধনের ন্যায় নিজেও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'রত্নমালিকা' ও 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থ দুইটি সুধী সমাজে প্রশংসিত হইয়াছিল। আরব-পর্যটক সুলেমান অমোঘবর্ষকে বিশ্বের অপর তিনজন নৃপতি—বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট ও কনষ্ট্যান্টিনোপল-এর অধিপতির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও বিদ্যোৎসাহিতা

আরব পর্যটক সুলেমান কর্তৃক প্রশংসিত

দ্বিতীয় কৃষ্ণ, ৮৭৮-৯১৪ খৃঃ : প্রথম অমোঘবর্ষের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শাসক হিসাবে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

রাষ্ট্রকূট বংশের অনুশাসনলিপিতে দাবি করা হইয়াছে যে দ্বিতীয় কৃষ্ণ প্রতিহার ও পাল-বংশীয় নৃপতিগণের আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন এবং অঙ্গ, কলিঙ্গ ও গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণও রাষ্ট্রকূট রাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল প্রতিহার রাজ ভোজের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গীর চালুক্যগণের সহিতও তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম দিকে চালুক্যগণ সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কৃষ্ণ চালুক্যগণকে পরাজিত করেন এবং চালুক্য রাজ ভীম বন্দী হন।

রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার সংঘর্ষ

চোলগণের সহিতও দ্বিতীয় কৃষ্ণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। চোলগণের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোল রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

রাষ্ট্রকূট-চোল সংঘর্ষ

তৃতীয় ইন্দ্র, ৯১৪-৯২২ খৃঃ : দ্বিতীয় কৃষ্ণের পর তাঁহার পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রকূট বংশের সামরিক গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রতিহার রাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূটবংশের প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের পতন (Fall of the Rastrakuta Dynasty) : তৃতীয় ইন্দ্রের পর হইতে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ যথাক্রমে ৯২২ হইতে ৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। তিনি সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রকূট বংশের বিলুপ্ত গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুণরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রতিহার রাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া তিনি কালিঞ্জর ও চিত্রকূট অধিকার করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধে তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সিংহলের রাজাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৪০-৯৬৮)

৯৬৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রাষ্ট্রকূট বংশের গৌরব রবি অস্তমিত হইতে থাকে। একে একে প্রদেশগুলি স্বাধীন হইয়া যায়। অবশেষে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে কল্যাণের চালুক্য রাজ কর্তৃক এই বংশের শেষ রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষ পরাজিত হইলে রাষ্ট্রকূট বংশের অবসান ঘটে।

রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শাসন পদ্ধতি

(Administrative system of the Rastrakuta Empire)

রাজা : রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক ও সকল শক্তির আধার। তিনি 'মহারাজাধিরাজ', 'পরম ভট্টারক' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। প্রতিদিন রাজা রাজদরবারে উপস্থিত থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজার সহিত রাষ্ট্রের মন্ত্রী, সামন্ত নৃপতি, পররাষ্ট্র দূত, কবি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ উপস্থিত থাকিতেন।

যুবরাজ ও অন্যান্য রাজকুমারগণ

রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং সাধারণতঃ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনিত হইতেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ পুত্রও উত্তরাধিকারী মনোনীত হইতেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে 'যুবরাজ' বলা হইত। তিনি পিতার সহিত শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শাসন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগলাভ করিতেন। তিনি পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনাও করিতেন। রাজ পরিবারের অন্যান্য 'কুমারগণ' প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইতেন। অপরাপর রাজকুমারগণও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিতেন। চন্দ্রবেলব্বা নামে প্রথম আমোঘবর্ষের কন্যা রাইচুর দোয়াবের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

মন্ত্রী : রাজা মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেন। মন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, রাজস্ব মন্ত্রী, প্রধান বিচারক প্রভৃতি ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্ত্রীগণ সামরিক ও বে-সামরিক উভয় কার্যেই নিযুক্ত থাকিতেন।

মৌর্য ও গুপ্তযুগের ন্যায় 'অমাত্য' বা 'কুমারামাত্য' নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। প্রদেশ ও জেলাগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিরূপ ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া শাসনকার্য পরিদর্শন করিতেন।

সামন্ত রাজ্য : রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যে সামন্ত শাসিত রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সামন্তগণ একরূপ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। প্রধান সামন্তগণের অধীনে থাকিতেন অধস্তন সামন্তগণ। ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না। সকল বিষয়ে অধস্তন সামন্তগণ উচ্চতর সামন্তগণের অধীনে থাকিতেন। উচ্চতর সামন্তগণ সম্রাটকে নিয়মিত করদানে ও প্রয়োজনীয় সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। কোন কোন সময় সামন্তগণকে সৈন্যসহ সম্রাটের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে হইত।

সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ সামন্তগণের রাজসভায় অবস্থান করিয়া সামন্তগণের কার্যকলাপের উপর নজর রাখিতেন। সামন্তগণের প্রতিনিধিগণও সম্রাটের রাজসভায় অবস্থান করিতেন।

প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল 'রাষ্ট্র' ও 'বিষয়' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক হাজার হইতে চারি হাজার গ্রাম লইয়া 'বিষয়গুলি' গঠিত ছিল। প্রতিটি 'বিষয়' কতকগুলি 'ভুক্তি'-তে বিভক্ত ছিল। পঞ্চাশ হইতে আশিটি গ্রাম লইয়া এক একটি ভুক্তি গঠিত ছিল। গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ।

দুইটি ভাগ ঃ রাষ্ট্র ও বিষয়

'রাষ্ট্রের' শাসনকর্তাকে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হইত। সামরিক ও বে-সামরিক উভয় প্রকার শাসনের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। রাষ্ট্রপতিগণ স্ব স্ব এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। সামন্তগণের কার্যকলাপের উপর তাঁহারা নজর রাখিতেন এবং বিদ্রোহী সামন্তগণের দমনের দায়িত্বও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত।

রাষ্ট্রপতি

'বিষয়পতি'র ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল অনেকটা রাষ্ট্রপতির ন্যায়। পুরস্কার হিসাবে হউক কিংবা যোগ্যতা হিসাবেই হউক রাজ-কর্মচারীগণকে বিষয়পতির পদে নিযুক্ত করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়পতির পদ ছিল বংশানুক্রমিক।

বিষয়পতি

গ্রামের শাসনভার গ্রাম্য প্রধানের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। এই পদ ছিল বংশানুক্রমিক। গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব ছিল গ্রাম্য প্রধানের হস্তে। ইহার জন্য একটি আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী গ্রাম্য প্রধানের অধীনে থাকিত। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও গ্রাম্য প্রধানের হস্তে ন্যস্ত থাকিত।

গ্রাম্য প্রধান

সামরিক বিভাগ ঃ রাষ্ট্রকূট সম্রাটগণ এক বিরাট স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতেন। ডক্টর আল্‌তেকর-এর মতে রাষ্ট্রকূট সাম্রাটদের সৈন্য সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষেরও অধিক। সৈন্যবাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশ রাজধানীতে এবং অপর দুইটি অংশ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মোতায়েন থাকিত। প্রধানতঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া রাষ্ট্রকূট সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল। স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছাড়াও সমান্তগণও যুদ্ধের সময় সম্রাটকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। সকল সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত।

রাজস্ব ঃ ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রধান আয়। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ ভূমিকর হিসাবে গ্রহণ করা হইত। ইহা 'ভোগকর নামে পরিচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন ফলকর, জলকর ও খনি হইতেও প্রচুর আয় হইত। দুর্ভিক্ষের

সময় করের পরিমাণ হ্রাস করা হইত। কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল এবং ইহার জন্য কৃষকগণকে অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইত।

রাষ্ট্রকূট বংশের কৃতিত্ব (Achievements of the Rastrakutas)ঃ প্রায় দুই শতাব্দীরও অধিক কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটগণ দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সার্বভৌম রাজশক্তি অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ ভারত ছাড়াও উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাষ্ট্রকূটগণ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের রাজত্বকালের গুরুত্ব কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকূটগণের আমলে দক্ষিণ ভারতে শিল্প, সাহিত্য ও বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজগণ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা বহু মন্দির ও মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দিরটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কৈলাসনাথের মন্দিরটিকে স্মিথ "গর্বের বস্তু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূট রাজগণ সিন্ধুদেশের আরবদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আরবদের সহিত দক্ষিণ ভারতীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন

উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন

শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়ন

আরবদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

কল্যাণের চালুক্যবংশ (The Chalukyas of Kalyan)ঃ বাতাপির চালুক্যগণের অপর একটি শাখা ছিল কল্যাণের চালুক্যগণ। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে বাতাপির চালুক্যরাজ্যের বংশধর দ্বিতীয় তৈল বা তৈলজ রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কার্ককে পরাজিত করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ বা কল্যাণী ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় তৈল রাজত্ব করেন। তিনি পশ্চিমী চালুক্য বংশের হৃতরাজ্যের কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। কথিত আছে দ্বিতীয় তৈল উড়িষ্যা, নেপাল ও কুন্তল প্রভৃতি রাজ্যগুলিও জয় করিয়াছিলেন।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় তৈল

দ্বিতীয় তৈলের পর তাঁহার পুত্র সত্যাশ্রয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পরমার বংশীয় সিন্ধুরাজ ও চোল-অধিপতি রাজরাজ চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সত্যাশ্রয় বিপুল বিক্রমে উহা প্রতিহত করেন। সত্যাশ্রয় কুর্ণল ও গুণ্টুর

সত্যাশ্রয়

পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রভুত্ব লইয়া চালুক্য ও চোলগণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম শুরু হয়।

দ্বিতীয় জয়সিংহ (১০১৪-১০৪২)

সত্যাশ্রয়ের পুত্র দ্বিতীয় জয়সিংহের রাজত্বকালে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব ও চোল-রাজ রাজেন্দ্রচোল একযোগে চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু জয়সিংহ এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চালুক্য রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

প্রথম সোমেশ্বর (১০৪২-১০৬৮)

জয়সিংহের পর তাঁহার পুত্র প্রথম সোমেশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেও চোলগণের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। দ্বিতীয় সোমেশ্বরের অনুশাসন লিপিতে দাবি করা হইয়াছে যে প্রথম সোমেশ্বর চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোলের অনুশাসন লিপিতে প্রথম সোমেশ্বরের পরাজয়ের কথা উল্লিখিত আছে। প্রথম সোমেশ্বর পরমার ও চেদী রাজগণের সহিত একাধিক যুদ্ধে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। কোশল ও কলিঙ্গ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬)

সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সভাকবি বিহ্লন-রচিত 'বিক্রমাংকদেব চরিত' নামক গ্রন্থে তাঁহার সামরিক প্রতিভা ও রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি চোলরাজ কুলো-তুঙ্গকে পরাজিত করিয়া চোল রাজধানী দখল করিয়াছিলেন। তিনি হোয়সল রাজ বিষ্ণুবর্ধনকেও পরাজিত করিয়া মহীশূরের একাংশ দখল করিয়াছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিতা

বিক্রমাদিত্য বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বিহ্লন ব্যতীত 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

কল্যাণের চালুক্য-বংশের পতন

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পর কল্যাণের চালুক্য বংশের পতন শুরু হয়। বিক্রমাদিত্যের পর তৃতীয় সোমেশ্বর এবং তৃতীয় তৈল যথাক্রমে রাজত্ব করেন। তৃতীয় তৈল ১১৫০ হইতে ১১৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং মহীশূরের হোয়সল, ও মহারাষ্ট্রের যাদবগণের ক্রমাগত আক্রমণে চালুক্য বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে হোয়সল ও যাদবগণ কল্যাণের চালুক্য রাজ্য দখল করিয়া লয়।

চোল-বংশ (The Cholas)

চোলগণের প্রাচীন ইতিহাস (Early History of the Cholas): চোলগণ ছিল সুদূর দক্ষিণ ভারতের এক অতি প্রাচীন জাতি। বর্তমান পেনার

ও ভেলার নদী দুইটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও পদুকোটাই লইয়া চোল রাজ্য গঠিত ছিল। মহাভারতেও চোলদের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণী ও অশোকের শিলালিপিতে স্বাধীন চোল রাজ্যের উল্লেখ আছে। গ্রীক, রোমান ও তামিল গ্রন্থকারদের গ্রন্থেও চোলদের সামুদ্রিক কর্মতৎপরতার উল্লেখ আছে। 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে সিংহলের নৃপতিগণের সহিত চোলদের সম্পর্কের উল্লেখ আছে। 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে চোল রাজ্যের বন্দর ও নগরগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে এলোর নামে জনৈক চোলরাজা সিংহল দ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসী

অশোকের শিলালিপি, গ্রীক, রোমান ও তামিল গ্রন্থে চোলদের উল্লেখ

চোল রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন কারিকল। তাঁহার নেতৃত্বে চোলগণ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কারিকল রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ড্য ও চেরগণ চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু কারিকল উহাদের যুগ্ম আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সিংহল দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথা হইতে ১২০০ জন বন্দী লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কারিকলের রাজধানী ছিল কাবেরী পদিনাম।

প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কারিকল

কারিকলের পৌত্র নেদুমুদিকিল্লির রাজত্বকালে জলদস্যুদের আক্রমণে চোল রাজধানী ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে পল্লবগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে চোলগণের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। কালক্রমে পল্লব, চের ও পাণ্ড্যগণের ক্রমাগত আক্রমণে চোলরাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাং-এর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে চোলরাজ্য জনবিরল ও অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চোলগণ পল্লব বংশের শাসনাধীনে ছিল।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লব চের ও পাণ্ড্য গণের আক্রমণে চোলরাজ্যের সাময়িক বিলুপ্তি

চোল বংশের পুনরভ্যুদয় (Revival of the Chola Power) ঃ নবম শতাব্দীতে পল্লব বংশের পতন শুরু হইলে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোল শক্তির পুনরভ্যুদয় ঘটে। বিজয়ালয় পাণ্ড্যগণের নিকট হইতে তাঞ্জোর দখল করেন। সেই সময় হইতে তাঞ্জোর চোল রাজ্যের রাজধানী হয়। বিজয়ালয়ের পর তাঁহার পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৮০-৯০৭ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চোল বংশের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। তিনি পল্লব রাজ

বিজয়ালয় ঃ প্রথম আদিত্য

অপরাজিতকে পারাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করেন। তিনি কঙ্গু প্রদেশ জয় করিয়া পশ্চিম গাঙ্গেয়গণকে পরাজিত করেন। তাঁহার সময় চোল-রাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ হইতে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আদিত্য ছিলেন শিবের উপাসক।

প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৪)

আদিত্যের পর তাঁহার পুত্র প্রথম পরান্তক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতে চোলশক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পাণ্ড্য রাজ্য দখল করিয়া উহার রাজা রাজসিংহকে সিংহলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। তিনি উত্তরে নেলোর পর্যন্ত চোল-রাজ্য বিস্তার করেন। চোল শক্তির ক্রমবিস্তারে আতঙ্কিত হইয়া রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণ মহীশূরের গাঙ্গেয়-রাজার সাহায্যে পরান্তককে পরাজিত করেন। ইহার ফলে চোল-রাজ্য সাময়িকভাবে হীনবল হইয়া পড়ে।

পরান্তক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঋগ্বেদের একজন প্রাচীন টীকাকার ভেঙ্কট-মাধব তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম রাজরাজ (মহান) (৯৮৫-১০১০)

চোলরাজ প্রথম রাজরাজ ছিলেন চোল-বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার নেতৃত্বে চোলগণ পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে। রাজরাজের তাঞ্জোর-লিপিতে তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি ত্রিবেন্দ্রামের নিকট চেরগণকে পরাজিত করেন। ইহার পর তিনি পাণ্ড্য-রাজকে পরাজিত করিয়া মাদুরা দখল করেন। সিংহলের উত্তরাংশ জয় করিয়া তিনি তাহা চোল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং অনুরাধাপুরে চোল অধিকৃত সিংহলের রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি পশ্চিমী চালুক্য-রাজ সত্যাশ্রয়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালুক্য-রাজ চোল-রাজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। ইহার পর

রাজ্য জয়

রাজরাজ বেঙ্গীর চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার রাজা বিনয়াদিত্যকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করেন। মাদ্রাজ, মহীশূরের কিয়দংশ ও কুর্গ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাজরাজ শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে পশ্চিম সাগরে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপের উপরও তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

রাজরাজ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। বিজেতা ও সাম্রাজ্য স্রষ্টা হিসাবে তিনি দক্ষিণ ভারতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যেরও পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি তাঁহার কীর্তি। শৈব ধর্মে অনুরাগী হইলেও অপর ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

প্রথম রাজেন্দ্র চোলঃ রাজরাজের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪ খৃঃ) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি 'গঙ্গই কোণ্ড চোল' ও 'উত্তম চোল' নামেও পরিচিত ছিলেন। যুবরাজ হিসাবে তিনি শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি

সিংহাসনে আরোহণের অনতিকাল মধ্যে তিনি সমগ্র সিংহল চোল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চের (কেরল) ও পাণ্ড্যগণের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং নিজপুত্রকে এই রাজ্যগুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। পশ্চিমী চালুক্যগণের সহিতও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ চোল আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হন।

সিংহল, পাণ্ড্য, চের রাজ্য জয়

রাজেন্দ্রচোলের রাজ্যবিস্তার শুধু দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকূটদের ন্যায় তিনিও দক্ষিণ ভারত বিজয় সম্পন্ন করিয়া উত্তরভারত অভিযানে অগ্রসর হইলেন। তিনি পূর্ব বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মহীপাল ও দক্ষিণ-বঙ্গের রণসূরকে পরাজিত করিলেন। পূর্ব-ভারতে সামরিক জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি 'গঙ্গই কোণ্ড' উপাধি ধারণ করেন। তিনি তাঁহার শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও মালব জয় করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে সামরিক অভিযান

'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি ধারণ

নিকোবর, মালব জয়

নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 'গঙ্গই কোণ্ড চোলপুরম' নামে এক নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজেন্দ্র চোল চীন সাম্রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং একাধিকবার চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

চীনের সহিত মিত্রতা স্থাপন

রাজেন্দ্র চোলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান। অষ্টম শতাব্দীতে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব এশিয়ার হিন্দু রাজবংশগুলির মধ্যে শৈলেন্দ্র বংশ ছিল সকলের অন্যতম। আরব লেখকদের মতে সেই যুগে শৈলেন্দ্র বংশের রাজাদের ন্যায় শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ-শালী রাজা আর কেহ ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের সহিত শৈলেন্দ্র বংশের সংঘর্ষ ঘটে, যদিও প্রথম দিকে এই দুই রাজ-বংশের মধ্যে সম্পর্ক ভালই ছিল। চীনের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে উভয়

চোল-শৈলেন্দ্র সংঘর্ষ

রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী শৈলেন্দ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্রে রাজ বিজয়োতুঙ্গবর্মন পরাজিত হইয়া বন্দী হন। ইহার ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের কিছু অংশ চোলদের হস্তগত হয়। কোন ভারতীয় নৃপতি ইতিপূর্বে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এইরূপ সামরিক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

পরবর্তী চোলরাজগণ : রাজেন্দ্র চোলের পর তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ (১০৪৪-১০৫২ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি পাণ্ড্য ও চের নৃপতিগণকে পুনরায় দমন করেন। পাণ্ড্য ও চের নৃপতিগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সিংহল আক্রমণ করিয়া উহার রাজাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন।

রাজাধিরাজ

রাজাধিরাজের পর তাঁহার ভ্রাতা বীর রাজেন্দ্র (১০৬৪-১০৭০ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দুইবার পশ্চিমী চালুক্যগণের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং এই জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার্থে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে একটি বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করেন। ইহার পর তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া উহা জয় করেন। পাণ্ড্য ও চের নৃপতিগণ চোল শাসনাধীন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে বীর রাজেন্দ্র উহাদের পুনরায় কঠোর হস্তে দমন করেন। ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সোমেশ্বর চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করিলে বীর রাজেন্দ্র চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বীর রাজেন্দ্র

বীর রাজেন্দ্রের পর অধিরাজেন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তিনি এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

অধিরাজেন্দ্র

অধিরাজেন্দ্রের পর কুলোতুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে পাণ্ড্য ও চেরগণ বিদ্রোহী হইলে কুলোতুঙ্গ পুনরায় উহাদের দমন করেন এবং উহাদের উপর স্থায়ী কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পাণ্ড্য ও চের রাজ্যে চোল সেনানিবাস স্থাপন করেন। অবশ্য আভ্যন্তরীন ব্যাপারে পাণ্ড্য ও চেরগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। কুলোতুঙ্গ চোল ও পূর্ব-চালুক্য রাজ্য সংযুক্ত করিয়া চোল-চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়া কলিঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের গহড়বালগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। কুলোতুঙ্গ ছিলেন প্রজাহিতৈষী রাজা।

কুলোতুঙ্গ

চোল বংশের পতন : কুলোতুঙ্গের পর বিক্রমচোল (১১২০-১১৩৫ খৃঃ) দ্বিতীয় কুলোতুঙ্গ (১১৩৫-১১৫০ খৃঃ), দ্বিতীয় রাজরাজ (১১৫০-১১৭৩ খৃঃ),

দ্বিতীয় রাজাধিরাজ ও তৃতীয় রাজাধিরাজ (১২০৬-১২৫৬ খৃঃ) যথাক্রমে রাজত্ব করেন। কুলোতুঙ্গের পর হইতে চোল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে থাকে। তৃতীয় রাজাধিরাজের আমলে পাণ্ড্যগণ শক্তিশালী হইয়া তাঞ্জোর আক্রমণ করেন এবং চোল-রাজকে করদ-রাজ্যে পরিণত করেন। অবশ্য হোয়সল রাজের সাহায্যে তৃতীয় রাজরাজ চোল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু চোল-রাজ্যের সাফল্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং পাণ্ড্য, কাকতিয় ও হোয়সলগণের ক্রমাগত আক্রমণে চোল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে এবং কাকতিয় ও হোয়সলগণ নিজেদের মধ্যে চোল সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লন। এইভাবে চোল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

কুলোতুঙ্গের পরবর্তী চোল-নৃপতিগণ

চোল শাসনব্যবস্থা (Chola Administration)ঃ রাজ্য জয় ছাড়াও চোলরাজগণ শাসন বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চোল-রাজগণের অনুশাসন লিপি ও আরব গ্রন্থকারগণের বর্ণনা হইতে চোল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

চোল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি 'মণ্ডল' নামে পরিচিত ছিল। প্রদেশগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ বা মণ্ডলগুলির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রতিটি 'মণ্ডল' কয়েকটি কোট্টম বা 'বলনাড়ুতে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি 'কোট্টম' আবার কতকগুলি জেলা বা 'নাড়ু'তে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি গ্রাম্য সমবায় লইয়া নাড়ুগুলি গঠিত ছিল। এই গ্রাম্য সমবায়গুলি 'কুরম' নামে পরিচিত ছিল।

রাষ্ট্রীয় বিভাগ মণ্ডল কোট্টম, নাড়ু ও কুরম

রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক। চোল নৃপতিগণ ছিলেন জাঁকজমক প্রিয় এবং নানাবিধ উপাধি ধারণ করিয়া তাঁহারা নিজেদের কৃতিত্ব ঘোষণা করিতেন। রাজপদ ছিল বাশানুক্রমিক। অবশ্য প্রয়োজনবোধে অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। চোল নৃপতিগণ মন্দিরে অকাতরে দান করিতেন। দেব-দেবীর রাজকীয় নামকরণ করিবার প্রথা চোলরাজগণ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মন্দিরগুলিতে চোল নৃপতি ও রাণীদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হইত এবং সেইগুলির প্রতি উপাসনারও ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রাজা সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদ অনেক বিষয়ে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিত। প্রতিটি শাসন বিভাগের অধিকর্তাগণ সর্বদাই রাজার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতেন এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করিতেন।

রাজা

প্রদেশগুলির কয়েকটি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত হইত এবং অবশিষ্টগুলি সামন্তগণ কর্তৃক শাসিত হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখিতেন এবং রাজার নিকট সকল বিষয়ে দায়ী থাকিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

প্রাদেশিক শাসন

ভূমি-রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রধান আয়। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। গ্রাম্য সভাগুলি কর আদায় করিত। কৃষক মালিকানা চোল-সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। জলসেচের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও শুল্ক, লবণ ও খনি হইতে রাষ্ট্রের প্রচুর আয় হইত। রাজ্যের সমগ্র অঞ্চল জরিপ করিয়া ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হইত। চোল রাজ্যে মজুরগণকে বিনা পারিশ্রমিকে বলপূর্বক খাটাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। রাজা কুলোতুঙ্গ এই রীতির অবসান ঘটান। সামন্তগণের অভ্যুদয়ের ফলে প্রজাবর্গের উপর নানাপ্রকারের অত্যাচার শুরু হইয়াছিল ও খাজনার পরিমাণও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত না হইলে তাহা বিক্রয় করিবার অধিকার সরকারের ছিল।

রাজস্ব

চোল-রাজগণের সামরিক বিভাগ ছিল সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা একটি বিরাট স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতেন। সামরিক বাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী। সৈন্যগণকে উপযুক্ত সমর-শিক্ষা দেওয়া হইত। সমর নায়কগণ 'নায়ক' 'সেনাপতি', ও 'মহাদণ্ড-নায়ক' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। চোল-রাজগণের নৌ-বাহিনীও শক্তিশালী ছিল। করমণ্ডল ও মালাবারের উপকূল রক্ষা করার ব্যাপারেই নৌ-বাহিনী প্রধানতঃ নিযুক্ত থাকিত। সৈন্য স্থানান্তর করার ব্যাপারে পণ্যবাহী-জাহাজগুলিও যথেষ্ট সাহায্য করিত। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যেই চোলরাজগণ বৃহত্তর ভারতে রাজ্য জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সামরিক বিভাগ

চোল সাম্রাজ্যের শাসন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত ছিল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি করিয়া প্রতিনিধি-সভা বা পরিষদ ছিল। প্রতিনিধি-সভা 'নগরম' নামে পরিচিতি ছিল। গ্রম্যসভার কার্যাদি পরিদর্শনের জন্য রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রাম্য শাসনকার্যে গ্রাম্য-সভাগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইত। গ্রামের কৃষি জমির জরিপ, রাজস্ব আদায়, বিরোধ নিষ্পত্তি ও শিক্ষা-বিস্তারের ভার গ্রাম্যসভার উপর ন্যস্ত থাকিত। কৃষি ছাড়া কৃষি-শিল্পগুলি গ্রামবাসীদের

গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন

অর্থ নৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। কুটির শিল্পগুলি গ্রামবাসীদের চাহিদা মিটাইত। এক কথায় গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং-শাসিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনমূলক পরিষদগুলি গ্রামের সমগ্র জমির প্রকৃত মালিকানাস্বত্ত ভোগ করিত এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ও তাহা নিয়মিতভাবে রাজকোষে প্রেরণের দায়িত্ব উহাদের উপর ন্যস্ত থাকিত। গ্রামগুলিতে বিচারের ভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের প্রায় সকল ক্ষমতা ইহারা ভোগ করিত। ইহারা গ্রাম্য হাট-বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিত। জনকল্যাণের প্রয়োজনে ইহারা অতিরিক্ত খাজনা ধার্য করিতে পারিত এবং বিনা পারিশ্রমিকে মজুর নিয়োগ করিবার অধিকারও ইহাদের ছিল। অজন্মা বা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রাম্য পরিষদগুলি জনগণকে শস্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিত। বহিরাক্রমণ হইতেও গ্রাম্য-পরিষদগুলি গ্রামবাসীকে রক্ষা করিত। নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধের জন্য গ্রাম্য-পরিষদগুলি রাজা কর্তৃক দণ্ডিত হইত। সাধারণতঃ রাজা ও গ্রাম্য-পরিষদগুলির মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকিত। চোল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী সম্পর্কে স্মিথ বলেন "The administrative system was well thought and reasonably efficient."

স্মিথের মন্তব্য

পাণ্ড্য-রাজ্য

(The Pandya Kingdom)

আধুনিক কালের মাদুরা, তিনেভেলি ও ত্রিবাঙ্কুরের কিছু অংশ লইয়া পাণ্ড্য রাজ্য গঠিত ছিল। মাদুরা ছিল ইহার রাজধানী। খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত ভারতীয় সাহিত্যে পাণ্ড্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতে স্বাধীন পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে পাণ্ড্যরাজ্য মহিলাগণ কর্তৃক শাসিত হইত। কলিঙ্গ-রাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে পাণ্ড্যগণের উল্লেখ আছে। কথিত আছে খৃষ্ট পূর্ব ২০ অব্দে জনৈক পাণ্ড্য রাজা রোমসম্রাট অগষ্টাসের রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পর সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পাণ্ড্য দেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পাণ্ড্য রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস

মেগাস্থিনিসের বিবরণী, অশোক ও খারবেলের শিলালিপিতে পাণ্ড্য-গণের উল্লেখ

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে কডুঙ্গন নামে এক শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে পাণ্ড্য-রাজশক্তির পুনরুত্থান ঘটে। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই বংশের চতুর্থ রাজা অরিকেশরী মারবর্মণ (৬৭০-৭১০ খৃঃ) কেরল ও অন্যান্য রাজ্য জয় করিয়া পাণ্ড্য রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি চালুক্য রাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যের সহিত যুগ্মভাবে পল্লব-রাজ পরমেশ্বরকে পরাজিত করেন। অরিকেশরী মারবর্মণের পর মারবর্মণ রাজসিংহ (৭৩৫-৭৬৫ খৃঃ) ও জটিল পরান্তক (৭৬৫-৮১৫ খৃঃ) যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর ও কয়েমবাটোর জেলাগুলি পাণ্ড্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

কডুঙ্গন

অরিকেশরী মারবর্মণ

মারবর্মণ, রাজসিংহ, জটিল পরান্তক

শ্রীমার শ্রীবল্লভ ছিলেন পাণ্ড্য বংশের পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি ৮১৫ হইতে ৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চোল, পল্লব, গঙ্গ প্রভৃতি নৃপতিগণের এক যুগ্ম আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাণ্ড্য সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। তিনি সিংহল দ্বীপ আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র বড়গুণবর্মণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে শ্রীমার শ্রীবল্লভ সিংহল রাজ্যের সাহায্য লাভ করেন। শ্রীমার শ্রীবল্লভ যখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত সেই সময় পল্লব রাজ নৃপতুঙ্গ পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন এবং পাণ্ড্যরাজ পরাজিত হইয়া নিহত হন।

শ্রীমার-শ্রীবল্লভ

পল্লবগণের পর চোলগণ পাণ্ড্যরাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাণ্ড্য রাজ্য চোলরাজ্যের শাসনাধীন থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জটাবর্মণ—সুন্দর পাণ্ড্যের নেতৃত্বে (১২৫১-১২৭২ খৃঃ) পাণ্ড্যরাজ্য পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। জটাবর্মণ চোল, চের, সিংহল ও কাঞ্চীর নৃপতিগণকে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে নেলোর হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জটাবর্মণ

জটাবর্মনের পর পাণ্ড্য রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খালজীর সেনাপতি মালিক কাফুর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন এবং উহার রাজধানী মাদুরা বিধ্বস্ত করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ্য দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অঙ্গীভুত হইলে উহার অবসান ঘটে।

পাণ্ড্যরাজ্যের বিলুপ্তি

ইটালীয় পর্যটক মার্কোপোলো ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী ও কায়েল বন্দরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ

মার্কোপলোর বিবরণ

করিয়াছেন। তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের ঐশ্বর্য ও গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি (South Indian Culture) : উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও অবিরাম রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যেও সেইযুগে হিন্দু সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। শিল্পকলা, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে উত্তর ভারতীয়দের ন্যায় দক্ষিণ ভারতীয়দের অবদানও গৌরবময়।

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা (Art) : ভারতীয় শিল্পকলার প্রেরণা ছিল ধর্মমূলক। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও বহু মঠ, মন্দির ও চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। বিধর্মী মুসলমানদের ক্রমাগত আক্রমণে উত্তর ভারতের মন্দিরগুলি ধ্বংস বা বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি আজও প্রায় অক্ষত রহিয়াছে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ ভারত সহস্রাধিক মাইল দূরে অবস্থিত থাকায় দক্ষিণ ভারতের মঠ, মন্দিরগুলি মুসলমানদের ধর্মীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার উৎকর্ষ বিধানে পল্লব, চোল, রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজবংশের দান অবিস্মরণীয়। এই রাজবংশগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। দক্ষিণ ভারতের নৃপতিগণ নগর স্থাপন, মন্দির ও বিগ্রহ নির্মাণ প্রভৃতি তাঁহাদের বংশগৌরবের চিহ্নরূপে বিবেচনা করিতেন।

পল্লব শিল্প

পল্লব রাজগণ অসংখ্য প্রস্তর নির্মিত কারুকার্যময় মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি পল্লব রাজগণের আমলেই সর্বপ্রথম চালু হইয়াছিল। পল্লবরাজ নরসিংহ-বর্মন কর্তৃক নির্মিত মহাবলিপুরমের 'সপ্তরথ' মন্দির, কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির ও মামল্লাপুরমের রথমন্দিরগুলি পল্লব স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাহাড় কাটিয়া এই মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। নরসিংহবর্মনের সময় হইতে দক্ষিণ ভারতে মন্দির নির্মাণে পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। মামল্লাপুরমের মন্দিরগুলির অপূর্ব সুষমা, গঠন সৌষ্ঠব, শিল্পীর দক্ষতা এ সমস্তই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার তুলনা উত্তর ভারতে একমাত্র গুপ্তযুগের চরম শিল্প-বিকাশের সময় লক্ষ্য করা যায়। কৈলাসনাথের মন্দিরটিতে দ্রাবিড় শিল্প-রীতির আভাষ পাওয়া যায়। পল্লব স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে ভারতের বাহিরে কম্বোজ, আনাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের রীতি চালু হইয়াছিল।

চোল-শিল্প

চোল বংশের আমলে দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চোল রাজগণ ছিলেন শিব ও বিষ্ণুর উপাসক। চোলরাজ রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি চোল শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরের শীর্ষস্থানে অবস্থিত

গম্বুজটি একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ড এবং ইহা কি ভাবে শীর্ষস্থানে উত্তোলন করা হইয়াছিল তাহা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক স্থাপিত 'গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম' নামক নগর, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় প্রাসাদ এবং নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মন্দিরটি চোল স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্যের অপর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চোল মন্দিরগুলিতে ক্ষোদিত অসংখ্য মূর্তি অপূর্ব ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। চোল শাসনকালের শেষ ভাগে কারুকার্যময় বিশালাকার 'গোপুরম' বা তোরণের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। মূল মন্দিরগুলি অপেক্ষা তোরণগুলিই অধিকতর বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কুম্ভকোনমের তোরণটী চোল স্থাপত্য শিল্পের অপর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চোল শাসনকালে বহু গুহা মন্দিরও নির্মিত হইয়াছিল। অজন্তা ও এলিফেন্টার কয়েকটি গুহা-মন্দির চোল-শাসনকালেই নির্মিত হইয়াছিল।

চালুক্য শিল্প

চালুক্য রাজগণও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাদামীর গুহা-মন্দির, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের সঙ্গমেশ্বর মন্দির ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বিরূপাক্ষ মন্দির চালুক্য স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। বাদামীর প্রস্তর ক্ষোদিত মন্দিরগুলিতে দ্রাবিড় শিল্পের আভাষ পাওয়া যায়। চালুক্য রাজগণের আমলে অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এলিফেন্টার গুহা মন্দিরগুলিও নির্মিত হইয়াছিল

রাষ্ট্রকূট-শিল্প

দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজবংশের ন্যায় রাষ্ট্রকূট-রাজগণও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপারে রাষ্ট্রকূট-রাজগণ পল্লব-শিল্প-রীতি অনুকরণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট-রাজ প্রথম কৃষ্ণের আমলে নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির রাষ্ট্রকূট-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মন্দিরে 'মহাবলিপুরম' মন্দিরের ভাস্কর্য-রীতি অনুকরণ করা হইয়াছিল। ইলোরার গুহা মন্দিরগুলিও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গুহা মন্দিরগুলির প্রাচীরে পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত রহিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীনত্ব

ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। উত্তর ভারতে ভারুতের উত্থানের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ ভারতের শিল্পীগণ ছিলেন ভারতের প্রাচীনতম ভাস্করদের অন্যতম। অমরাবতী ও বিশাখাপট্টমের আশেপাশে যে সকল মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ-ভস্কর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। অবশ্য এই সত্যতা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে নাই। মাদ্রাজ যাদুঘরে রক্ষিত যক্ষ মূর্তিটি উত্তর ভারতে আবিষ্কৃত যক্ষ ও যক্ষিনীর মূর্তি অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন। এইরূপ প্রাচীনমূর্তি ভারুতে পাওয়া যায় নাই। প্রথম খৃষ্টাব্দ হইতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে সকল অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলি দক্ষিণ

ভারতেই অবস্থিত। উত্তর ভারতে গান্ধারের গ্রীক ও বৌদ্ধ শিল্পকলা ছাড়া, দ্বিতীয় শতাব্দী ও চতুর্থ শতাব্দীর ইতিহাসের মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র নাই বলিলেই চলে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্থাপত্য শিল্পকলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণেও দক্ষিণ ভারত বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগ হইতেই এই শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই মূর্তিগুলি ভারতীয় শিল্পকলার অমূল্য সম্পদ।

দক্ষিণ ভারতের ধর্ম (Religion) : মৌর্য যুগের পূর্বে দক্ষিণ ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অগস্ত্য ঋষির দাক্ষিণাত্যে গমনের সময় হইতে এই অঞ্চলে আর্য-ধর্ম ও আর্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণ ভারত গমনের মধ্যেও এই অঞ্চলে আর্য-সভ্যতার বিস্তৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার নব-রূপায়ণ প্রচলিত দেখা যায়। অর্থাৎ সেই সময়ের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মের ও সংস্কৃতির এক আপূর্ব সমন্বয় ঘটে।

দক্ষিণ ভারতে আর্য ধর্মের বিস্তার

দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় ধর্মের উপর হিন্দুধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মই অধিক আঘাত হানিয়াছিল। অশোকের সময় দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয়ের ফলে দক্ষিণ ভারতে বৈদিক ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়। উত্তর ভারতের ধর্ম-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দক্ষিণ ভারতেও দেখা দিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সহিত পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মও প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং জৈন ও হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন রাজা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমঃ বিলুপ্তির ফলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। বৈদিক দেব-দেবীর উপাসনার পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতিগণ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ নৃপতি শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন এবং ইহার বিস্তারে তাঁহারা যত্নবানও ছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিস্তার

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অভ্যুদয়

সপ্তম শতাব্দী হইতে দক্ষিণ ভারতে ধর্ম-আন্দোলন শুরু হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে শৈব ও বৈষ্ণবগণ দারুণ আন্দোলন শুরু করেন। এই

ধর্মআন্দোলন দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্মের নবজাগরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু ধর্মের নবজাগরণে দাক্ষিণাত্যের ধর্মাচার্যদের দান অপরিসীম। দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা ছিল 'ভক্তি'। শিব ও বিষ্ণুর উপাসকগণ যথাক্রমে 'নায়নার' ও 'আলভার' নামে পরিচিত ছিলেন। শৈব ধর্মাচার্যগণের মধ্যে থপ্পর, সুন্দরমূর্তি ও মালিক্ক-ভাসগর-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কুলশেখর ও অন্দলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'আলভারগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। 'আলভারগণের রচিত স্তোত্রগুলি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। 'নায়নার' ও 'আলভার' ছাড়াও সেই যুগে বেদান্তবাদিগণও হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্মের নব-জাগরণে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, যমুনাচার্য ও মাধবাচার্যের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে শৈব ধর্ম প্রচারে শংকরাচার্যের দান সর্বাধিক। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে মালাবার প্রদেশে এক ব্রাহ্মণ নাম্বুদ্রি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্য বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং বৈদিক শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত বেদান্ত মতের প্রচার করেন। ইহার মূল কথা হইল ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠা করেন যথা মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ ও বদরিকাশ্রমের যোশী মঠ। শংকরাচার্য ও কুমারিল ভট্টের প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে এবং জৈন ধর্মের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। মাত্র বত্রিশ বৎশ বয়সে শংকরাচার্য দেহত্যাগ করেন।

দক্ষিণ ভারতে ধর্ম আন্দোলন ও হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ

শংকরাচার্য

কুমারিল ভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন।

কুমারিল ভট্ট

রামানুজ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের সর্বাধিক খ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্য। তিনি মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'শ্রী-সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। তাঁহার মতবাদ 'বিশিষ্ট্য-দৈতবাদ' নামে খ্যাত। তাঁহার ধর্মমতের প্রধান কথা হইল এই যে একমাত্র ভক্তির

রামানুজ

দ্বারই ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ক্ষেত্র স্থাপন করেন।

দক্ষিণ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান (Literature and Science) : উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও হিন্দু মনীষার উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে কাব্য, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজ-বংশগুলি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং নৃপতিগণের অনেকেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। সাতবাহনগণের রাজত্বকালে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথা' ও সাতবাহন-রাজ হাল-এর রচিত 'সপ্তশতক' গ্রন্থ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য ও রামানুজ ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং দর্শন শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক জ্যোতিষ ও গণিত গ্রন্থ-প্রণেতা ভাস্করাচার্য, 'কিরতার্জুনীয়' কাব্যের রচয়িতা ভারবি 'কাব্যদর্শন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা দণ্ডী, 'বিক্রমাংকদেব-চরিত' গ্রন্থের রচয়িতা বিহলন 'মিতাক্ষর' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি মণীষিগণের দান দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষ কর্তৃক রচিত 'রত্নমালিকা', পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ কর্তৃক রচিত 'মত্তবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থাদিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তদের রচিত স্তোত্র-সংগীতমালা ভারতের ভক্তিমূলক সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে তামিল ভাষায় তিরুবল্লুবর কর্তৃক রচিত 'কুরল' নামক গ্রন্থখানি এক অমূল্য সম্পদ। ইহা একটি ভক্তিমূলক গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন তামিল ভাষায় বহু সংগীত ও নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিও সেই যুগে রচিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যা (Orissa) :

প্রাচীনকালে উড়িষ্যার একাংশে কলিঙ্গ নামে এক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। মগধ সাম্রাজ্যের সন্নিকটে অপর একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব মৌর্য সাম্রাটদের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজ্য বিধ্বস্ত করিলেও কলিঙ্গের শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনিষ্ট করিতে পারেন নাই। অশোকের মৃত্যুর পর চেত বা চেদী বংশীয় খারবেল নামে এক পরাক্রান্ত রাজার পরিচালনাধীনে কলিঙ্গ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান ভুবনেশ্বরের তিন মাইল দূরে উদয়গিরি পাহাড়ে

চেতবংশ খারবেল

উৎকীর্ণ হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খারবেল ছিলেন চেত বংশের তৃতীয় নরপতি। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাগৃহ

খারবেল ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য তিনি উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পর্বতে কতকগুলি গুহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাগৃহগুলি ছিল একতল ও দ্বিতলবিশিষ্ট। গৃহগুলিতে বহু কক্ষ ও অঙ্গন রহিয়াছে। প্রায় প্রতিটি গৃহের খিলানগুলিতে বহু মূর্তি ও নক্‌সা রহিয়াছে।

চেতবংশের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব

চেত বংশের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যায় কোন পরাক্রমশালী রাজবংশের আবির্ভাব হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে গঙ্গ বংশের উত্থানের পূর্বে উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিত যথা, কর বংশ, ভঞ্জু বংশ, সোম বংশ ইত্যাদি। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভঞ্জু বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন রণভঞ্জু। তিনি নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এই বংশের পতন ঘটে। দশম শতাব্দীতে সোম বংশ উড়িষ্যার কতক অঞ্চলে রাজত্ব করেন। ইহার পর একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব গঙ্গ বংশ উড়িষ্যায় এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গ বংশের একটি শাখা মহীশূরে রাজত্ব করিতেন এবং ইহা পশ্চিম গঙ্গ বংশ নামে পরিচিত ছিল।

গঙ্গ বংশের উদ্ভব

অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ (১০৬৮-১১৪৭)

পূর্ব গঙ্গ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ। তাঁহার রাজ্য গঙ্গানদী হইতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি উৎকল জয় করিয়া 'উৎকলাধিপতি' উপাধি ধারণ করেন। তিনি বংলার পালরাজগণকেও পরাজিত করেন। অনন্তবর্মন ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজত্বকালে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরটি নির্মিত হয়।

নরসিংহ বর্মন

অনন্তবর্মনের পর তাঁহার পুত্র নরসিংহ বর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি মুসলমান আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত করিয়া উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

নরসিংহ বর্মণের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কপিলেন্দ্র নামে জনৈক সামন্ত গঙ্গ বংশের উচ্ছেদসাধন করেন এবং কপিলেন্দ্র

বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কপিলেন্দ্র দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া উড়িষ্যার রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার কররানী সুলতানগণ কর্তৃক উড়িষ্যার কিছু অংশ অধিকৃত হয়।

কপিলেন্দ্র বংশ

উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প : উড়িষ্যা মন্দিরের দেশ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টিকে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। উড়িষ্যার কর ও গঙ্গ বংশ কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরটি কর বংশীয় রাজাদের আমলে নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ভুবনেশ্বর নগরে প্রায় পাঁচশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের 'রাজরানী মন্দির', 'মুক্তেশ্বর মন্দির' ও 'পরমেশ্বর মন্দির'গুলি শিল্পকলার চরম নিদর্শন। 'রাজরানী' মন্দিরটি হরিদ্রাভ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। ইহার শিল্পবিন্যাস অপূর্ব।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি ভারতের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে তোরণ। প্রধান তোরণটি 'অরুণ স্তম্ভ' নামে খ্যাত। চতুর্দ্দশ-শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল।

রাজা নরসিংহ বর্মণ কর্তৃক কোনারকের সূর্য-মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার শিল্প নৈপুণ্য আজিও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ইহার নট মণ্ডপটি বিশাল ও কারুকার্যময়। সোপান শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহমূর্তি ও সূর্যদেবের অরুণ রথচক্রটি অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে। সূর্যদেবতা এই মন্দিরের বিগ্রহ।

প্রশ্নমালা

1. Write a Political history of the Chalukyas.
2. Write a Political history of the Rastrakutas.
3. Narrate the history of the Gurjara Pratiharas.
4. Give a short history of the Chola Kingdom and describe its administrative system.
5. Estimate the contribution of the Pallavas to the Political and Cultural life of Southern India.
6. Write an essay on the art and architecture of South India.
7. Review the career of Pulakesin II.

অষ্টম অধ্যায়

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

(Political History of Bengal)

নাম ও সীমা (Name and Boundary) ঃ হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের বিশিষ্ট কোন নাম ছিল না এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। আলেকজাণ্ডারের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক ও গ্রন্থাকারগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে গঙ্গরিডই নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লিনি এই গঙ্গরিডই জাতিকে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পেরিপ্লাস-অফ-দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থে, টলেমীর ভৌগলিক বিবরণীতে ও মিলন্দ পঞ্হো নামক গ্রন্থে বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলাদেশের সীমা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বর্তমান কালে বাংলা দেশ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা সেই যুগে অধিক বিস্তৃত ছিল। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমতলভূমি লইয়া প্রাচীন বাংলা দেশ গঠিত ছিল। বর্তমান কালের পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এবং দক্ষিণ বঙ্গে সমতট ও হরিকেল এবং পূর্ববঙ্গে বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল।* ইহা ছাড়া উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কতক অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল। বাংলার এই সকল বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। বিভিন্ন সময়ে ইহাদের সীমা ও বিস্তৃতি বিভিন্ন ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাচীন হিন্দুযুগে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি বাংলা দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।

'বাংলা' নামের উৎপত্তি

মুসলমান আমলেই সর্বপ্রথম এই সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত সমুদয় দেশ বা অংশ একত্রে 'বাংলা' অথবা 'বাঙ্গলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বাঙ্গলা হইতেই ইওরোপীয়গণ কর্তৃক অভিহিত 'বেঙ্গল' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মুঘল আমলের বিখ্যাত

আবুল ফজলের বর্ণনা

ঐতিহাসিক আবুল ফজল্-এর (Abul-Fazl) মতে চট্টগ্রাম হইতে গর্হি (রাজমহল) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের "প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে ইহার রাজারা ১০ গজ উচ্চ বিশ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'খাল' নির্মান করিতেন—কালক্রমে ইহা হইতেই 'বাঙ্গাল' এবং বাঙ্গালা

* রমেশচন্দ্র মজুমদার—'বাংলা দেশের ইতিহাস'।

নামের উৎপত্তি" হইয়াছে। ডক্টর মজুমদারের মতে আবুল ফজল-এর বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুমান সত্য নহে। ডক্টর মজুমদারের মতে "প্রাচীনকালে 'বঙ্গ' 'বঙ্গাল' নামের দুইটি পৃথক দেশ ছিল। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হইতে 'খাল' যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে ইহা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের নামকরণ হইয়াছে বাংলা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" প্রাচীনকালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডক্টর মজুমদারের মত

বাংলার প্রাচীন জনপদঃ প্রাচীনকালে বাংলাদেশের জনপদগুলির মধ্যে গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র এবং বঙ্গাল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌড় (Gauda) ঃ গৌড় দেশটি সে যুগে সর্বাধিক সুপরিচিত হইলেও ইহার অবস্থিতি নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা কঠিন। পাণিনির গ্রন্থে ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' গৌড়পুর ও গৌড়িক সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎসায়নের 'কামসূত্র' নামক গ্রন্থেও গৌড়ের সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত আছে। হর্ষবর্ধনের অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে মৌখারী রাজ ঈশানবর্মন গৌড়বাসীকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় গৌড়দেশ সমুদ্র উপকুল হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষের অনুশাসন লিপিতে মুর্শিদাবাদের একটি অঞ্চল গৌড়-বিষয় (জেলা) নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ এই বিষয়টির নাম হইতেই গৌড়দেশের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বরাহমিহির (ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক রচিত 'বৃহৎ সংহিতা' নামক গ্রন্থে গৌড় দেশকে পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাজা শশাঙ্কের সময় হইতেই গৌড় নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তুর্কী ও আফগানদের আমলে মালদহ জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে পরিচিত ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত জৈন গ্রন্থাদিতে গৌড় লক্ষ্মণাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎসায়ণের বর্ণনা অনুসারে দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত গৌড় রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হিন্দু যুগের শেষে গৌড় ও বঙ্গ প্রধানত এই দুই ভাগে সমগ্র বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে বর্তমান ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত চম্পা নগরী ছিল গৌড় রাজ্যের রাজধানী।

বঙ্গ (Vanga) ঃ বাতাপীর চালুক্য রাজগণের দলিল পত্রে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জনপদটি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। ইহার পশ্চিম সীমা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত কাসাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাল ও সেন বংশীয় রাজগণের আমলে বঙ্গের আয়তন সংকুচিত হইয়া পড়ে। এই

যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই বঙ্গ জনপদটি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। হেমচন্দ্র রচিত 'অভিধান চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব উপকূল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে পাল রাজগণের আমলে বঙ্গ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় যথা, উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ। কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের দানপত্রে দক্ষিণ বঙ্গের উল্লেখ আছে।

সমতট (Samatata): এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতট জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগে ইহার নির্দিষ্ট আয়তন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থে (ষষ্ঠ শতাব্দী) বঙ্গ হইতে ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিউয়েন-সাং ইহাকে নিম্নদেশ ও কামরূপের দক্ষিণে বিস্তৃত রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে সমতটের রাজধানী ছিল বড় কামড়া (ত্রিপুরা জেলা)।

হরিকেল (Harikela): সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকারগণ হরিকেল নামে অপর এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎ-সিং-এর (It-Sing) বর্ণনা অনুসারে হরিকেল ছিল ভারতের পূর্ব-সীমান্ত দেশ। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে হরিকেল, বঙ্গ ও সমতট প্রভৃতি জনপদগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত আছে। অবশ্য সকল যুগে হরিকেল বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল এইরূপ অনুমান করা যায় না।

পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী (Pundra and Varendri): পুণ্ড্র নামে এক প্রাচীন জাতির উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থে ও মহাকাব্যে পাওয়া যায়। ইহারা উত্তর বঙ্গের অধিবাসী ছিল বলিয়া এই অঞ্চল পণ্ড্র বর্ধন নামে খ্যাত ছিল। মহাভারতের 'দ্বিগ্বিজয় পর্বে উল্লিখিত আছে যে গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে পুণ্ড্রগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম কোন না কোন সময়ে পুণ্ড্র বর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল প্রসিদ্ধ নগরী পুণ্ড্র বর্ধন।

বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তৃক রচিত রামচরিত-কাব্যে ইহাকে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'তবকাতে-নাসিরী' নামক গ্রন্থে ইহা গঙ্গানদীর পূর্বভাগে অবস্থিত লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বগুড়া, রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ লইয়া বরেন্দ্র মণ্ডল গঠিত ছিল।

রাঢ়: ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত রাঢ়দেশ উত্তর-রাঢ় এবং দক্ষিণ-রাঢ় এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অজয় নদী ছিল এই দুই ভাগের সীমারেখা। শ্রীধরাচার্য্যের 'ন্যায়কাণ্ডালি' নামক গ্রন্থে দক্ষিণ-রাঢ় দেশের উল্লেখ আছে। বর্তমান হাওড়া, হুগলী, ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশ লইয়া দক্ষিণ-রাঢ়দেশ গঠিত ছিল। রাঢ়দেশের উত্তরাঞ্চল উত্তর-রাঢ় নামে পরিচিত

ছিল। ইহা বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাণ্ডি রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাম্রলিপ্ত (Tamralipta) ঃ মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্দেশে ইহা অবস্থিত। টলেমীর ভৌগলিক বিবরণীতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে।

বাংলার প্রাচীন নগরসমূহ (Ancient Cities of Bengal) ঃ সমকালীন যুগের শিলালিপি ও গ্রন্থাদিতে প্রাচীন বাংলার নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির গ্রন্থে গণ্ডপুর নামক নগরীর উল্লেখ আছে। অবশ্য এই নগরীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। অপরাপর নগরগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত নগরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) **পুণ্ড্র নগর** ঃ বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানগড়।

(২) **তাম্রলিপ্ত** ঃ প্রাচীন বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। মহাকাব্য ও টলেমীর গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত নগর ও বন্দরের উল্লেখ আছে। এই বন্দর হইতে সমুদ্রপথে সিংহল, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত।

(৩) **সিংহপুর** ঃ (আধুনিক-সিংগুড়)। ইহা হুগলি জেলায় অবস্থিত ছিল।

(৪) **পুষ্কর্ণ** ঃ ইহা দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল।

(৫) **কোটিবর্ষ** ঃ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে এই নগরটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

(৬) **পাহাড়পুর** ঃ ইহা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত ছিল। পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের আমলে ইহা সোমপুর নামে পরিচিত ছিল।

(৭) **কর্ণসুবর্ণ** ঃ ইহা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি নগরগুলির ন্যায় কর্ণসুবর্ণও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা ছিল শশাঙ্কের রাজধানী।

(৮) **বিক্রমপুর** ঃ ইহা বর্তমান ঢাকা জেলায় অবস্থিত ছিল। সেন-বংশীয় রাজগণের আমলে বিক্রমপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি* (Origin of the Bengali Race) ঃ

প্রাচীন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগে বাংলার অধিবাসী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম মানব সভ্যতার যেরূপ বিবর্তন ঘটিয়াছিল, বাংলা দেশেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য-প্রস্তর যুগের এবং তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল যুগে বাংলার পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলেই মানুষ বসবাস করিত এবং ক্রমে উহারা অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

* রমেশচন্দ্র মজুমদার—'বাংলা দেশের ইতিহাস'।

বৈদিক যুগে বাংলার অধিবাসী

বৈদিক যুগে আর্যদের সহিত বাংলাবাসীর কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নরনারীকে অনার্য ও অসভ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্যজাতির বংশসম্ভূত নহেন।

আর্যদের পূর্বে বাংলার অধিবাসী

আর্যগণের আগমনের পূর্বে বাংলা দেশে বিভিন্ন জাতি বসবাস করিত—যথা, কোল, শবর, পুলিন্দ, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি। বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যত্রও এই জাতীয় লোকের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল জাতিকে 'অষ্ট্রিক' মানব গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'নিষাদ-জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন। নিষাদ জাতির পর যে সকল জাতি বাংলা দেশে বসবাস স্থাপন করেন—তাঁহাদের বংশধরেরাই বর্তমান কালের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি বর্ণভুক্ত হিন্দুদের পূর্বপুরুষ। অনেকের মতে মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রনে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই মত সর্বজন স্বীকৃত হয় নাই।

দ্রাবিড় ও আলপাইন জাতির সংমিশ্রনে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব

মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর দিক দিয়া বিচার করিলে বাঙ্গালীকে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি বলা যায়। নিষাদ জাতির পরে দ্রাবিড় ভাষাভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভূক্ত অপর এক জাতির সংমিশ্রণে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হয়। পরবর্তী-কালে আর্যদের সহিত বাঙ্গালী জাতির ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ ঘটে। ইহার ফলে প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু ধারণা করা যায় না।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় হইতে গুপ্ত-যুগ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস (From Alexander's Invasion to the Gupta Period):

মহাবংশে বাংলার উল্লেখ

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় বাংলাদেশ:—গুপ্তযুগেয় পূর্বে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। সিংহলদেশীয় 'মহাবংশ' নামক পালি গ্রন্থে লঙ্কাদ্বীপে বাঙ্গালী রাজবংশের পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিবার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

মহাভারতের যুগে বাংলা

মহাভারতে বাংলা দেশের কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ভারতের অন্যান্য রাজগণের সহিত বঙ্গরাজ প্রতাপবাণ চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্রাজ বাসুদেব ও তাম্রলিপ্তির রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মহাভারতে কর্ণের কলিঙ্গ, অঙ্গ, পুণ্ড্র, ও বঙ্গদেশ অভিযানের উল্লেখও পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং

ভারতের অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বাংলার নৃপতিগণের সামরিক প্রতিভার খ্যাতি বাংলার বাহিরে সুবিদিত ছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে (খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ) বাংলাদেশে একটি পরাক্রান্ত রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণ গঙ্গরিডই (Gangaridai) অথবা গণ্ডরিডাই (Gandaridai) নামে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতি যে বাংলাদেশের অধিবাসী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রাজ্যের যথার্থ অবস্থিতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে সমসাময়িক গ্রীক গ্রন্থকারগণ বিভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন। কেহ কেহ গঙ্গানদীকে এই রাজ্যের পূর্ব-সীমা এবং কেহ কেহ ইহার পশ্চিমসীমা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গঙ্গরিডই জাতি সম্পর্কে ডিওডোরাস নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন "ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গরিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তি আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।"*

গঙ্গরিডই রাজ্য

গ্রীক গ্রন্থাকারগণ গঙ্গরিডই ছাড়াও প্রাসিয়য় (Praisioi) নামে অপর এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাসিয়য়দের রাজধানীর নাম ছিল পালিবোথরা (পাটলিপুত্র)। গঙ্গরিডই ও প্রাসিয়য় এই দুই রাজ্যের মধ্যে যথার্থ সীমারেখা জানা যায় না। টলেমির বর্ণনা অনুসারে প্রাসিয়য় রাজ্য গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাম্রলিপ্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ প্রাসিয়য়গণ গঙ্গরিডই দেশের পশ্চিমে বাস করিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমনের সময় এই দুই জাতির পরাজয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কার্টিয়াস (Curtius) এই দুইটিকে পৃথক জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডিওডোরাস গঙ্গরিডই ও প্রাসিয়য়গণকে একটি অভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্লুটার্ক (Plutarch) এক স্থলে এই দুই জাতিকে গঙ্গরিডই রাজার অধীন এবং অন্যস্থলে ইহাদের দুই পৃথক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন যে গঙ্গরিডই ও প্রাসিয়য়-রাজগণ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া আলেকজাণ্ডারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাহা হউক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে গঙ্গরিডই ও প্রাসিয়য় এই দুই জাতি একই রাজবংশের নেতৃত্বে অথবা উভয়ে দুই পৃথক রাজবংশের নেতৃত্বে যুগ্মভাবে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রীক লেখকগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া ইহাও অনুমান

প্রাসিয়য় রাজ্য

গঙ্গরিডই ও প্রাসিয়য় রাজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি

* রমেশচন্দ্র মজুমদার—"বাংলাদেশের ইতিহাস।"

করা যাইতে পারে যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা।

আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে সংবাদ পাইলেন যে গঙ্গরিডই ও প্রাসিয়য় রাজ্যের রাজা অথবা রাজগণ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া তাঁহাকে বাধাপ্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সংবাদে গ্রীক সৈন্যগণ ভীত হইয়া আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিল না। অগত্যা আলেকজাণ্ডারকে বিপাশা নদীর তীর হইতে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ইহা সত্য যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় পাটলিপুত্রে নন্দবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। নন্দরাজ বাঙ্গালী ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। "কিন্তু এই সময় যে বাংলার রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন, প্রাচীন গ্রীকলেখকগণের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।"*

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ ঃ আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। গ্রীক ও বৌদ্ধগ্রন্থ-কারগণের বর্ণনা অনুসারে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও উত্তর বঙ্গে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপি হইতে জানা যায় যে মৌর্য যুগে পুণ্ড্রনগর নামক নগরী সমৃদ্ধ ছিল এবং ইহার শাসনব্যবস্থা উন্নত ছিল। মৌর্যবংশের পর শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর সমৃদ্ধি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। টলেমি ও পেরিপ্লাসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার রাজধানী ছিল গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত গঞ্জ।

মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষান যুগ

কুষাণ রাজগণের মুদ্রা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা হইতে মনে হয় না যে বাংলার কোন অংশ কুষাণ-সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত-সাম্রাজ্য বাংলাদেশ হইতে কাথিয়াবাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ ছিলেন শ্রীগুপ্ত। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎ-সিং-এর বর্ণনা অনুসারে এবং একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে শ্রীগুপ্ত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে কিংবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বরেন্দ্রভূমি অথবা উহার নিকটবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় বাংলাদেশের এক অংশ আদি গুপ্ত-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনেকের মতে গুপ্তরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু ইহার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্তের আমলের অনুশাসনলিপি

গুপ্ত-যুগে বাংলা

* "বাংলা দেশের ইতিহাস।"

হইতে জানা যায় যে, সে সময় বাংলাদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল— যথা, পুষ্করণ (বাঁকুড়া)। ইহার অধিপতি ছিলেন চন্দ্রবর্মা এবং রাজধানী পোখর্ণা। চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা দখল করিয়াছিলেন। গুপ্ত আমলে পূর্ববঙ্গে সমতট নামে অপর একটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গ গুপ্তশাসনভুক্ত ছিল এবং ইহা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতট গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভুত্ব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না।

গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশ ঃ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও হূণজাতির ক্রমাগত আক্রমণের ফলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িলে বাংলার নৃপতিগণ পুনরায় স্বাধীন হইয়া উঠেন। পুণ্ড্রবর্ধনের গুপ্তশাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সমতটের রাজা বৈন্যগুপ্ত মহারাজাধিরাজা উপাধি ধারণ করেন। এই সময় যশোধর্মণ নামে জনৈক দুর্ধর্ষ বীর উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তিনি বাংলাদেশও জয় করিয়াছিলেন। হূণ আক্রমণ ও যশোধর্মণের রাজ্য বিস্তারের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। সেই সুযোগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশও গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময় (ষষ্ঠ শতাব্দী) বাংলাদেশে দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয় যথা, বঙ্গ ও গৌড়।

(১) **স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ঃ** কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি তাম্রশাসনে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের এবং ইহার তিনজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় যথা, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সমগ্র দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অংশ এই বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লিখিত তিনজন রাজার মধ্যে গোপচন্দ্রই ছিলেন সর্বপ্রাচীন। ইহারা খৃষ্টীয় ৫২৫ হইতে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তিনজন রাজা একই বংশসম্ভূত ছিলেন কিনা এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ইহাদের রাজত্বকালে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য সমৃদ্ধশালী ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণের আক্রমণের ফলে বঙ্গরাজ্য হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং অবশেষে স্বাধীন গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয়ের ফলে ইহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল।

গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব (৫২৫-৫৭৫)

(২) **স্বাধীন গৌড়রাজ্য ঃ** গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 'গুপ্ত' উপাধিধারী রাজগণ উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই সময় বাংলাদেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মৌখারী রাজবংশ উত্তর ভারতে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে মৌখারীরাজ ঈশানবর্মণ গৌড়বাসীকে পরাজিত করিয়া উহাদিগকে সমুদ্র তীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সে সময় মৌখারী ও পরবর্তী গুপ্তরাজগণের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল এবং মৌখারী রাজগণ বারংবার বাংলাদেশে আক্রমণ চালাইতেছিলেন। মৌখারী ও গুপ্ত সঘর্ষ এবং দাক্ষিণাত্য হইতে চালুক্য-রাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলার গুপ্তবংশীয় রাজগণ দুবল হইয়া পড়েন এবং সেই সুযোগে গৌড়দেশে শশাঙ্ক নামে জনৈক সামন্ত এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্ক (Sasanka):

"বাঙ্গালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি"। তাঁহার প্রথম জীবন সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তাঁহার বংশ পরিচয়ও অজ্ঞাত। অনেকের মতে শশাঙ্কের অপর নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি ছিলেন গুপ্তবংশসম্ভূত। কিন্তু এই মত ঐতিহাসিক মহলে স্বীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ তিনি মগধ ও গৌড়ের অধিপতি মহাসেন গুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন।

বংশ পরিচয় অজ্ঞাত

উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের গুপ্ত বংশীয় রাজগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ। এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াই শশাঙ্ক রাজ্য-বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী হইতে শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল মৌখারীগণের আক্রমণ হইতে স্বীয় রাজ্যের নিরাপত্তার বিধান করা। প্রথমে তিনি বাংলাদেশ ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদ রাজ্য (গঞ্জাম জেলা) জয় করিলেন। পশ্চিমে তিনি মগধ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন। দক্ষিণে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিল। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে শশাঙ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। "শশাঙ্কের পূর্বে আর কোনও বাঙ্গালী রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই" (মজুমদার)।

শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার

শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার

সমগ্র বাংলাদেশে এবং বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া শশাঙ্ক অতঃপর মৌখারীগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন।

মৌখারীরাজ গ্রহবর্মণ থানেশ্বর-রাজ প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৌখারী ও থানেশ্বরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের পক্ষে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ পুষ্যভূতি রাজবংশের সহিত মালব রাজবংশের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। শশাঙ্ক সেই সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। এদিকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণও শশাঙ্কের আক্রমণাত্মক মনোভাবে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে ভাস্কর-বর্মণ মৌখারী-থানেশ্বর-মৈত্রীজোটে (Maukhari-Thaneswar-Alliance) যোগদান করিলেন।

মৌখারী-থানেশ্বর মৈত্রী

এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধের যথার্থ কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। শশাঙ্ক প্রথমে বারাণসী অধিকার করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে দেবগুপ্তও মালব হইতে সসৈন্যে কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মালবরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার মহিষী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই সংবাদ থানেশ্বরে পৌছিলে থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বহু সৈন্য বন্দী করিলেন। কিন্তু কনৌজে কারারুদ্ধা রাজ্যশ্রীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই তিনি শশাঙ্কের হস্তে নিহত হইলেন।

কনৌজের বিরুদ্ধে শশাঙ্কের যুদ্ধ যাত্রা

শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যার কথা তিনটি সূত্র হইতে জানা যায়। যথা, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী এবং হর্ষবর্ধনের শিলালিপি। বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাং উভয়ের মতেই শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন যদিও উভয়ের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 'হর্ষচরিত অনুসারে "মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত হইয়া রাজ্যবর্ধন একাকী নিরস্ত্রভাবে শত্রুভবনে গমন করিলে শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন।" হিউয়েন-সাং-এর বিবৃতি অনুসারে "রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীগণের দোষেই রাজ্যবর্ধন শত্রুহস্তে নিহত হন"। হর্ষবর্ধনের শিলালিপি অনুসারে "সত্যানুরোধে রাজ্যবর্ধন শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন" (মজুমদার)। এই তিনটি সম-সাময়িক বিবরণীতে কোথাও শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার কোন ইঙ্গিত নাই।*

রাজ্যবর্ধনের হত্যার তিনটি বিবরণ

* "তিনটি সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিরোধিতা দেখিলে স্বতঃই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাং উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী এবং তাঁহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি ও অলীক কাহিনীতে এই বিদ্বেষভাব প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র এই দুইজনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন এই মত গ্রহণ করা সমীচীন নহে" (মজুমদার)।

সম্ভবতঃ শশাঙ্ক স্বীয় মিত্র দেবগুপ্তের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই রাজ্যবর্ধনের হস্তে দেবগুপ্তের মৃত্যু হয়। অতঃপর শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজ্যবর্ধন সাফল্যের সহিত শশাঙ্ককে বাধাপ্রদান করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের হস্তে পরাজয়ের পূর্বেই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল। শশাঙ্ক কর্তৃক তিনি নিহত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ নাই।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা

শশাঙ্কের সহিত তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। একমাত্র 'আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভতঃ শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তিনি কনৌজ পরিত্যাগ করেন।

গঞ্জামের একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে শশাঙ্ক ৬১৯ অথবা ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মৃতুকাল পর্যন্ত তিনি গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন।

শশাঙ্কের ধর্ম

শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। হিউয়েন-সাং তাঁহাকে পরম বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। কারণ হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধগণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

পাল-সাম্রাজ্য (The Pala Empire) :

উৎপত্তি (Origin) : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা, অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর ক্রমাগত আক্রমণ চলিতে থাকে। বাংলার ইতিহাসে এই যুগকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হইয়া থাকে। ইহার ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। শশাঙ্ক উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার দুই অঞ্চল পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় ঘোর অরাজকতা ও রাজনৈতিক অনৈক্য

হিউয়েন-সাং-এর বর্ণনা

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন-সাং বাংলা পরিভ্রমণকালে চারিটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল), সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ) ও তাম্রলিপ্ত (তমলুক)। কোন সার্বভৌম রাজশক্তি না থাকায় এই সকল রাজ্যের

মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া বৈদেশিক রাজন্যবর্গ বাংলাদেশ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিতে থাকেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মণ কর্ণসুবর্ণ দখল করেন। ভাস্করবর্মণের পর কনৌজের রাজা যশোবর্মণ বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন। কথিত আছে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যও বাংলাদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বাংলার অরাজকতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথ বলেন যে সেই সময় বাংলাদেশে রাজা না থাকায় প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সামন্ত, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। "এই চরম দুঃখ দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাঙ্গালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে"।*

বাংলায় বৈদেশিক আক্রমণ

তারানাথের বর্ণনা

বাংলার এই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অবসানের জন্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার প্রবীণ নেতাগণ পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া নিজেদের মধ্য হইতে গোপাল নামে এক জনপ্রিয় সামন্তকে রাজপদে নির্বাচিত করেন। এইভাবে বাংলাদেশে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

রাজপদে গোপালের নির্বাচন

পাল-রাজগণের আদি নিবাস বা বর্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাঁহাদের পরবর্তীকালের শিলালিপিতে তাঁহারা নিজেদেরকে সূর্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আবুল-ফজল, পালরাজগণকে কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তারানাথের মতে বর্ণ হিসাবে পালরাজগণ ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং রাষ্ট্রকূট ও কলচুরি বংশের সহিত উহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ—এই মতের সমর্থন করে। সম্ভবতঃ পালরাজগণ মগধে রাজত্ব করিতেন। কারণ এই বংশের প্রথম আট জন রাজার শিলালিপি মগধে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে পাল রাজগণের আদি নিবাস ছিল বরেন্দ্রভূমি।

আদিনিবাস বরেন্দ্রভূমি

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাল রাজগণের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু 'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ' ছিলেন। গোপালের পিতার নাম ছিল বপ্যট এবং তিনি সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং গোপাল সম্ভবতঃ কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পিতার ন্যায় গোপালও ছিলেন যুদ্ধব্যবসায়ী এবং

গোপাল (৭৫০-৭৭০)

* মজুমদার—'বাংলাদেশের ইতিহাস'।

প্রবীণ ও সুনিপুণ যোদ্ধা বলিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গোপালের রাজত্বকাল ও রাজ্যবিস্তৃতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ নিজ শাসনাধীনে আনিয়া বাংলায় রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

ধর্মপাল, ৭৭০-৮১০ (Dharma Pala): গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্ম পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সুনিপুন যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ক্ষুদ্র পাল-রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমগ্র আর্যাবর্তে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। সেই সময় উত্তর ভারতের প্রভুত্ব লইয়া প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। ধর্মপালও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সমসাময়িক প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট-রাজ ছিলেন যথাক্রমে বৎস-রাজ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ।

সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপনের কল্পনা

ধর্মপাল সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে প্রতিহার-রাজ বৎস-রাজ তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ অনতিকাল মধ্যেই বৎস-রাজ রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইয়া রাজপুতানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। এদিকে ধ্রুব বৎস-রাজকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি ধর্মপালের বিরুদ্ধেও অগ্রসর হইলেন। ধর্মপাল ইতিমধ্যে মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করিয়া আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইলে ধ্রুবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। কিন্তু ধ্রুব বাংলার দিকে অগ্রসর না হইয়া দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং ধর্মপাল নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া স্বমনোনীত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কথিত আছে, চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, অবন্তি, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে ধর্মপালের প্রাধান্য উক্ত রাজন্যবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। মালদহের সন্নিকটে খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্র-শাসনে কনৌজে অনুষ্ঠিত রাজসভার ঘটনা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে, "তিনি (ধর্মপাল) মনোহর ভ্রূভঙ্গি বিকাশে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি-

সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট-গণের সহিত সংঘর্ষ

কনৌজের রাজসভা

পরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চাল বৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণ কলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।" (মজুমদার) *

দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধাভিযান

কনৌজ অধিকর করার পর ধর্মপাল সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হন। বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়াও তিনি দক্ষিণ ভারতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রতিহার রাজ নাগভট্টের সহিত যুদ্ধ ও ধর্মপালের পরাজয়

কিন্তু ধর্মপাল নিশ্চিন্তে অধিকদিন সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পরেন নাই। নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গের রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া কনৌজ আক্রমণ করিলেন। তিনি চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। ইহার পর নাগভট্ট বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া মুঙ্গেরের নিকট ধর্মপালকে পরাস্ত করিলেন। পাল সাম্রাজ্য যখন এইরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন সেই সময় রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। ফলে নাগভট্টকে স্বরাজ্য রক্ষা করার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল। পাল সাম্রাজ্যও বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। রাষ্ট্রকূট রাজগণের প্রশস্তি অনুসারে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়ে স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলে উত্তর ভারতে ধর্মপালের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বি রহিল না। তিনি উত্তর ভারতে স্বীয় প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্মপাল কর্তৃক রাষ্ট্রকূট রাজ্যের আনুগত্য স্বীকার

ধর্মপালের রজত্বের গুরুত্ব

বাংলা দেশের ইতিহাসে ধর্মপালের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজ বাহুবলে বাংলা দেশে শুধু যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন এমন নহে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সমগ্র আর্যাবর্তে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বাংলার মর্যাদা অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। "ধর্মপালের রাজ্য বাঙ্গালীর জীবন প্রভাত।" সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার রাজত্বকাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মপালের ধর্মানুরাগ

পিতার ন্যায় ধর্মপালও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে মগধের বৌদ্ধ মঠটি (ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম ছিল বিক্রমশীল) 'বিক্রমশীল-বিহার' নামে অভিহিত হয়। ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও তিনি

হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি শাস্ত্রানুশাসন অনুসারে রাজ্য-শাসন করিতে সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। গর্গ নামে জনৈক হিন্দু ছিলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী।

দেবপাল, ৮১০-৮৫০ খৃঃ (Deva Pala): ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ছিলেন পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তাঁহার সেনাপতি (বাক্ পালের পুত্র জয় পাল) ও মন্ত্রী-গণের (দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্র) বংশধরদের লিপিতে দেবপালের রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবপালের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার প্রভুত্ব দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ও পশ্চিমে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্রের লিপিতে উল্লিখিত আছে যে দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপরোক্ত লিপিগুলি হইতে মনে হয় যে দেবপাল ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর।

রাজ্য জয়

দেবপাল সর্বপ্রথম উড়িষ্যা ও আসামের দিকে অগ্রসর হইয়া এই দুই সীমান্ত রাজ্য জয় করিলেন। আসামের রাজা বিনা যুদ্ধেই পাল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আসাম পাল সাম্রাজ্যের একটি করদ রাজ্যে পরিণত হইল কিন্তু উড়িষ্যা পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

গুরব মিশ্রের লিপি অনুসারে দেবপাল হূণ জাতির গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দেবপাল হিমালয়ের নিকটে অবস্থিত হূণ রাজ্যটি জয় করিয়া কম্বোজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ইহার পর দেবপাল প্রতিহারগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রতিহার রাজ ভোজ দেবপালের নিকট পরাজিত হন।

দেবপালের সাম্রাজ্যের সীমা

এই ভাবে কামরূপ, উৎকল, হূণদেশ ও কম্বোজ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া দেবপাল উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এক কথায় প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত দেবপালের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ভারতের বাহিরেও দেব-পালের খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজ বালপুত্র দেব তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবপাল নিজেও নালন্দা বিহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। আরব পর্যটক সুলেমানের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে দেবপালের সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহারগণ অপেক্ষা অধিক সুদক্ষ ও শক্তিশালী ছিল।

পাল সাম্রাজ্যের পতন (Fall of the Pala Empire): দেব-পালের মৃত্যুর পর হইতে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁহার পরবর্তী নৃপতিদ্বয় যথাক্রমে বিগ্রহ পাল ও নারায়ণ পাল কোনরূপ সামরিক কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। ধর্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা বিগ্রহ পাল ও নারায়ণ পালের রাজত্বকালে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। বিগ্রহ পাল ছিলেন শান্তিপ্রিয়। সিংহাসন আরোহণের অল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বীয়পুত্র নারায়ণ পালের হস্তে রাজ্যভার অর্পন করিয়া সংসার ত্যাগী হন। নারায়ণ পাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন বটে কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজ্য-বিস্তার করা অপেক্ষা তিনি যাগ-যজ্ঞাদি ও পূজা-পার্বণে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ শুরু হয়।

বিগ্রহপাল (৮৫০-৮৫৪)
নারায়ণ পাল (৮৫৪-৯০৮)

রাষ্ট্রকূট রাজগণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের অধিপতির নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ আদায় করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজের নিকট পরাজয়ের ফলে পাল রাজগণের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বহুলাংশে ম্লান হইয়াছিল। এই সুযোগে উড়িষ্যার রাজা রণস্তম্ভ রাঢ় দেশের কিছু অংশ দখল করিয়া লন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রকূট-গণের আক্রমণ

পালরাজ যখন রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত সেই সুযোগে প্রতিহার রাজ ভোজ পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। নারায়ণ পালের পক্ষে ভোজের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হইল না। তিনি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন। ইহার ফলে পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িল এবং উত্তর ভারতে প্রতিহার রাজবংশ পুনরায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। প্রতিহার রাজ ভোজের পর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল পুনরায় পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিহার দখল করিলেন। সেই সঙ্গে প্রতিহার রাজের মিত্র কলচুরি রাজ কোক্কল্লও বঙ্গ আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেন। এইভাবে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। নারায়ণ পালের দুর্বলতা ও অক্ষমতা ছাড়াও পাল সাম্রাজ্যের এই শোচনীয় পরিণামের অপর কারণ ছিল পাল রাজবংশের গৃহ বিবাদ এবং উৎকল ও কামরূপ নৃপতিগণের স্বাধীনতা ঘোষণা।

বাংলাদেশে প্রতিহার-গণের আক্রমণ

নারায়ণ পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল ও পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় পালরাজগণ অনেকটা নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু

রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০); দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০-৯৬০)

শীঘ্রই রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারগণের স্থানে নূতন শত্রুর আবির্ভাব হইল। এই সময় বুন্দেলখণ্ডে চন্দেলগণ প্রবল হইয়া উঠেন। চন্দেলরাজ যশোবর্মণ আর্যাবর্তে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনকল্পে যুদ্ধাভিযানে বাহির হইয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। দুর্বল পাল রাজগণের পক্ষে যশোবর্মণের গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই এবং তাঁহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। চন্দেলগণের ন্যায় কলচুরিগণও বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া উহার কিছু অঞ্চল দখল করেন। এইরূপ ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংহতি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বাংলার বিভিন্ন অংশে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয় যথা—পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে (বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশ) চন্দ্রবংশীয়রাজ্য, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে (রাঢ় ও বরেন্দ্র দেশ) কাম্বোজ বংশীয় রাজ্য এবং অঙ্গ ও মগধে (বিহার) পালবংশীয় রাজ্য।

বাংলাদেশে চন্দেল ও কলচুরিগণের আক্রমণ

পাল-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও বহু খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব

দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য (The Second Pala Empire) :

মহীপাল, ৯৮৮–১০৩৮ খৃঃ : পাল সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দিনে দ্বিতীয় বিগ্রপালের (৯৬০-৯৮৮ খৃঃ) পুত্র মহীপাল পাল-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আংশিকভাবে পাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। সিংহাসনে আরোহণের অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গ পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশ পুনরুদ্ধার করিবার পূর্বেই তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত চোল রাজ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইল। সে সময় চোলবংশ ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজবংশ। চোল-বাহিনী দক্ষিণ-রাঢ় ও বঙ্গাল রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া মহীপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। মহীপাল ভীত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলে চোলবাহিনী পালরাজের বহু সৈন্য ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। চোল প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে যে "চোল-সেনাপতি বাংলার পরাজিত রাজন্যবর্গকে মস্তকে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।" যাহা হউক চোল অভিযানের ফলে বাংলার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কারণ বাংলার কোথাও চোলরাজ্যের প্রতিষ্ঠার বা আধিপত্যের কোন উল্লেখ চোল প্রশস্তিতে পাওয়া যায় না।

পাল-সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার

চোল বাহিনী স্বদেশে ফিরিয়া গেলে মহীপাল পুনরায় রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তিনি বিহারের দিকে যুদ্ধাভিযান চালাইয়া মিথিলা (উত্তর বিহার) স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত ১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে বারাণসীও মহীপালের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব বাংলা আক্রমণ করিয়া মহীপালকে পরাজিত করেন এবং বারাণসী দখল করেন।

মহীপালের রাজত্বকালে গজনীর স্থলতানগণ ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতীয় রাজ্য এবং প্রসিদ্ধ মন্দির ও নগরগুলি ধ্বংস করিতেছিল। মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আর্যাবর্তের নৃপতিগণ সম্মিলিত হইয়াও উহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। আর্যাবর্তের এই দুর্দিনে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে মহীপাল কোনরূপ সাহায্য পাঠাইতে পারেন নাই এবং এই কারণে কোন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক মহীপালের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে এবং চোল ও কলচুরীগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতেই সর্বদা বিব্রত ছিলেন। ফলে তাঁহার পক্ষে সুদূর উত্তর ভারতে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না।

মহীপালের কৃতিত্ব

বাংলাদেশের ইতিহাসে মহীপালের কৃতিত্ব কম নহে। তিনি পাল-সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তাহা বারাণসী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি চোল ও কলচুরীগণের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত আক্রমণকারীদের গতিরোধ করিয়া পাল-সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহীপাল যে শুধু সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এমন নহে, তিনি সংস্কৃতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সারনাথ লিপিতে উল্লিখিত আছে যে তিনি বহু প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ গয়ায় দুইটি বৌদ্ধ মঠ ও কাশীধামে কয়েকটি হিন্দু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ডক্টর মজুমদারের কথায় "মোটের উপর মহীপালের রাজ্যে বাংলার সকল দিকেই এক নূতন জাতীয় জাগরণের আভাষ পাওয়া যায়।"

দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের পতন
(Fall Of the Second Pala Empire)

নয়পালের রাজত্বকাল (১০৩৮-১০৫৫)

মহীপালের মৃত্যুর পর পুনরায় পাল-সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁহার পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে কলচুরীরাজ কর্ণ (গাঙ্গেয়-দেবের পুত্র) বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর নয়পাল পরাজিত হন। কর্ণ বহু বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস ও বহু নগর লুণ্ঠন করেন। কথিত আছে খ্যাতনামা বৌদ্ধ আচার্য অতীশ (দীপঙ্কর) এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া উভয় পক্ষে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু এই শান্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

কলচুরী আক্রমণ

তৃতীয় বিগ্রহ পাল (১০৫৫-১০৭২)

নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রপালের রাজত্বকালে কলচুরী-রাজ কর্ণ পুনরায় পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং

পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ দখল করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিগ্রহপাল কর্ণকে পরাজিত করেন এবং কর্ণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। ইহার পর উভয় রাজবংশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়।

পুনরায় কলচুরী আক্রমণঃ উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

কলচুরীগণের সহিত সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে পাল-সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িল এবং সেই সুযোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল, যথা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ কর্তৃক ঢেক্করীতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন; বর্মণগণ কর্তৃক পূর্ব বঙ্গের কতকাংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন; দিব্য কর্তৃক বরেন্দ্র ভূমিতে অপর একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন এবং কুমিল্লার সন্নিকটে পট্টিকের রাজ্য।

বাংলাদেশে অন্তর্বিদ্রোহ ও একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

অন্তঃবিদ্রোহের ফলে পাল সাম্রাজ্য যখন খণ্ড বিখণ্ড হইতেছিল সেই সময় বৈদেশিক আক্রমণও পাল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিল। পাল রাজগণের এই চরম দুরবস্থার সময় কর্ণাটকের চালুক্য রাজগণ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড় ও কামরূপ দখল করিলেন। চালুক্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করিলেন এবং গৌড় ও রাঢ়দেশ দখল করিলেন।

বাংলায় বৈদেশিক আক্রমণ

সুতরাং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই পাল সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার তদানীন্তন বিশৃঙ্খলা দূর করিবার মত উপযুক্ত ক্ষমতা দ্বিতীয় মহীপালের ছিল না। কুচক্রীদের পরামর্শে তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতা দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইহার ফলে অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিল। মহীপালের কুশাসনের বিরুদ্ধে বরেন্দ্র ভূমির সামন্তগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইলেন। মহীপাল এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত হইয়া নিহত হইলেন। এই সুযোগে জনৈক কৈবর্ত জাতীয় নায়ক দিব্য বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন।*

দ্বিতীয় মহীপাল

বরেন্দ্রভূমির সামন্তদের বিদ্রোহ ও দ্বিতীয় মহীপালের পতন

---

* **দিব্য ঃ** কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সহিত দ্বিতীয় মহীপালের সম্বন্ধ কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। 'রামচরিত'—অনুসারে দিব্য পালরাজের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহী সামন্তদের সহিত দিব্যের যোগাযোগ কিরূপ ছিল তাহাও সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রথমে দিব্য মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করেন নাই। তবে বিদ্রোহীদের হস্তে মহীপাল নিহত হইলে দিব্য এই সুযোগে বরেন্দ্র ভূমিতে নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পাল সাম্রাজ্য

(The Third Pala Empire)

রামপাল, ১০৭৭-১১২০ খৃঃ (Ramapala) : পাল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন রামপাল। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় শূরপাল কিছুদিনের জন্য মগধে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় শূরপালের পর রামপাল রাজা হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রামপাল বরেন্দ্র ভূমি পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। দিব্যের বিরুদ্ধে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিলেন এবং পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া বহু সামন্ত রাজগণের সাহায্য লাভ করিলেন। প্রধানতঃ মগধ ও রাঢ়দেশের সামন্তগণই রামপালের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' নামক গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামপাল বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিবার পূর্বেই দিব্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভীম রাজা হন। রামপাল সসৈন্যে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। অবশেষে ভীম বন্দী হইলে তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পরিজনবর্গসহ ভীমকে হত্যা করা হইল। এইভাবে কৈবর্ত রাজবংশের অবসান ঘটিল এবং রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করিলেন।

রামপালের বরেন্দ্র অভিযান

ইহার পর রামপাল সাম্রাজ্যের অপরাপর অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব বঙ্গের বর্মরাজ বিনা যুদ্ধেই রামপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইভাবে পূর্ব-সীমান্তের রাজ্যগুলি জয় করিয়া রামপাল রাঢ় দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাঢ় দেশের সামন্তগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইহার পর তিনি উড়িষ্যা জয় করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার প্রভুত্ব লইয়া রামপাল ও চোড়গঙ্গ রাজ অনন্তবর্মণের সঙ্গে বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে। রামপালের মৃত্যুর পর উড়িষ্যা চোড়-গঙ্গ রাজগণের অধিকারে চলিয়া যায়।

রামপালের অন্যান্য রাজ্যজয়

উড়িষ্যার অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ ছাড়াও রামপালকে চালুক্য ও গাহড়বাল-গণের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামপাল উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিযান সাফল্যের সহিত প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চালুক্য ও গাহড়বাল-গণের সহিত সংঘর্ষ

বাংলাদেশের ইতিহাসে রামপাল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার, বাংলার সর্বত্র স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন, কামরূপ

ও উৎকল জয় এবং চালুক্য ও গাহড়বালগণের আক্রমণ প্রতিরোধ তাঁহার জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তিনি নিজ বাহুবলে বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরুদ্ধার করিতে এবং বাংলাদেশে এক সুদৃঢ় রাজশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

রামপালের কৃতিত্ব

পাল শাসনের গুরুত্ব (Importance of the Pala Rule): বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে পাল বংশের রাজত্বকাল এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। স্মিথের কথায় "The Pala dynasty deserves to be remembered as one of the most remarkable of Indian dynasties."

স্মিথের মত

(১) **সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা:** হর্ষোত্তর যুগে পাল সাম্রাজ্য ছিল উত্তর ভারতের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য। চারিশত বৎসরকাল মৌর্য ও গুপ্ত রাজগণের ন্যায় পাল রাজগণও উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধের কনৌজের সিংহাসনে অভিষেককালে উত্তর ভারতের বহু রাজন্যবর্গের উপস্থিতি পালরাজগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রমাণ করে। শতাব্দীব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পর প্রথম পাল-রাজ গোপাল পাল রাজাকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ধর্মপাল ও দেবপাল এই রাজ্যকে আর্যাবর্তে এক বিশাল সাম্রাজ্যে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালরাজগণের আমলে সমগ্র বাংলাদেশে একটি সার্বভৌম ও সুদূর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেবপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং বাংলার সামরিক মর্যাদা ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা পাল সাম্রাজ্য ছিল অধিক বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী। "বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে ইহার (পাল সাম্রাজ্যের) অনুরূপ শক্তি বা সমৃদ্ধির পরিচয় ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও পাওয়া যায় নাই" (মজুমদার)।

(২) **বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ:** পালরাজগণের কৃতিত্ব ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশীগণ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। আরব পর্যটক সুলেমান পাল রাজগণের সুদক্ষ শাসন ও সামরিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিব্বত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাল রাজগণের খ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে।

(৩) **শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ** "এই সাম্রাজ্য (পাল সাম্রাজ্য) বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়" (মজুমদার)। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জাতীয় জীবণের আত্মবিকাশ ঘটিয়াছিল। পাল রাজগণ ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক। এই যুগে বিক্রমশীল বিহার ও নালন্দা বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 'চক্রদত্ত' প্রণেতা চক্রপাণি, 'রাম-চরিত' গ্রন্থের রচয়িতা সন্ধাকর নন্দী, 'চর্যাপদ' রচয়িতা লুই ও কাহ্নপদ প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণ পাল রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও অভাবনীয় উন্নতি ইহয়াছিল। ধীমান ও বিটপাল বাংলা দেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন শিল্পরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে পাল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পরীতি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলির শিল্পরীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈদেশিক পর্যটকদের লিখিত বিবরণীতে বাংলার কারুকার্যময় বহু অট্টালিকা ও মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলায় পালযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

বাংলার মণীষী

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নয়ণ

ধর্মের ক্ষেত্রেও নবজাগরণের আভাস পাওয়া যায় বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। পাল বংশের রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছিল এবং ওদন্তপুর ও বিক্রমশীল বিহার বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বতে প্রসার-লাভ করিয়াছিল এবং এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ আচার্য অতীশ বা দীপঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার

এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়াও বাংলাদেশ উন্নত ছিল। তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) ও সপ্তগ্রাম (হুগলী জেলা) সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধলা কেন্দ্র ছিল। পূর্ব ভারতীয় দেশগুলি এবং নেপাল, ভূটান ও তিব্বতের সহিত বাংলার বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত।

ব্যবসা বাণিজ্য

সুতরাং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়া পাল রাজত্বকাল ছিল বাংলা তথা ভারতের গৌরবময় যুগ।

সেন সাম্রাজ্য

(The Sena Empire)

সেন বংশের উৎপত্তি (Origin of the Senas) : পাল বংশের পর বাংলাদেশে সেন বংশের রাজত্ব শুরু হয়। সেনরাজগণের শিলালিপি অনুসারে তাঁহারা ছিলেন চন্দ্রবংশীয় এবং ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়। বাংলার প্রাচীন কুলজীগ্রন্থে সেনরাজগণকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার অনেকের মতে তাঁহারা ছিলেন কায়স্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতিতে তাঁহারা ছিলেন ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়।

বংশ পরিচয়

কোন্ সময় সেন রাজগণ বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি (Deopara Inscription) ও বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে (Naihati Copper Inscription) এই প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধি উক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। দেওপাড়া লিপি অনুসারে সামন্তসেন কর্ণাটকদেশে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করার পর শেষ বয়সে গঙ্গা নদীর তীরে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। নৈহাটি তাম্রশাসন অনুসারে চন্দ্রবংশীয় রাজপুতগণ রাঢ় দেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এবং এই বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কর্ণাটক দেশের এক সেন বংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ় দেশে বসবাস করিতেছিলেন। এই বংশের সামন্ত সেন কর্ণাটক দেশে বহু যুদ্ধ বিগ্রহে খ্যাতি অর্জন করিয়া এই বংশের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান রচনা করেন এবং ইহার ফলেই তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন পালবংশের রাজত্বকালেই রাঢ় দেশে এক স্বাধীন রাজবংশের ভিত্তি রচনা করিতে সমর্থ হন।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেনরাজগণ প্রথমে পালরাজগণের অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং পরে পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে তাঁহরা স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেনরাজগণের পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের কোন চালুক্য আক্রমণকারীর সহিত বংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং চালুক্যরাজের অধীনে সামন্তরাজরূপে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চালুক্য রাজগণের শিলালিপিতে চালুক্যগণ কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ, কঙ্গিল ও গৌড় বিজয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল বিবরণ হইতে মনে হয় যে সেনরাজগণের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন কর্ণাটকবাসী এবং কোন এক সময় তাঁহারা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সামন্ত সেনের পূর্বে বাংলাদেশে সেনগণের কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্ত সেনই ছিলেন যথার্থ সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তিনি কোন রাজত্ব সূচক পদবী গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি পালরাজগণের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন।

সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেন

বিজয় সেন, ১১২৫-১১৫৮ খ্রঃ (Vijaya Sena) : হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইলে সেই সুযোগে বিজয় সেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের শূর বংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া রাঢ় দেশে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তিনি বর্মণদের নিকট হইতে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি মিথিলার কর্ণাটক দেশীয় রাজা নান্যদেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নান্যদেব পরাজিত হইয়া বাংলাদেশ জয় করিবার আশা ত্যাগ করিলেন। তিনি কলিঙ্গরাজ ও গৌড়রাজকেও পরাজিত করিয়া কলিঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন। এই সকল অভিযানের সাফল্যের ফলে সমগ্র বাংলাদেশে বিজয় সেনের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজ্য বিস্তার

বাংলার ইতিহাসে বিজয় সেনের রাজত্বকাল গৌরবময়। সামান্য একজন সামন্ত হইতে তিনি নিজ শক্তির দ্বারা সমগ্র বাংলার এক সুদৃঢ় ও সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল-শাসনের পর বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং বাংলাদেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয় সেন সেই রাজ্যগুলি দখল করিয়া পুনরায় এক অখণ্ড রাজশক্তি স্থাপন কবিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।

কৃতিত্ব

বল্লাল সেন, ১১৫৮-১১৭৯ খ্রঃ (Ballal Sena) : বিজয় সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লাল সেনের একখানি তাম্রশাসন এবং তাঁহার রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' নামক গ্রন্থ দুইটি হইতে তাঁহার রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

পিতার ন্যায় তিনিও রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। অদ্ভূত-সাগরের বর্ণনা হইতে মনে হয় তিনি গৌড় রাজ্যের অধিপতি গোবিন্দপালের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। 'বল্লাল-চরিত' নামক গ্রন্থে বল্লাল সেনের মগধ ও মিথিলা জয়ের কথা উল্লিখিত আছে। সুতরাং বল্লাল সেন যে শুধু পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা সেন-সাম্রাজ্যের সীমাও বিস্তার করিয়াছিলেন।

রাজ্য জয়

বল্লাল সেন ছিলেন একজন খ্যাতনামা সমাজ সংস্কারক। বাংলার হিন্দু সমাজে তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

সমাজ সংস্কারক

ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল। 'দান সাগর' ও 'অদ্ভূত সাগর' নামক গ্রন্থ দুইটি রচনা করিয়া তিনি পণ্ডিত মহলে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বেদ ও স্মৃতি পুরাণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং গুরু অনিরুদ্ধের নিকট তিনি স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং চট্টগ্রাম, আরাকান উড়িষ্যা ও নেপালে বহু ধর্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে শাস্ত্রচর্চায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

ধর্ম ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

লক্ষ্মণ সেন, ১১৭৯-১২০৬ খৃঃ (Lakshmana Sena): ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের কয়েকখানি তাম্রশাসন, সভাকবিদের রচিত প্রশস্তি ও মুসলমান ঐতিহাসিক মীনহাজ-উদ্দীন রচিত 'তবকাতে নাসিরী' প্রভৃতি গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। পিতা ও পিতামহের ন্যায় লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং বাল্যকালেই তিনি রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই গৌড় দেশ সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয় এবং তাঁহার নামানুসারে রাজধানী গৌড়ের নামকরণ হইয়াছিল লক্ষ্মণাবতী। তিনিই সর্বপ্রথম 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইখানি তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে তিনি কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশী জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে বিজয় স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কণৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজাকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

রাজ্য জয়

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষের দিকে সেন সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং স্থানীয় সামন্তগণ দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১২৪২ খৃষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বখ্‌তিয়ার খালজী নামে এক তুর্কী জায়গীরদার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া সেন সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেন। 'তবকাতে নাসিরী' নামক গ্রন্থে তুর্কীগণের মগধ ও গৌড় জয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, বখ্‌তিয়ার তুর্কী বণিকের ছদ্মবেশে লক্ষ্মণসেনের অস্থায়ী রাজধানী নদীয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন সুযোগ না পাইয়া নৌকা যোগে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। তুর্কী-বাহিনী নদীয়া ও গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সেন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। পূর্ববঙ্গে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মণসেন ১২০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

তুর্কীগণের নদীয়া আক্রমণ

লক্ষ্মণসেনের পূর্ববঙ্গে পলায়ণ ও মৃত্যু

বল্লাল সেনের ন্যায় লক্ষ্মণসেনও বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চায় তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁহার রাজসভায় বিরাজ করিতেন। এতদ্ভিন্ন 'পবণদূত' প্রণেতা ধোয়ী, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হলায়ুধ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও একজন সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'অদ্ভূত সাগর গ্রন্থটি সংকলিত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী এবং তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলী ও দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া এক সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহাকে বাগদাদের খালিফার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের সাহিত্যানুরাগ

ধর্মানুরাগ ও চারিত্রিক গুণাবলী

সেন সাম্রাজ্যের পতন (Fall of the Sena Empire): লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে তুর্কী আক্রমণের পর হইতে সেন সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তুর্কীগণের নদীয়া আক্রমণের পর লক্ষ্মণ সেন তিন-চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারা উভয়েই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজত্বকাল বা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ যে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহারা উভয়েই সাময়িকভাবে তুর্কীদের ক্রমাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশব সেনের পরও যে কয়েকজন সেন বংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেশব সেনের পরবর্তী সেন রাজগণের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

তুর্কী-আক্রমণ

তুর্কী আক্রমণই সেন সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ নহে। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহও সেন সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল। সেন রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এগুলির মধ্যে ডোম্মণপাল কর্তৃক স্থাপিত সুন্দরবন অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য ও মেঘনা নদীর পূর্বতীরে মধুমথনদেব কর্তৃক দেব-বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

সেন শাসনের গুরুত্ব (Importance of Sena Rule): সেনবংশের রাজত্বকাল দীর্ঘ দিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু বাংলার

ইতিহাসে ইহা এক গৌরবময় যুগ। পাল বংশের অবসানের পর বাংলায় যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অরাজকতা দেখা দিয়াছিল সেনবংশের প্রথম তিনজন রাজার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভার বলে সেই অবস্থার অবসান হইয়াছিল। বাংলাদেশ পুনরায় এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সমাজের কৌলিন্য প্রথা সুদৃঢ় হইয়াছিল। এই যুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে হলায়ুধ, জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শ্রীধরের নাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা দেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও অপর দিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই যুগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও সেন যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহুদিন পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সেন রাজগণ বাংলার হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন

সংস্কৃত ভাষার নব জাগরণ

হিন্দু সমাজ ও ধর্ম রক্ষা

প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা

(Administrative System of Ancient Bengal)

গুপ্ত-পূর্ব যুগ (Pre-Gupta Period): গুপ্ত-পূর্ব যুগে প্রাচীন বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন বাংলায় বহু জাতির উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে আর্যাবর্তের ন্যায় বাংলা দেশেও কয়েকটি সংঘবদ্ধ জাতি বসবাস করিত এবং উহাদের শাসনপ্রণালী ছিল খুবই সাধারণ। গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে অনুমান হয় যে খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই বাংলা দেশে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে গ্রীক লেখকগণ কর্তৃক বর্ণিত গঙ্গারিডই রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভারতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সংঘবদ্ধ ভাবে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্বদাই যত্নবান থাকিত। সুতরাং গ্রীক লেখকগণের বিবরণী ও মহাভারতের সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে প্রাচীন বঙ্গবাসীর রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌর্য-পূর্ব যুগ

মৌর্য যুগে বাংলার শাসন পদ্ধতি সম্পর্কেও সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মহাস্থানগড়ে (প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন) প্রাপ্ত একখানি লিপিতে 'মহামাত্রের' উল্লেখ আছে। কিন্তু মৌর্য যুগে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে মৌর্য সম্রাট কর্তৃক শাসিত হইত অথবা প্রাদেশিক শাসন-কর্তা কর্তৃক শাসিত হইত—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লিপিতে জনকল্যাণমূলক কার্যাদির উল্লেখ আছে। জনকল্যাণমূলক কার্যাদি মৌর্য শাসন পদ্ধতির এক অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন পদ্ধতি বাংলা দেশেও প্রচলিত ছিল।

মৌর্য-যুগ

গুপ্ত যুগ (Gupta Period) ঃ গুপ্ত যুগে বাংলার শাসন পদ্ধতির সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও সমগ্র বাংলাদেশ গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল না। বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল না—তাহা 'মহারাজা' উপাধিধারী মহাসামন্তগণ কর্তৃক শাসিত হইত। এই সকল মহাসামন্তগণ ছিলেন ভূতপূর্ব স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিগণ। এই প্রসঙ্গে মহাসামন্ত শশাঙ্ক, মহারাজা রুদ্রদত্ত ও মহাসামন্ত বিজয় সেনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশের আভ্যন্তরিণ শাসনভার ইহাদের উপর অর্পিত থাকিত। ক্রমে বাংলার সর্বত্র গুপ্ত সম্রাটগণের শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এই মহাসামন্তগণের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন—যথা 'দূতক', 'পুরোপরিক', 'উপরিক', 'পতি', 'পুরপাল'—ইত্যাদি।

বাংলাদেশের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীনে ছিল তাহা কয়েকটি শাসন বিভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি'। প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি 'বিষয়', 'মণ্ডল', 'বীথি' ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাটগণের লিপি ও সরকারী দলিল পত্রে একটি মাত্র ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি। পরবর্তীকালে বর্ধমান ভুক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ভুক্তি ও বিষয়গুলি ছিল আধুনিককালের ডিভিসন (বিভাগ) ও জেলার মত।

গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল

সম্রাট স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন। কোন কোন সময় রাজ পরিবার হইতেও ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত। শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'উপরিক'। পরবর্তী কালে শাসনকর্তাগণ 'উপরিক-মহারাজ' নামে অভিহিত হইতেন। 'উপরিক মহারাজ'গণ সাধারণত বিষয়গুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন। বিষয় পতিদের নানা উপাধি ছিল—যথা, কুমারামাত্য, আয়ুক্তক ইত্যাদি।

ভুক্তি

ভুক্তি, বিষয়, বীথি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিভাগেরই একটি কেন্দ্র ছিল এবং তথায় উহাদের একটি 'অধিকরণ' বা আফিস থাকিত। এই অধিকরণগুলি স্থানীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট।

'অধিকরণ'

দামোদরপুর তাম্রশাসনে কোটিবর্ষ বিষয়ের প্রধান সদস্যগণের নাম পাওয়া যায়—যথা, (১) নগর শ্রেষ্ঠী (বিভিন্ন নিগমগুলির সভাপতি), (২) প্রথম সার্থবাহ (প্রধান বণিক বা বণিক সংঘের প্রতিনিধি), (৩) প্রথম কুলিক (প্রধান লেখক বা শিল্পী-সংঘের প্রতিনিধি) ও (৪) প্রথম কায়স্থ (প্রধান লেখক বা এক শ্রেণীর কর্মচারী)। বিষয়পতিগণ বিভিন্ন সংঘের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় বিষয়ের কার্য নির্বাহ করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় যে প্রাচীন বাংলায় স্বায়ত্ত শাসন প্রথা সুদৃঢ় ছিল। সম্ভবতঃ বিষয়গুলির ন্যায় ভুক্তি ও বীথির শাসনব্যবস্থাও স্বায়ত্ত শাসন মূলক ছিল। বীথির অধিকরণের সদস্যগণ ছিলেন 'সহত্তর', 'অগ্রহরিণ' ও 'বাহ নায়রু'।

বিষয় ও বীথির সদস্যগণ

পাল যুগ (Pala Period): পাল রাজগণের চারি শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। এই যুগেও ভুক্তি, বিষম, মণ্ডল প্রভৃতি শাসন বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালরাজগণ প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র বাংলা দেশ বিহার ও আসাম শাসন করিতেন। এই কারণে এই যুগে বহু ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যথা,—পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, বর্ধমান ভুক্তি, দণ্ড ভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), প্রাগজ্যোতিষ ভুক্তি (আসাম), শ্রীনগর ভুক্তি (বিহার) ইত্যাদি। এই ভুক্তি বা বিষয়গুলির শাসন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত গুপ্ত যুগের 'অধিকরণগুলি' পাল-সাম্রাজ্যে কিরূপ ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না।

বাংলাদেশে পাল রাজগণের আমলে রাজশক্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল এবং পাল রাজগণের 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারিক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধিতে রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। গর্গ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ধর্মপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শাসনব্যবস্থার উপর প্রধান মন্ত্রী যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেন।

গুপ্ত যুগের ন্যায় পাল যুগেও সামন্ত রাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের নানা উপাধি ছিল যথা,—রাজা, রাজন্যক, রাণিক, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ইহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতেন এইরূপ প্রমাণ আছে।

পাল সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শাসন বিভাগ ছিল এবং প্রত্যেকটি বিভাগে একজন অধ্যক্ষ থাকিতেন। রাজা মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচলনা করিতেন। অমাত্যগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' (প্রধান অমাত্য), 'দূত' (পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী), 'রাজস্থানীয়' ও 'অঙ্গরক্ষ' (যথাক্রমে রাজার প্রতিনিধি ও দেহরক্ষী)। পিতার জীবদ্দশায় অনেক সময় যুবরাজ শাসনকার্য পরিচলনা করিতেন।

কেন্দ্রীয় শাসন

রাজস্ব বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। উৎপন্ন শস্যের উপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য করা হইত যথা, 'ভাগ', 'ভোগ', 'হিরণ্য', ইত্যাদি। রাজস্ব বিভাগে 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে এক কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি রাজস্বের ষষ্ঠাংশ কর হিসাবে সংগ্রহ করিতেন। রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীগণ ছিলেন 'চৌরোদ্ধরনিক', 'শৌল্কিক', 'তরিক' ইত্যাদি।

রাজস্ব বিভাগ

সামরিক বিভাগের সর্বাধিনায়ককে বলা হইত সেনাপতি বা মহাসেনাপতি। পদাতিক, অশ্বারোহী, রণতরী, হস্তী এই কয়েকটিভাগে সামরিক বিভাগ বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগে একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন। ইহা ছাড়া কোট্ট পাল (দুর্গরক্ষক), প্রান্ত পাল (সীমান্ত রক্ষক) প্রভৃতি অন্যান্য সামরিক কর্মচারীরও নাম পাওয়া যায়। স্থলবাহিনী ছাড়াও পাল রাজগণের একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। 'রঘুবংশে' নৌ-বাহিনীর উল্লেখ আছে। কুমার পালের রাজত্বকালে দক্ষিণ-বঙ্গে নৌ-যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল রাজগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন এবং বর্তমানকালের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সৈন্য দ্বারা বিভিন্ন সৈন্যদল গঠিত হইত।

সামরিক বিভাগ

নৌ-বাহিনী

পাল রাজগণের অধীনে অপরাপর কর্মচারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যথা,—'মহাক্ষপটলিক' ও 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' (হিসাব ও দলিল সংরক্ষক), 'ক্ষেত্রপ' (জমির জরীপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী), 'মহাদণ্ডনায়ক' (প্রধান বিচারক), 'মহাপ্রতিহার', 'দাণ্ডিক' (পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) ইত্যাদি।

অন্যান্য কর্মচারী

সেন যুগ (Sena Period): সেন, কম্বোজ, বর্ম প্রভৃতি রাজ বংশের আমলেও পাল সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী মোটামুটিভাবে প্রচলিত ছিল।

এই যুগে কতকগুলি নূতন শাসন বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা,—'পাটক', 'চতুরক', আবৃত্তি' প্রভৃতি। তিনটি শাসন বিভাগের শাসনকর্তা যথা,—'ভুক্তিপতি', 'মণ্ডলপতি' ও

নূতন শাসন বিভাগ

'বিষয়পতি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন রাজগণের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপর দিকে বর্ধমান ভুক্তির সীমা সংকুচিত করা হইয়াছিল। পাল রাজগণের ন্যায় সেন রাজগণও নানাবিধ রাজত্ব স্থচক উপাধি ধারণ করিতেন যথা,—'অশ্বপতি', 'গজপতি', 'নরপতি', 'রাজত্রয়াধিপতি' ইত্যাদি।

রাজত্ব-স্থচক উপাধি

সেন রাজগণের তাম্রশাসনে উচ্চ রাজ কর্মচারীদের স্থদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইলেন 'মহামন্ত্রী'। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। সেন রাজগণের তাম্রশাসনে পুরোহিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মী সেন রাজগণের আমলে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সহিত রাজ-শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই যুগে 'মহাসন্ধিবিগ্রহিকা'-র গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'মহামুদ্রাধিকৃত' ও 'মহাসর্বাধিকৃত' নামে দুইজন নূতন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিচার বিভাগে 'মহাধর্মাধ্যক্ষ', রাজস্ব বিভাগে 'হট্টপতি', সামরিক বিভাগে 'মহাপিলুপতি', 'মহাবুহপতি' প্রভৃতি নূতন কর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজ-কর্মচারী

কম্বোজ-রাজ নর পালের 'ইরদা' (Irda) তাম্রশাসনে এই যুগের শাসন পদ্ধতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে কর্মচারীদের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে—যথা, 'অধ্যক্ষবর্গ', 'করণ', 'সেনাপতি', 'সৈনিক-সংঘ-মুখিয়া', 'দূত', 'মন্ত্রপাল' ইত্যাদি।

ইরদা তাম্রশাসন

উপসংহার ঃ মোটামুটিভাবে ইহাই ছিল বাংলার শাসনপদ্ধতি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে একটি স্থনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পাল রাজগণের আমলে তাহা স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় বৈদেশিক প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাসনব্যবস্থার উপর বৈদেশিক প্রভাব যেরূপ পড়িয়াছিল বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রভাব সেই পরিমাণ বিস্তার করিতে পারে নাই। শাসন পদ্ধতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সেই যুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মোটেই অনগ্রসর ছিল না।

নবম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস

(Cultural History of Ancient India)

রাজনৈতিক ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসও ছিল গৌরবময়। যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মের ক্ষেত্রেও বিবর্তন ঘটিয়াছিল।

(১) ভাষা ও সাহিত্য (Language and Literature): আর্যগণের বাংলাদেশে আগমণের পূর্বে বাংলার নরনারীগণের ভাষা কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। আর্যগণের সংস্পর্শে আসিবার পর বাংলাদেশে আর্য ভাষার প্রচলন শুরু হয়। বাংলার সর্ব প্রাচীন আঞ্চলিক ভাষা দশম শতাব্দীর পূর্বেকার নহে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এই ভাষা হইতেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দু শাসনকালে বাংলার সাহিত্য প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

পাল-পূর্ব যুগের সংস্কৃত সাহিত্য

মৌর্য যুগে বাংলা দেশের সর্বপ্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হইল মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত একখানি প্রস্তরলিপি। ইহার পর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে সাহিত্যের অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচলন ছিল। গুপ্তরাজগণের তাম্রশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল। গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চার উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল এবং কাব্য রচনায় দুইটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল যথা,—গৌড়ী-রীতি ও বৈদর্ভী-রীতি। পাল পূর্ব যুগের বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পালকাপ্য কর্তৃক রচিত 'হস্তায়ুর্বেদ', চন্দ্রগোমিন কর্তৃক রচিত 'চান্দ্র-ব্যাকরণ', 'ন্যায়সিদ্ধালোক', 'লোকানন্দ-নাটক', খ্যাতনামা দার্শনিক গৌড়পাদ কর্তৃক রচিত 'গৌড়পাদ-কারিকা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাল রাজগণের আমলে সংস্কৃত কাব্যচর্চা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই যুগের তাম্রশাসনে সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার মনীষার পরিচয় পাওয়া

যায়। বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ, তর্ক, বেদান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই যুগে বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের মধ্যে চতুর্বেদজ্ঞ দর্ভপানি, 'মুদ্রারাক্ষস' নাট্যকার বিশাখ দত্ত, 'রামচরিত' কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, 'অম্বর-সিদ্ধি', 'তত্ত্বপ্রবোধ', 'সংগ্রহটীকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধর ভট্ট 'নিদান' গ্রন্থের রচয়িতা মাধব, 'দায়ভাগ' গ্রন্থের রচয়িতা জীমূতবাহন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাল রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁহাদের আমলে সহজিয়া ধর্ম সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্য রচনায় বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান' গ্রন্থের রচয়িতা শীলভদ্র, বজ্রযান-সাধন গ্রন্থগুলির রচয়িতা জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত দীপঙ্কর, তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকাকার প্রজ্ঞাবর্মণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাল যুগে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্য

সেন রাজগণের আমলে সহজিয়া সাহিত্যের প্রসার হ্রাস পায় এবং পুনরায় সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সেন রাজগণ ছিলেন সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং ইহাদের অনেকেই কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন কর্তৃক রচিত 'দান-সাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' নামক গ্রন্থ দুইটিতে হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান ও দান কর্মাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। সে যুগের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত সেন রাজগণের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন হলায়ুধ। অপরাপর কবি যাঁহারা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন ধোয়ী, উমাপতিধর ও জয়দেব। হলায়ুধ কর্তৃক রচিত 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব', 'মীমাংসা-সর্বস্ব', বৈষ্ণব-সর্বস্ব ধোয়ী কর্তৃক রচিত 'পবনদূত', উমাপতি ধর কর্তৃক রচিত 'চন্দ্রচূড়-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সে যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন জয়দেব। তাঁহার রচিত 'গীত-গোবিন্দ' সংস্কৃত সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

সেন যুগে সংস্কৃত সাহিত্য

সেন যুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ বলা হইয়া থাকে। "একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও অপর দিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই যুগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।"

পাল যুগে বৌদ্ধ ও শৈব আচার্যগণ গান ও দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলি 'চর্যাপদ' নামে প্রসিদ্ধ। এ পর্যন্ত মোট ২২ জন কবি রচিত মোট ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। এই গুলির মধ্যে ১২টি চর্যাপদের রচয়িতা ছিলেন কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নপা। এই চর্যা-

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পদগুলির মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয় এবং ইহার প্রভাবেই পরবর্তী যুগে বাংলার সহজিয়া গান, বাউল গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর উৎপত্তি হয়।

(২) **প্রাচীন বাংলার ধর্ম** (**Religion of Ancient Bengal**): আর্যধর্ম বিস্তারের পূর্বে বাংলার ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলাদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচলন শুরু হয়। সম্রাট অশোকের সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। সেই সময় বৌদ্ধ ধর্মের সহিত জৈন ধর্মেরও প্রচলন শুরু হয় তবে জৈনদের সংখ্যা ছিল কম। পরবর্তীকালে জৈনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্ত যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম সাময়িকভাবে ম্লান হইয়া পড়ে। কিন্তু পাল রাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্ম পুনরায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এই যুগে বুদ্ধের বহু মূর্তি বাংলার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাল যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করিলেও উহা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। পাল যুগের পর বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সহজিয়া ধর্মমতে গুরুর স্থান সকলের উপর। সহজিয়াপন্থীগণ বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক আচার অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধী। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে উহারা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ 'সিদ্ধাচার্য' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে সহজিয়া ও অন্যান্য যে সকল ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেন রাজগণের আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেন রাজগণ ছিলেন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁহাদের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল। সেন যুগে বিষ্ণু শিব, পার্বতী, প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা শুরু হয় এবং বহু হিন্দু মন্দির নির্মিত হয়। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে কোন্‌টি অধিক প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে বৈষ্ণব ধর্মমতই অধিক প্রচলিত ছিল।

আর্য ধর্মের প্রসার

মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার

গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার

পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার

সহজিয়া ধর্মমত

সেন যুগে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রসার

বাংলার নৃপতিগণ পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক হইয়াও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্ম পাল ও বিগ্রহ পাল বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন। নারায়ণ পাল কর্তৃক শিব মন্দির নির্মাণ ও শৈব রাজা বৈন্যগুপ্ত কর্তৃক জৈন বিহারের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত ভূমিদানের

কথা উল্লিখিত আছে। প্রাচীন বাংলায় একমাত্র শশাঙ্কের পরধর্ম বিদ্বেষের কথা উল্লিখিত আছে। কথিত আছে, তিনি ছিলেন ঘোর বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং গয়ার বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শশাঙ্ক বৌদ্ধ ও জৈনগণকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতেন। অবশ্য এইরূপ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। হিউয়েন-সাং ও ইৎ-সিং-এর বিবরণী ও তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রাচীন যুগে বাংলার ধর্মজীবন খুবই উন্নত ছিল এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা বাঙ্গালী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

ধর্মীয় উদারতা

(৩) **প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা (Arts):** বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। নানাবিধ কারণে প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা লুপ্ত হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন যুগে বাংলার শিল্পকলা উন্নত ছিল।

(ক) **স্থাপত্য শিল্পকলা:** প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অতি সামান্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী এবং প্রাচীন শিলালিপি হইতে হিন্দু যুগে বাংলার কারুকার্যময় বহু হর্ম, মন্দির, স্তূপ ও বিহারের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশে কিছু বৌদ্ধ ও জৈন স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। বাংলায় আবিষ্কৃত স্তূপগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি। ঢাকা জেলায় অষ্টধাতু নির্মিত একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাই সম্ভবতঃ বাংলার সর্ব প্রাচীন স্তূপের নিদর্শন। বৌদ্ধগ্রন্থে বাংলার কয়েকটি স্তূপের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় কিছু ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক নির্মিত স্তূপের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এগুলি গোলাকার ও চতুষ্কোণ আকার।

স্তূপ

চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীতে বাংলায় বহু বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ আছে। এগুলির অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে যে বিশাল বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপাল পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। ইহা সোমপুর মহাবিহার নামে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই বিহারের অঙ্গনটি চতুষ্কোণ এবং উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীর গাত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাসের উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ নির্মিত হইয়াছিল। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। ভারতে অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার-গুলির তুলনায় সোমপুর বিহার ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সোমপুর বিহারের মন্দিরটি ছিল সুরম্য এবং এই ধরণের মন্দির ভারতের কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বৌদ্ধ বিহার

(খ) **ভাস্কর্য শিল্পকলা :** বাংলাদেশের ভাস্কর্য শিল্পকলাও উন্নত ছিল। পাহাড়পুর মন্দির গাত্রে প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পোড়ামাটির মূর্তি, সূর্যমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাস্থানের সন্নিকটে অষ্টধাতু নির্মিত একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সকল বিভিন্ন মূর্তি হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে প্রাচীন বাংলায় ভাস্কর্য শিল্পের বহুল প্রচলন ছিল।

(গ) **পাল যুগের শিল্পকলা :** শিল্পকলার ক্ষেত্রে পাল যুগ স্মরণীয়। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগের শিল্পকে সাধারণতঃ পাল যুগের শিল্পকলা বলা হইয়া থাকে। কারণ এই যুগের শিল্পরীতিই পরবর্তী সেনযুগেও অব্যাহত ছিল। প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি এই যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহাতে ধর্ম ভাবের প্রভাব অধিক ছিল। শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে দেব-দেবীর মূর্তিগুলি নির্মিত হইলেও শিল্পীর শিল্পকৌশল ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মূর্তি নির্মানে অষ্টধাতু ও কালো কষ্টিপাথর ব্যবহৃত হইত। অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যেরও প্রচলন ছিল।

(ঘ) **বাংলার শিল্পী :** তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের গ্রন্থে বাঙ্গালী শিল্পীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পাল যুগে ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিতপাল ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় বাংলাদেশে একটি শিল্পীসংঘ গঠিত হইয়াছিল। অনেকের মতে ধীমান ও বিতপাল পাথর খোদাই করিয়া বিক্রমশীল বিহার নির্মান করিয়াছিলেন। ধীমান ও বিতপালের শিল্পকৌশল কম্বোজ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের শিল্পধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাদের শিল্পরীতি ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। সেন যুগে বরেন্দ্রভূমির শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি, রাণক, শূলপাণি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শূলপাণি ছিলেন বরেন্দ্রভূমির শিল্পী-সংঘের প্রধান। বাংলার শিলালিপি ও তাম্রশাসনে আরও কয়েকজন শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা, সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র, শিল্পী কর্ণ ভদ্র, শিল্পী তথাগতসার ইত্যাদি। যদিও বাংলার শিল্পীগণ শাস্ত্রানুশাসন ও লোকাচারের নির্দেশমত মূর্তি বা মন্দির নির্মান করিতেন তথাপি ইহাদের মধ্যে শিল্পের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল।

(৪) **প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন (Economic life in Ancient Bengal) :** বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। সে যুগেও বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। প্রতি গ্রামে বাস্তুজমি ছাড়াও কৃষি জমি ও গোচারণ জমি ছিল। ধান্য, পাট, নীল, ইক্ষু ও তুলা বাংলার প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল। বহু ফলবতী বৃক্ষেরও রীতিমত চাষ হইত। জমির ন্যায় গৃহপালিত পশুও ধনরূপে পরিগণিত

কৃষি

হইত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাভী, ছাগ, মেষ ও হস্তী ছিল প্রধান। জমির উপর চাষীদের স্বত্ব কিরূপ ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে রাজাই ছিলেন সমস্ত জমির মালিক এবং চাষীগণকে জমি ভোগ-দখলের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কর দিতে হইত। অনেক সময় ব্রাহ্মণগণ ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্কর জমি ভোগ করিত।

শিল্প

সে যুগে কৃষির ন্যায় শিল্পও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। বাংলার কার্পাসজাত বস্ত্রাদি ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরেও সমাদৃত হইত। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বাংলার কার্পাস বস্ত্রাদির প্রশংসা রহিয়াছে। তখন বাংলা দেশে বিভিন্ন ধরণের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। অতি প্রাচীনকালেই বাংলার মসলিন বস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। কুটির শিল্প সে যুগে অধিক প্রচলিত ছিল। ইহার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কিছুই প্রস্তুত হইত। কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্প, চর্ম শিল্প, মৃৎ শিল্প ও ধাতু শিল্প ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্মকার ও সূত্রধর গৃহ, নৌকা প্রভৃতি নির্মান করিত। বাংলার কাষ্ঠ-শিল্পও একটি উচ্চ ও সূক্ষ্ম-শিল্পে উন্নীত হইয়াছিল।

বাণিজ্য

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যও প্রসার লাভ করিয়াছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত। প্রাচীন নগরগুলি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাণিজ্য হইতে প্রভূত আয় হইত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়াও সেই যুগে বাংলার বহির্বাণিজ্যও বিশেষ উন্নত ছিল। স্থল ও জল পথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত বাংলার পণ্য বিনিময় চলিত। তাম্রলিপ্ত, শ্রীপুর ও সপ্তগ্রাম সেই যুগের প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। সমুদ্রপথে সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশের সহিত বাংলার পণ্য বিনিময় চলিত। বাংলার মসলিন বস্ত্র ও নানা প্রকার গাছ-গাছড়া বিদেশে রপ্তানি হইত। হিমালয়ের পথ দিয়া নেপাল, ভূটান ও তিব্বতের সহিত বাংলার বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ঐশ্বর্য অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মুদ্রা

সম্ভবতঃ খৃষ্ট জন্মের চারিশত বৎসর পূর্বেই বাংলায় মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। মৌর্য যুগে বাংলায় মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুষাণ যুগের কিছু মুদ্রাও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুপ্তযুগ হইতে বাংলায় ব্যাপক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। প্রাচীন লিপিতে দুই প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে—যথা, দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও রূপক (রৌপ্য মুদ্রা)। পরবর্তী যুগে বাংলার স্বাধীন নৃপতিগণ কর্তৃক প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পাল রাজগণের আমলে তাম্র মুদ্রার

প্রচলন দেখা যায়। সেন রাজগণের আমলে 'পুরাণ' ও 'কপর্দক পুরাণ' নামে দুই প্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সম্ভবতঃ সেনযুগে মুদ্রা অপেক্ষা কড়ির প্রচলন বেশী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলা দেশে কড়ির বেশ প্রচলন ছিল।

প্রাচীন যুগে বাঙ্গালীর জীবনধারা
(Life of the Bengalees in Ancient Days)

প্রাচীনযুগে বাঙ্গালীর জীবন যাপন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদগুলিতে বাঙ্গালীর জীবন ধারার কিছু উল্লেখ আছে। চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীতেও এই বিষয়ের কিছু উল্লেখ আছে।

জাতিভেদ ও কৌলিন্য প্রথা

বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব। বিভিন্ন যুগে আর্যগণ বাংলায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্যদের আগমনের পর হইতে বাংলার সমাজে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি হয়। প্রাচীন কালে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ ছিল এবং উহাদের বৃত্তিও নির্দিষ্ট ছিল। গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটিলে বর্ণভেদ প্রথা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নানা প্রকার শংকর শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পাল ও সেন যুগে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, মালাকার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বল্লালসেন বাংলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সংস্কার সেন যুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। 'বল্লাল চরিত' হইতে জানা যায় যে রাজা ইচ্ছা করিলেই কোন শ্রেণীকে সমাজে উন্নত বা অবনত শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারিতেন। সমাজে প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকিলেও উহা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হইত না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সে যুগে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রকন্যা বিবাহ ও রাজদরবারে উহাদের সন্তানদের সম্মানলাভের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

পূজাপার্বণ ও আমোদ প্রমোদ

নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক, নৃত্যগীত অভিনয়, মল্লযুদ্ধ বাইচ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ সেযুগেও প্রচলিত ছিল। মেয়েদের মধ্যে উদ্যান-রচনা, জলক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ প্রচলিত ছিল। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সেযুগেও প্রচলিত ছিল। বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হইত এবং ইহা উপলক্ষে নানাবিধ আমোদ-উৎসবের ব্যবস্থাও ছিল। বর্তমান কালের ন্যায় সেযুগেও দুর্গাপূজা, কালীপূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, মনসা-পূজা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

সাধারণতঃ বেদ, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে পঠন-পাঠন চলিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-গ্রন্থাদিরও রীতিমত চর্চা চলিত। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত কিছুদিন তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। জ্ঞানলাভের জন্য বাঙ্গালী পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীগণ দূরদেশেও গমন করিতেন।

পঠন-পাঠন

সেযুগে নারী শিক্ষারও প্রচলন ছিল। বাৎস্যায়ন নারী সমাজে অবরোধ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। নারীদের কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য ছিল না। বিধবা নারী অপুত্র স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হইত। বিধবাগণকে শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে সর্বপ্রকার বিলাস-বর্জন ও কৃচ্ছ-সাধন করিতে হইত। সতীদাহ প্রথা সেযুগে প্রচলিত ছিল এবং উহা সমাজে জনপ্রিয় ছিল। পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু নারীদের মধ্যে তাহা নিষিদ্ধ ছিল। বাৎস্যায়নের বর্ণনায় বাঙ্গালী নারীর ভূয়সী প্রশংসা আছে। তিনি বাঙ্গালী নারীকে মৃদুভাষিণী ও অনুরাগবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নারী সমাজ

বাংলার অধিবাসীগণ অধিকাংশই ছিল পল্লীবাসী। কিন্তু ঐশ্বর্যপূর্ণ শহরেরও অভাব ছিল না। ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, দুগ্ধ, ফলমূল ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল। মাদক পানীয় নিন্দনীয় ছিল বটে কিন্তু উহার প্রচলনও ছিল। চর্যাপদে শৌণ্ডিকালয়ের উল্লেখ আছে। বাংলার নরনারী সাধারণতঃ ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিত। কখন কখন পুরুষেরা উত্তরীয় ও নারীরা ওড়না ব্যবহার করিত। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অলংকারের প্রচলন ছিল। অঙ্গুরীয়, কুণ্ডল, কণ্ঠহার, বালা, মল প্রভৃতি সে যুগের প্রধান অলঙ্কার ছিল। ধনীদের মধ্যে মণি-মুক্তার বহুল প্রচলন ছিল।

খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙ্গালীর উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাং সমতটের অধিবাসীদের শ্রমসহিষ্ণুতা, তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা কর্ণ-সুবর্ণের অধিবাসীদের অমায়িকতা ও বাঙ্গালীদের বিদ্যোৎসাহিতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে কোনরূপ দুর্নীতি ও অশ্লীলতা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। এই যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে ব্যাভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ আছে। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং বাঙ্গালীর উদ্যমশীলতা, সাহসিকতা ও বিদ্যোৎ-সাহিতার প্রশংসা করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর চরিত্র

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী

(Bengalees in Outer World)

অতি প্রাচীনকালেই পূর্ব এশিয়া ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাংলা-দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে বাণিজ্য এবং পরে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের সূত্র ধরিয়া বাঙ্গালী দূর দেশদেশান্তরে গমন করিয়াছিল। এশিয়া মহাদেশে হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ব্যাপারে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব কম নহে। বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এইরূপ কিংবদন্তী রহিয়াছে। হর্ষোত্তর যুগে পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাংলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্য প্রধানতঃ বাঙ্গালীদেরই সৃষ্টি। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙ্গালীর দান কম ছিল না। যবদ্বীপে প্রাপ্ত কতকগুলি মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপির সহিত বাংলা-দেশে প্রচলিত লিপির সাদৃশ্য দেখা যায়। সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন আচার্য কুমার ঘোষ।

পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তার

বাংলার বহু বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতগণ তিব্বতে গমন করিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারের বাঙ্গালী অধ্যক্ষ শান্তি রক্ষিত দুইবার তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিব্বতের রাজা শান্তি রক্ষিতের সম্মানার্থে লাসায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। শান্তি রক্ষিতের ভগ্নীপতি পদ্ম-সম্ভব তিব্বতের লামা সম্প্রদায়ের সংগঠন এবং বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। যে সকল বৌদ্ধ ধর্মাচার্য তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী অতীশ দীপঙ্করের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বাঙ্গালীর দান

তিব্বতীয় গ্রন্থে দীপঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরের এক রাজবংশে দীপঙ্করের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি চন্দ্রগর্ভ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। কুড়ি বৎসর বয়সে দীপঙ্কর ওদন্তপুর বিহারের আচার্য শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিতি লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দীপঙ্কর প্রথমে ব্রহ্মদেশে এবং পরে তথা হইতে সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। দীর্ঘকাল সুবর্ণদ্বীপে অবস্থান করার পর তিনি সিংহলে গমন করেন। ইহার পর তিনি মগধে ফিরিয়া আসেন। পালরাজ

অতীশ দীপঙ্কর

দীপঙ্করের ধর্মপ্রচার ও জ্ঞানাভিযান

মহীপাল দীপঙ্করকে বিক্রমশীলা বিহারের আচার্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পালরাজ নয়পালের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজা য়ে-শেষ-হোড দুইবার দীপঙ্করকে তিব্বতে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া ব্যর্থ হন। ইহার কিছুদিন পর য়ে-শেষ-হোড এক সামন্ত রাজার নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী হন। মৃত্যুর পূর্বে য়ে-শেষ-হোড দীপঙ্করকে তিব্বতে আসিবার জন্য শেষ অনুরোধ করিলে ধর্মপ্রাণ দীপঙ্কর আর তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি তিব্বতে গমন করিলে পরবর্তী তিব্বতরাজ তাঁহাকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করেন। তিব্বতে দীপঙ্কর বিশুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধ মত প্রচার করেন এবং বহু সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে দীপঙ্করের মৃত্যু হয়। আজিও তিব্বতীয় লামাগণ দীপঙ্করের বন্দনা ও অর্চনা করিয়া থাকেন।

শীলভদ্র

শুধু বিদেশেই নহে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কর্মবীর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শীলভদ্র ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মগধের জনৈক রাজা তাঁহাকে একটি নগরের রাজস্ব উপহার দিয়াছিলেন। কালক্রমে শীলভদ্র বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্যপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাং শীলভদ্রের শিষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট যোগ শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দূর দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

চন্দ্রগোমিন

শীলভদ্র ছাড়াও অপর দুই বাঙ্গালী পণ্ডিত শান্তি রক্ষিত ও চন্দ্রগোমিন নালন্দা মহাবিহারের আচার্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে চন্দ্রগোমিনের জন্ম হয়। তিনি আচার্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। যোগাচার মতবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

শৈব আচার্য

বৌদ্ধ আচার্য ছাড়াও অনেক বাঙ্গালী শৈবআচার্য বাংলার বাহিরে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-রাঢ় নিবাসী উমাপতিদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চোল দেশে বসবাস করিয়া স্বামি দেবর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে সিংহলদেশীয় রাজা চোল রাজ্যের জনৈক সামন্ত রাজাকে আক্রমণ করিলে উমাপতিদেবের মধ্যস্থতায় সিংহলীয় সৈন্য স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

কাশ্মীর রাজ্যেও বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের একজন মন্ত্রী ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁহার নাম ছিল শক্তিস্বামী। শক্তিস্বামীর পুত্র কল্যাণস্বামী ও কল্যাণস্বামীর পৌত্র জয়ন্তও কাশ্মীর রাজ্যে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জয়ন্ত বেদ বেদাঙ্গশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

শক্তিস্বামী, কল্যাণস্বামী, জয়ন্ত

ক্ষত্রিয়োচিত কার্যেও বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গদাধর নামে জনৈক বরেন্দ্র নিবাসী মাদ্রাজের অন্তর্গত কোলগোল্লুগ্রামে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে গৌড় নিবাসী অনেকমল্লের উল্লেখ আছে। তিনি গাড়য়াল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং কেদারভূমি ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে শক্তি নামে জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল দর্ভাভিসার। চন্দেল রাজগণের অধীনে অনেক বাঙ্গালী সন্ধিবিগ্রহিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে লক্ষ্মীধরের পুত্র গদাধরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

সুতরাং ধর্ম, সংস্কৃতি ও ক্ষত্রিয়োচিত বিবিধকার্যে প্রাচীনকালে বাঙ্গালী ভারতে ও ভারতের বাহিরে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

প্রশ্নমালা

1. Give a short description of the early Janapadas of Bengal.
2. Trace the origin of the Bengalees.
3. Give a short account of the political history of Bengal from B. C. 326 to A. D. 320.
4. Give a short account of the rise and fall of the Palas of Bengal. Form an estimate of the importance of the Pala dynasty.
5. Review the career of Sasanka.
6. Give a short account of the rise and fall of the Senas of Bengal.
7. Describe the administrative system of ancient Bengal.
8. Write a short account of the cultural activities in ancient Bengal,
9. Give an account of the art and literature of Bengal under the Palas and Senas.

দশম অধ্যায়

বৃহত্তর ভারত (Greater India)

ভারতের বাহিরে ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতির বিস্তার
(India's colonial and cultural activities outside India)

প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্হিজগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটিয়াছিল।

বর্হিবিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ

সম্ভবতঃ ভারতের নব্য-প্রস্তর যুগের অধিবাসীগণ জল ও স্থল পথে মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যাতায়াত করিত। ঐতিহাসিকদের মতে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতার সহিত পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার যোগযোগ ছিল। কাহারো কাহারো মতে পশ্চিম এশিয়া হইতে দ্রাবিড়গণ ভারতে আগমণ করিয়াছিল। সুপ্রাচীনকালে ভারতের সহিত মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিশরের যোগাযোগ ছিল। ডক্টর মজুমদারের মতে সিন্ধু সভ্যতার পরেও পশ্চিমী দেশগুলির সহিত ভারতের এই সম্পর্ক বজায় ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইহুদী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে রাজা সলমনের আমলে (খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দ) প্রাচ্যে সমুদ্রপথে যাতাযাত চলিত এবং প্রাচ্যের বহু সামগ্রী আমদানি করা হইত। পশ্চিমী দেশগুলিতে বহু সামগ্রীর ভারতীয় নাম এই কাহিনীর সমর্থন করে। আসিরিয় রাজা আমুরবনি পালের দরবারে 'সিন্ধু' নামে ভারতীয় সূতীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কতকগুলি 'জাতকে' ব্যাডেরু নামে কোন সাম্রাজ্যে ভারতীয় বাণিজ্যপোতের আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমতি হয় যে ব্যাবিলনের সহিত ভারতের সমুদ্র পথে যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ ভারত ও পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল—কোনরূপ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না।

ভারত ও পশ্চিমী দেশসমূহ (India and Western World): অতি প্রাচীনকালেই পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। বিখ্যাত 'বোঘাজ কোয়' লিপিতে (Boghaz koi-Inscription) বৈদিক দেব-দেবীর উল্লেখ আছে।

অনেকের মতে প্রাচীন আসিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সম্পর্ক ছিল। ইহা কতদূর সত্য তাহা সঠিক বলা যায় না তবে পারস্যের সহিত ভারতের সম্পর্ক যে অতি প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পারস্যের সহিত ভারতের সম্পর্ক ছিল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক। পারস্যের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্কেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের কতকাংশ পারস্য সম্রাটের অধিকারভুক্ত ছিল এবং পারস্য সম্রাটের পরিচালনাধীনে ভারতীয় সৈন্য গ্রীসের যুদ্ধ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

পারস্য, গ্রীস, মিশর সিরিয়া ও রোমের সহিত সম্পর্ক

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ভারত ও পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্কের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত থাকায় গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটিয়াছিল। যদিও গ্রীকদের শাসন অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই তথাপি তাহা গ্রীক ও ভারতীয়গণকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীদের আমলে ভারতীয় রাজ্য ম্যাসিডনের হস্তচ্যুত হইলেও, সেলিউকসের রাজ্যের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার ও অশোক পশ্চিমের গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস ও ডায়মাকাস কিছুদিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে মৌর্য রাজসভায় অবস্থান করিয়াছিলেন। আশোকের ত্রয়োদশ শিলা-লিপিতে (XIIIth Rock Edict) পাঁচজন গ্রীক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই গ্রীক রাজ্যগুলিতে অশোকের ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। গ্রীক বাহিনীর পথ ধরিয়াই অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে গমন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ব্যাক্ট্রিয়গণের আক্রমণের ফলে ভারতে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের পূর্বেই বৌদ্ধ ধর্ম পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে অল্-বিরুনীর বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন যে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত খরোশান, পারস্য, ইরাক ও মুসুল প্রভৃতি দেশগুলিতে খৃষ্ট ধর্মের পূর্বেই বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও এই সকল দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও বিস্তার ঘটিয়াছিল। জেনোব (Zenob) নামে সিরিয়ার জনৈক গ্রন্থকারের বিবরণী হইতে জানা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে দুইজন ভারতীয় নৃপতি ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আর্মেনিয়ার রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কালক্রমে সেই অঞ্চলে ভারতীয় রাজ্য স্থাপন ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কথিক আছে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সেণ্ট গ্রেগরী আর্মেনিয়া অঞ্চলে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে আগমন করিলে তাঁহাকে ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ

হইতে হইয়াছিল। ভারত ও মিশরের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে যে রাজা টলেমি ফিলাডেলফাস (Ptolemy Philadelphus—285-'46 B. C.)-এর রাজ সভায় একদা ভারতীয় নারী দেখা গিয়াছিল। মিশরের সহিত ভারতের প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আলেকজাণ্ডার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পত্তনের সময় হইতে এই যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রপথে ভারত ও মিশরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে ভারতের সহিত সমুদ্র পথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করার নীতি রোম সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। ৪৫ খৃষ্টাব্দে হিপালাস (Hippalus) কর্তৃক ভারতীয় মৌসুমীবায়ু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলে রোম ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র যাত্রা সহজ হইয়া উঠে। বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া বহু ভারতীয় ও রোমানগণ পরস্পরের দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরটি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থান। আলেকজান্দ্রিয়ায় বহু ভারতীয় বণিক বসবাস করিত বলিয়া জানা যায়। ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে কতিপয় ব্রাহ্মণ আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমান কন্‌সাল সেভিরাস (Saverus)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

কুষাণগণের আমলে ভারতের উপর রোমের সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়িয়াছিল এবং রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। কুষাণ-রাজগণের মুদ্রায় রোমান মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়। রোমান গ্রন্থকার প্লিনির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রোমসাম্রাজ্যে ভারতের বিলাস সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা ছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় নৃপতি ও রোম নৃপতিগণের মধ্যে বহুবার দূত বিনিময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সমাদৃত হইয়াছিল। অপর দিকে ভারতীয় শিল্প, ধর্ম ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর পশ্চিমী সংস্কৃতির বিশেষ করিয়া গ্রীসের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। পার্শী কিংবদন্তী অনুসারে শাহ্‌পুর (২৪২-২৭২ খৃঃ) নামে জনৈক পারসিক সম্রাট বহু ভারতীয় গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পারসিক রাজধানী সুসানগরে জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক অবস্থান করিতেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব পড়িয়াছিল। জনৈক গ্রীক দার্শনিকের কথায়, "the greeks stole their

উভয় সংস্কৃতির পারস্পারিক প্রভাব

philosophy from barbarians"। সার উইলিয়াম জোনস্-এর মতে সাংখ্য দর্শন ও পাইথাগোরিয়া দর্শন (Pythagorean Philosophy)-এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতীয় সীমান্তে সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলেই ভারতের সহিত এইরূপ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছিল। রোলিনসন (Rowlinson), গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ও জনৈক ভারতীয় দার্শনিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় 'পঞ্চতন্ত্র' পশ্চিমী দেশগুলিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল এবং বহু ভাষায় সেগুলি অনূদিত হইয়াছিল।

অপর দিকে ভারতীয় সংস্কৃতির উপরও গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব সমভাবে পড়িয়াছিল। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত। পরবর্তীকালে রচিত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রকে 'যবনেশ্বর' বা 'যবনাচার্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। গার্গী সংহিতায় উল্লেখ আছে যে "যবনেরা ছিল বর্বর—তথাপি ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বর্বর জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল—এই কারণে, উহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে সম্মানিত করা বাঞ্ছনীয়।" জন্ম কুষ্ঠী বিচারের পদ্ধতি ভারতীয়গণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রায় গ্রীকদের প্রভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে। মুদ্রার দুই পৃষ্ঠে অংকনের পদ্ধতি ভারতীয়গণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধদের ও পরবর্তীকালে হিন্দুদের মূর্তি উপাসনা গ্রীক প্রভাব হইতে উদ্বুদ্ধ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পেও গ্রীক শিল্প-কৌশলের প্রভাব পড়িয়াছিল। ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত হইল গান্ধার শিল্প।

ভারত ও মধ্য এশিয়া (India and Central Asia) : পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের সম্পর্ক ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক।

বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক

কিন্তু মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয়গণ বণিজ্যের সূত্র ধরিয়া রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ব্যাক্ট্রিয়ায় আগমন করিত। ব্যাক্ট্রিয়া ছিল ভারত চীন ও পশ্চিমী দেশগুলির মিলন স্থল। সেই স্থান হইতে পণ্য সম্ভার অক্ষুনদীর

স্থল ও জলপথ

(Oxus) অববাহিকা ধরিয়া জলপথে কাস্পিয়ান সাগরের বন্দরগুলিতে লইয়া যাওয়া হইত। পূর্বদিকে পামীর উপত্যকা ও গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়া পণ্য সামগ্রী চীন সাম্রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইত। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরেল স্টাইন (Sir Aurel Stein)-এর গবেষণার ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার এবং রাজনৈতিক প্রভুত্বের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শনের মধ্যে

বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং ভারতীয় ভাষায় রচিত বহু পাণ্ডু লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সৈন্যগণ কর্তৃক কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট বিজিত হওয়া ছাড়াও গোবির মরুভূমি অঞ্চলে অবস্থিত খোটানে ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। খোটান অঞ্চলে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও লিপিগুলি ভারতীয় ভাষায় রচিত। এমন কি রাজকর্মচারীগণের নামও সম্পূর্ণ ভারতীয় —যথা ভীম, ভঙ্গসেন, নন্দসেন ইত্যাদি। এইরূপ মনে হয়

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন

কুষাণ ও পরবর্তী যুগে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রসার ঘটিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার কুচী, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্র ছিল। এই সকল অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমে চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হিউয়েন-সাং চীন হইতে ভারত আগমনের পথে সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

চীন ও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বাহকগণ

দীর্ঘকালব্যাপী চীন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা চৈনিক সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। উভয় দেশের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ আচার্যগণের গমনাগমনের বহু প্রমাণ রহিয়াছে। চীন তথা মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ধনরত্ন, কাশ্যপ মাতঙ্গ, বোধিসেন ও দীপঙ্করের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
(India and South-East Asia)

প্রাচীনকালেই ভারতবাসীর নিকট সুবর্ণভূমি নামে সুপরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। তাম্রলিপ্ত, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি বন্দর হইতে ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে এই সকল দেশে যাতায়াত করিত। 'জাতক', 'বৃহৎ কথা', 'কথাকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের সামুদ্রিক তৎপরতার উল্লেখ আছে। কালক্রমে বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। এই ব্যাপারে বাঙ্গালীর দান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আনাম, কোচীন-চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অপরাপর দ্বীপগুলিতে হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। ভারতীয় হিন্দুগণ এই সকল দেশগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানীয়

অধিবাসীদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কালক্রমে এই হিন্দুরাজ্যগুলি ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠে।

কম্বোজ রাজ্য

চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কৌণ্ডিল্য নামে জনৈক ক্ষত্রিয় ইন্দোচীনের অন্তর্গত কম্বোডিয়ায় কম্বোজ নামে একটি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই রাজ্যটি চীনবাসীর নিকট ফুনাম নামে পরিচিত ছিল। চৈনিক সূত্র হইতে আরও জানা যায় যে এই রাজ্যে সহস্রাধিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বসবাস করিয়া ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচলন করিয়াছিলেন। জয়বর্মন, ভববর্মন, সূর্যবর্মন প্রভৃতি নৃপতিগণের অধীনে কম্বোজ রাজ্য পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কম্বোজ রাজগণ ভারতের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময় করিতেন। কম্বোজ রাজ্যে ভারতীয় ধন, শিল্প ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই রাজ্যের রাজধানী আঙ্কোরথোম* একটি সুসজ্জিত নগর ছিল। আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির† ও আঙ্কোর-থোম মন্দিরগুলিতে ভারতীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইন্দোচীনের অন্তর্গত কম্বোজের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত চম্পায় অপর একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ শ্রীমার ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পর বর্মন উপাধিধারী নৃপতিগণ এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। চম্পা

চম্পারাজ্য

রাজ্যের নৃপতিগণের মধ্যে শম্ভুবর্মন, সত্যবর্মন, ইন্দ্রবর্মন হরিবর্মন প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। চম্পা হিন্দু সংস্কৃতির একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। তথায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনামীদের ক্রমাগত আক্রমণে চম্পা রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে উহা মঙ্গোলদের হস্তগত হয়।

---

* **আঙ্কোরথোম ঃ** এই শহরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা সপ্তম জয়বর্মণ। শহরটি ছিল চতুঃষ্কোনাকৃতি—ইহার এক একটি দিক দুই মাইলেরও অধিক বিস্তৃত। ইহা একটি ৩০০ ফুট প্রশস্ত পরিখা ও প্রস্তর নির্মিত দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শহরের মধ্যস্থলে বিখ্যাত 'বেয়ন' শিব মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। শহরের প্রবেশদ্বার হইতে শহরের মধ্যস্থল পর্যন্ত পাঁচটি ১০০ মাইল বিস্তৃত রাজপথ প্রসারিত ছিল। সেই যুগে আঙ্কোরথোম শহরটি বিশ্বের অন্যতম শহর হিসাবে পরিগণিত হইত।

† **আঙ্কোর ভাট ঃ**—আঙ্কোর ভাটের বিষ্ণু মন্দিরটি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর বস্তু। কয়েকটি সোপান শ্রেণী পরিবেষ্টিত তিনটি মঞ্চের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। নীচের মঞ্চ হইতে উপরের মঞ্চে উঠিবার জন্য সারিবদ্ধ সোপান শ্রেণী রহিয়াছে। মঞ্চগুলিতে ক্ষোদিত মূর্তিগুলি উন্নত ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। মন্দিরের প্রধান শিখরটির উচ্চতা হইল ২১৩ ফুট। সমগ্র মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় নামে একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যটি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অপর প্রধান কেন্দ্র ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক ইৎ-সিং এখানে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চীনের সহিত এই রাজ্যের কূটনৈতিক বিনিময় চলিত।

শ্রীবিজয় রাজ্য

অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশীয় নৃপতিগণের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুমাত্রা সর্বাধিক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্নিও, মালয় প্রভৃতি দেশগুলি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজগণ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য কুমার ঘোষ ছিলেন এই বংশের রাজগুরু। ভারত ও চীনের সহিত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বাংলার পাল বংশীয় রাজা দেবপালের সহিত শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের দূত বিনিময় হইয়াছিল। এই রাজবংশের আমলে যবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটি ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। আরব বণিকেরা শৈলেন্দ্র রাজগণের সামরিক শক্তি ও ঐশ্বর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাদের নৌশক্তি ছিল প্রবল। নবম শতাব্দী হইতে শৈলেন্দ্র বংশের পতন শুরু হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উহার বিলুপ্তি ঘটে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপেও হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। যবদ্বীপ প্রথমে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলে যবদ্বীপ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বলিদ্বীপ প্রথমে যবদ্বীপ রাজ্যের অধীনে ছিল, কিন্তু পরে উহারা স্বাধীন হইয়া যায়। এই দুইটি রাজ্য হিন্দু সংস্কৃতির অপর প্রাধান কেন্দ্র ছিল। এই দুই রাজ্যে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন হইয়াছিল এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সমভাবেই প্রচলিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে যবদ্বীপে বহু কাব্য ও গদ্য সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুরাজ্য

প্রশ্নমালা

1. Trace briefly India's "relations with her neighbours in Western and Central Asia.

2. Describe India's cultural and colonial activities in the countries of South-eastern Asia.

3. Write a note on the Sailendra dynasty.

———

পরিশিষ্ট

প্রধান রাজবংশ সমূহের বংশ-পরিচয়

মৌর্যবংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খৃঃ পূঃ ৩২৪-৩০০
বিন্দুসার—„ „—৩০০—২৭৩
অশোক—„ „—২৭৩—২৩২
বৃহদ্রথ—„ „—১৮৫ (মৃত্যু)

কুষাণ বংশ

প্রথম কদফিসেস—১৫—৬৫ খৃঃ অব্দ
দ্বিতীয় কদফিসেস—৬৫—৭৫ „ „
কণিষ্ক—সিংহাসনারোহণ ৭৮খৃঃ অব্দ

গুপ্তবংশ

শ্রীগুপ্ত—২৪০—২৮০ খৃঃ অব্দ
ঘটোৎকচ—
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত—৩২০—৩৪০ „ „
সমুদ্রগুপ্ত—৩৪০—৩৮০ „ „
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—৩৮০—৪১৩ „ „
কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য—৪১৪—৪৫৫ „ „
স্কন্দগুপ্ত—৪৫৫—৪৬৭ „ „
বুধগুপ্ত—৫০০ খৃঃ অব্দ (মৃত্যু)

পুষ্যভূতি বংশ

প্রভাকর বর্ধন—৫৮০—৬০৫ খৃঃ অব্দ
রাজ্যবর্ধন—৬০৫—৬০৬ „ „
হর্ষবর্ধন—৬০৬—৬৪৭ „ „

চালুক্য বংশ

প্রথম পুলকেশী—৫৩৫—৫৬৬ খৃঃ অব্দ
প্রথম কীর্তিবর্মণ—৫৬৬—৫৯৭ „ „
মঙ্গলেশ—৫৯৭—৬১০ „ „
দ্বিতীয় পুলকেশী—৬১০—৬৪২ „ „

বাতাপির চালুক্য বংশ

প্রথম বিক্রমাদিত্য—৬৫৫—৬৮১ খৃঃ অব্দ
বিনয়াদিত্য—৬৮১—৬৯৬ „ „
বিজয়াদিত্য—৬৯৬—৭৩৩ „ „
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য—৭৩৪—৭৪৫ „ „
দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ—৭৪৫—৭৫৭ „ „

রাষ্ট্রকূট বংশ

প্রথম কৃষ্ণ—৭৫৮—৭৭৩ খৃঃ অব্দ
দ্বিতীয় গোবিন্দ—৭৭২—৭৮০ " "
ধ্রুব—৭৮০—৭৯৩ " "
তৃতীয় গোবিন্দ—৭৯৩—৮১৪ " "
প্রথম আমোঘবর্ষ—৮১৪—৮৭৮ " "
দ্বিতীয় কৃষ্ণ—৮৭৮—৯১৪ " "
তৃতীয় ইন্দ্র—৯১৪—৯২২ " "

চোলবংশ

প্রথম আদিত্য—৮৮০—৯০৭ খৃঃ অব্দ
প্রথম পরান্তক—৯০৭—৯৫৪ " "
প্রথম রাজরাজ—৯৮৫—১০১৪ " "
প্রথম রাজেন্দ্র—১০১৪—১০৪৪ " "
রাজাধিরাজ—১০৪৪—১০৫২ " "
বীর রাজেন্দ্র—১০৬৪—১০৭০ " "
অধিরাজেন্দ্র—
কুলোতুঙ্গ—১০৭০—১১২০ খৃঃ অব্দ
বিক্রমচোল, দ্বিতীয় কুলোতুঙ্গ, দ্বিতীয় রাজরাজ, দ্বিতীয় রাজাধিরাজ ও তৃতীয় রাজাধিরাজ } ১১২০-১২৫৬ খৃঃ অব্দ

পালবংশ

গোপাল—৭৫০—৭৭০ খৃঃ অব্দ
ধর্মপাল—৭৭০—৮১০ " "
দেবপাল—৮১০—৮৫০ " "
বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল } ৮৫০—৯৬০ খৃঃ অব্দ
মহীপাল—৯৮৮—১০৩৮ খৃঃ অব্দ
নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল } ১০৩৮—১০৭৭ খৃঃ অব্দ
রামপাল—১০৭৭—১১২০ খৃঃ অব্দ

সেনবংশ

বিজয় সেন—১১২৫—১১৫৮ খৃঃ অব্দ
বল্লালসেন—১১৫৮—১১৭৯ " "
লক্ষ্মনসেন—১১৭৯—১২০৬ " "